বাংলাদেশের গল্প

দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও
প্রণবেশ সেন সম্পাদিত
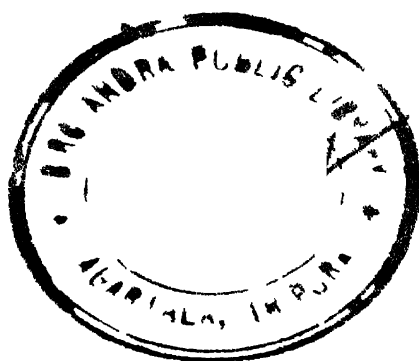
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ ॰ শ্রাবণ ১৩৫৭

প্রকাশক
ময়ূখ বসু
গ্রন্থ প্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
শ্রীশিশির কুমার সরকার
শ্যামা প্রেস
২০বি, ভুবন সরকার লেন
কলিকাতা ৭

প্রচ্ছদ
গৌতম রায়

দাম : বারো টাকা

ভূমিকা

বাংলাদেশের গল্প। বাংলাদেশেরই গল্প, শুধুমাত্র বাংলাদেশের গল্পকারদের গল্প নয়।

একটা জাতি কি এক আশ্চর্য বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাদের খণ্ডিত স্বাধীনতাকে পূর্ণতা এনে দিলো—বাংলাদেশের গল্প তারই ইতিবৃত্ত। এই সংকলনটিতে বাংলাদেশের মাটি, মানুষ, মন ও ভাষাকে নতুন ক'রে চিনতে চেয়েছি, পেতে চেয়েছি বাংলাদেশের মানুষের জেগে-ওঠা, যন্ত্রণা ও সংগ্রামের উষ্ণ-সান্নিধ্য। আর চোখের সামনে রাখতে চেয়েছি শিল্প-শৈলীর বিবর্তনের রূপ-রেখাটি।

একটা সংকলনে এতটা পেতে চাওয়া বোধ হয় একটু বেশী চাওয়া। আমরা অবশ্য সেই স্পর্ধাই করেছি।

বন্ধু ময়ূখ বসুকে কৃতজ্ঞতা জানাবোনা—তবে মনে রাখবো, তারই তাগিদে এই সংকলনের প্রকাশ।

উৎসর্গ

"হে বাংলা ভাষা আমার
আমি চিরকাল
তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো
তুমি না হলে
মানুষের এই উজ্জীবিত অভ্যুত্থানের কথা
আমি কোনো দিন
উচ্চারণ করতে পারতাম না।"

সূচীপত্র

জন্মান্তর

আবুল ফজল

যোল বছরের মেয়েকেও ছাব্বিশ বছরের মতো দেখায় আবার ছাব্বিশ বছরের তেনাকেও যোড়শী বলে ভ্রম হয়। অর্থাৎ মেয়েদের বয়সের কোন গাছ পাথর নেই। আসলে যোলর পর মেয়েরা হয় দ্রুত বাড়ে না হয় থ হয়ে থাকে, বাড়েই না আদৌ। বিয়ের পর অবশ্য প্রায় মেয়ের দেহে ঘটে অঘটন—আঙুল ফুলে কলাগাছ। বিয়ে যাদের হয়নি তাদের বয়স নিয়েই আধুনিকদের যত মাথা ব্যথা, আর প্রাচীনদের যত সব ধাঁধাঁ। যে মেয়ে দশ বছর ধরে মাষ্টারী করছে বয়স জিজ্ঞাসা করলে সেও উত্তর দেয় আঠারো, মেয়ের মা বা খালা-আম্মা সঙ্গে থাকলে অবশ্য সংশোধন করে যোগ করেন সতর বছর সাত মাস। এই নির্ভুল ঐতিহাসিক তথ্য আপনি যদি বিনা প্রতিবাদে হজম্ করতে পারেন তা হলে আপনাকে মনে মনে মানতেই হবে—এই অসাধারন 'প্রতিভা' মাত্র আট বছর বয়সেই ম্যাট্রিক পাশ করেছেন।

এই গল্পের নায়ক হাফেজ মওলানা মোহাম্মদ হোসেন সাহেবের অবশ্য এই নিয়ে দুর্ভাবনার কোন কারণ নেই। কারণ তিনি আধুনিক নন্ প্রাচীনও তাঁকে বলা যায় না। উপরন্তু তিনি বিবাহিত এবং তাঁর স্ত্রীর বয়স তাঁর অর্ধেকের বেশী নয়। তবে আফসোস্ তাঁর স্ত্রীকে এখন দেখায় বয়সের চেয়ে অনেক বয়স্কা, একটি ছেলে হওয়ার পর, সত্য কথা বলতে কি ফরিদাকে দেখাতে লাগল ঠিক মওলানার খালা-আম্মার মতোই। এইটিই মওলানার বড় দুঃখ। এমন কি তার খালা-আম্মার স্বাস্থ্য এখনো ফরিদার চেয়ে অনেক ভাল, তুলনা মনে জেগে উঠলে তাই খালা-আম্মার চেয়ে নানীর চেহারাই তাঁর বেশী করে মনে পড়ে। মনেই শুধু, মুখে কিন্তু তিনি ঘুণাক্ষরেও খালা-আম্মা বা নানী শব্দ উচ্চারণ করেন না। কারণ ঐ দু'জনই তাঁর পক্ষে মুহরোমাৎ অর্থাৎ ওঁদের সঙ্গে বিয়ে হারাম। ফরিদার রঙ বেশ ফর্সা—একেবারে দুধের মতোই সাদা কিন্তু গাল দুখানি এরি-মধ্যে ভেঙ্গে চুপসে গেছে এবং তাতে

রক্তের নেই কোন চিহ্ন। এবং দেখায় তা প্রায় সাদা কাগজের মতই। চোখ দু'টি কোটরগত—বুক প্রায় ছেলেদের মতোই সমতল। ছেলে হওয়ার আগে কিন্তু ফরিদা এমনটি ছিল না। সুপুট গোল গাল দু'টিতে তখন কথায় কথায় রঙের হোলিখেলা চলত। চঞ্চল চোখ দুটিতে যে ভাবে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাতো, দেখে মগজে আস্ত কোরাণ মজিদ, মুখমণ্ডলে বিপুল চাপদাড়ী ও মুখাবয়বে ভয়ঙ্কর গাম্ভীর্য নিয়েও মোহাম্মদ হোসেন প্রায় নিম্ খুন হয়ে পড়তেন। চলতে ফিরতে ফরিদার সারা দেহে স্বাস্থ্য যেন উছলে পড়ত তখন। বিশেষ করে প্রতি পদক্ষেপে বুকের যে মৃদু নর্তন হ'ত তা দেখে হাফেজ সাহেবের বুকের রক্ত ঝড়ের দিনের পদ্মার মতই করে উঠত তোলপাড়। ভাল হেফজের জন্য তার খুব সুনাম ছিল। তবুও বিয়ের পর প্রথম প্রথম খতম পড়তে তাঁর প্রায়ই হ'ত ভুল। বুড়া মোয়াজ্জিনকে প্রায় দিতে হত লোকমা অর্থাৎ সংশোধনী। এখন ফরিদাকে আগের ফরিদার কঙ্কাল বললেই হয়।

আশ্চর্য, হাফেজ সাহেবের খতমে আজকাল আর ভুল হয় না আগের মত মোটেও। সারা রমজান মাস ব্যাপী রাতের পর রাত এখন তিনি এক দম নির্ভুলভাবেই আবৃত্তি করে যান সমস্ত কোরাণ শরীফ। খোশনামা তাঁর ছড়িয়ে পড়ে দেশের চারদিকে ভাল হাফেজ ও পরহেজগার বলে। তবে জোয়ান মুসল্লীরা কোন কোন দিন আপত্তির সুরে বলে বসে "হাফেজ সাহেব, আজকাল এত লম্বা মুনাজাত করেন কেন ?"

হাফেজ সাহেব হেসে পাল্টা প্রশ্ন করেন "দেরী হলে বিবিরা রাগ করেন বুঝি ?"

বুড়োদেরও কেউ কেউ এই আলাপে শরীক হন 'বিয়ের পর হাফেজ সাহেব মুনাজাত করতেন কিন্তু খুব মুখতসর। আমাদেরত দিলই ভরত না। মনে থেকে যেত আফসোস্। ঠোঁটে কিন্তু এঁদেরও দেখা দেয় মৃদু হাসির বক্ররেখা।

জোয়ানরাও টিপ্পনি কাটতে ছাড়ে না 'তখন ভাবী সাহেবা জোয়ান ছিলেন কিনা।' উত্তরে কিছুটা হতাশার সুরেই হাফেজ সাহেব বলে ওঠেন 'এ্যায়ছা দিন নেহি রহেগা।'

হাফেজ সাহেবদের অবস্থা ভাল। তাঁদের ঘর খুব বনিয়াদি না হলেও মফস্বলের সচ্ছল চাষী গৃহস্থ তাঁরা। বাবার আরজু ও খেয়াল বড় ছেলে আহম্মদ হোসেনকে হাফেজ ও আলেম বানাবেন। কোরাণ শরীফ হেফজের

পর তাই তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হল হিন্দুস্থানে অর্থাৎ দেওবন্দ। বছর দুই সেখানে কাটিয়ে বস্তা বন্দী হয়ে তিনি একেবারে একচোটে হাফেজ মওলানা মোহাম্মদ হোসেন হয়েই ফিরে এলেন। বাবা বস্তারবন্ধী ছেলেকে দেখে বেশ খোশ তবিয়তেই এন্তেকাল করলেন মোহাম্মদ হোসেন ফিরে আসার অল্পকালের মধ্যেই। গ্রামে একটি মাদ্রাসা দিয়ে তারই হেড মৌলবী হলেন তিনি স্বয়ং। পাড়ার মসজিদের ইমামতী ও রমজান মাসে খতম পড়া ত আছেই। ছোট ভাইরা কেউ লেখাপড়া শিখেনি তেমন। তারা গৃহস্থালি ও হালচাষ করে সংসার চালায়। পিতা মারা যাওয়ার পরও তারা সব ভাই একান্নেই আছে। পরিবারের একজন আলেম ও হাফেজ হওয়ায় দেশে তাদের কদর ও ইজ্জৎ গেছে অনেক বেড়ে! হাফেজ সাহেবের ভাই বলে হাটে বাজারে অনেকে এখন তাদের সালাম পর্যন্ত করে। হাফেজের বিয়ের বেলায় এই কদরের প্রমাণ পাওয়া গেল হাতে হাতেই।—ফরিদা মুন্সী বাড়ীর মেয়ে। মুন্সীরা মান-সম্ভ্রম ও শরাফতীতে এদের চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের আদমী। মুন্সী পরিবারের ছেলেরা অল্পবিস্তর সবাই কিছু না কিছু ইংরেজি পড়েছে ও পড়ে। ফরিদার বড় ভাই খাস মহলে আফিসের কেরানী। ছোট ভাই শহরে কলেজে পড়ে। কাজেই গ্রামে দেশে এরা কেউ কেটা নয়। ফরিদার অবশ্য কোরাণ শরীফের উপরে বাংলায় বাল্য শিক্ষার বেশী আর কিছু পড়ার সুযোগ ঘটেনি। বলাই বাহুল্য সমকক্ষ হবে না হলেও একাধারে হাফেজ ও মওলানা বলেই ফরিদার সঙ্গে মোহাম্মদ হোসেনের বিয়ে সম্ভব হয়েছে।

অবশ্য কাবিনের শর্তে লেখা হয়েছে, 'ফরিদা ধান চালের কোন কাজ করবে না, ঢেকিশালেও সে যাবে না, গোয়ালে ঘরেও ঢুকবে না কোনদিন। অর্থাৎ চাষবাসের মত হীন কাজের সঙ্গে তার থাকবে না কোন সম্পর্ক।

নামজাদা পরিবারের সঙ্গে সম্বন্ধ হবে এই খুশীতে এই পক্ষ থেকেও এই সব শর্তে কোন আপত্তিই উঠল না! আর মওলানা মোহাম্মদ হোসেন সাহেবত জানেন কোন আলেমের বিবিই এ সব কাজ নিজের হাতে করে না। পানটা নিজের হাতে বানালেই যথেষ্ট। মুন্সী বাড়ীর মেয়েদের হাতে পানের খ্যাতি আছে: বিয়ের আগে সেই খ্যাতি মোহাম্মদ হোসেন যতবারই শুনেছেন ততবারই তাঁর জিভে লালা এসেছে। ওরকম মিহি সুপারী শহরের বড় বড় বনিয়াদি ঘরের মেয়েরাও নাকি কাটতে পারে না।

রমজান মাস। মসজিদ থেকে এসে মওলানা সাহেব দেখলেন বিবি

ঘুমুচ্ছেন অঘোরে। কাগজের মত সাদা ফ্যাকাশে শীর্ণ মুখে এতটুকু লাবণ্যের চিহ্ন নেই। ছেলেকে দুধ দিতে দিতেই ফরিদা ঘুমিয়ে পড়েছে। দুধের একটি বাঁট এখনো ছেলের মুখেই নিবদ্ধ। চুপসে যাওয়া বেলুনের মত হুয়ে পড়া স্তন। ইচ্ছা করলে বুকের সব হাড্ডিই গোনা যায়। দেখে মোহাম্মদ হোসেনের মনটা কিছুমাত্র উৎফুল্ল হল না। আগে হলে হয়ত অন্যরকম কাণ্ড ঘটত—নামাজের কাপড় খানা বদলাবার তরও সইত না। তখন তাঁর· আজ কিন্তু চোখটা ফিরিয়ে নিয়ে তিনি শুধু সজোরে গলা খাকারিই দিলেন।

ফরিদা ধড়ফড করে বসল। কাপড চোপড রইল তেমনি বিস্রস্ত। ছেলের মা হওয়ার আগে কিন্তু ফরিদা স্বামীকে দেখলেই ঘোম্‌টাটা মাথার উপর টেনে দিতো। আর মওলানা সাহেব হাতের তসবি ছডাটি ছুঁডে ফেলে এই ঘোমটা নিয়েই শুরু করতেন ধ্বস্তাধ্বস্তি। এই ভাবেই হত তখন ভূমিকা পত্তন।

আজ কিন্তু মওলানা বিরক্ত কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'নামাজ পড়েছো ?'

ফরিদা কিছুটা থতমত খেয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বললে, পড়েছি। এশাটাই শুধু পড়েছি আজ। বলেই ঠোটে জোর করে হাসি ফুটিয়ে তুললে স্বামীর সহানুভূতির আশায়।

রুক্ষ কণ্ঠে জবাব এল, 'তারাবী পড়নি কেন ?' শরিয়তের ব্যাপারে স্বামীর কণ্ঠস্বর সব সময় রুক্ষ ও কঠোর। ফরিদার ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে গেল মুহূর্তে।

'হঠাৎ খোকা কেঁদে উঠল কিনা। নমাজ ছেড়ে এসে মাই দিতে হল। এখন কি অজু আর আছে ?" বলে, ম্লান শুষ্ক ঠোটে আবার সে একটুখানি হাসি ফোটাবার ক্ষীণ চেষ্টা করলে। তার চাহনিতে কিন্তু ফুটে উঠল হাসির চেয়ে মিনতি-ই বেশী।

'যাও অজু করে তাড়াতাড়ি তারাবী পড়ে নাও।' স্বামীর ঠোটে হাসির কোন আভাস ফুটল না বরং ভ্রূ হল কিঞ্চিত কুঞ্চিৎ। মওলানা সাহেব জানেন, ভাল করেই জানেন। হাসি হচ্ছে শরিয়তের শক্ত দুশমন। এরকম প্রসঙ্গে তাঁর কোন ওস্তাদকেই তিনি হাসতে দেখেননি। ফরিদাকে অগত্যা উঠতে হ'ল। না হয় স্বামী অন্য বিছানায় গিয়ে শোবেন—ছেহবীও খাবেন না তার হাতে। বে-নমজীর চোহবৎ তিনি এড়িয়ে চলেন, খান না বে নমাজীর ছোঁয়া কোন জিনিস।

থাক্, দেওবন্দ থেকে ফিরে আসার পর হাফেজ মওলানা মোহাম্মদ হোসেন সাহেবের জীবন খুব নির্বিঘ্নে ও বেশ আরামেই কেটে যাচ্ছিল। হাফেজ সাহেব সুস্থ ও বলিষ্ঠ দৈহিক গঠন উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছেন। স্বাস্থ্যের শেকায়েৎ তাঁকে কোন দিন করতে হয়নি। তদুপরি হাফেজ-মৌলবীদের খাওয়া পরার ব্যাপারে কোন কষ্ট হয় না গ্রাম দেশে কোন কালেই। নিজের বাড়িতে যত না হোক, পরের বাড়িতে মোরগ-খাসীর ঝোলো গোস্তটা হামেশাই জোটে তাঁদের ভাগ্যে। বিশেষতঃ হাফেজ সাহেবের পরহেজগারীর খ্যাতি আছে আশে পাশের সব গ্রামেই। তাই যুদ্ধের আকাল দুর্ভিক্ষে আর যারই যা কিছুর অভাব ঘটুক হাফেজ সাহেবের খাওয়া পরার কোন অভাব ঘটেনি। কাজেই সম্প্রতি বয়স চল্লিশ পার হলেও শরীরটা তাঁর বেশ পুরুষ্ট ও তাজাই আছে এখনো। ফরিদার স্বাস্থ্যের বিশেষ কোন উন্নতি না হলেও প্রায় বছর বছরই তার একটি করে সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে নিয়মিতই। সব যে বেঁচে আছে তা নয় তবে আসাটা থামেনি এখনো। প্রতিবার ছেলে বা মেয়ে হওয়ার সংবাদ পেলেই মওলানা কোরাণের যে আয়াতে নারীকে শস্য ক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তা আবৃত্তি করে খোদার শোকরানা আদায় করেন এবং যথাবিধি নিজেই আজান দিয়ে এই খোশ খবর পাড়াময় জানিয়ে দেন।

বিবির চেহারার কথা ভেবে প্রথম প্রথম তিনি খুব বিরক্ত বোধ করতেন বটে, এখন কিন্তু তাও সয়ে গেছে। আল্লার হুকুম ও তাঁর তক্‌দির বলে তাও এখন তিনি মেনে নিয়েছেন। জওয়ানী অবস্থায় বৌ বিবির ব্যাপারে সকলেরই একটু আধটু বাড়াবাড়ি থাকে বইকি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সবই মিইয়ে আসে আপনা থেকেই। রুগ্ন স্ত্রীতেও তখন আর আপত্তি থাকে না। মনে হয় এই স্বাভাবিক, এই তকদিরের লেখা। কয়েক বছর আগেও বিবিকে, তখন ফরিদা মাত্র দু'টি সন্তানের মা, এখন ত ছ'টির, খোঁচা দিয়ে মওলানা সাহেব বলতেন, 'তোমার সারা গায়ে শুধু হাড্ডি, হাড্ডি, হাড্ডির ধাক্কা খেয়ে খেয়ে আমার বুকটাও হাড্ডির মত শক্ত হয়ে গেল। পাশ বালিশ বুকে নিয়ে যতটুকু আরাম তোমাকে বুকে নিয়ে তার অর্ধেক আরামও পেলাম না জীবনে।' বলেই কিন্তু জীর্ণ শীর্ণ ও হ্যাংলা বৌকে মওলানা একেবারে কোলের উপরই তুলে নেন্। তারপর দীর্ঘ ও ঘন দাড়ি দিয়ে তার ঘাড়ে গালে ও থুতনিতে সুড়সুড়ি দিয়ে এখানে ওখানে চুমু খেয়ে এলাহি কাণ্ড বাঁধিয়ে বসেন। স্বামীর কণ্ঠ-লগ্না ফরিদার ক্ষীণ দেহও তখন পুলক-রোমাঞ্চে কাঁপতে থাকে। আবেগে

চোখ দু'টি আসে তার বুজে, পান রাঙা ঠোঁট দু'খানি অজ্ঞাতেই উত্তোলিত হয় স্বামীর মুখের দিকে। হাফেজ সাহেবের ঠোঁটে ফরিদা নিজ হাতেই পানের খিলি গুঁজে দিয়েছিল একটু আগেই। তাই তাঁরও ঠোঁট দু'খানি হয়েছে টুক টুকে লাল। চারিটি রক্ত-রাঙা ঠোঁটের মিলনে মওলানা বোধ করি বিবির স্বাস্থ্যহীনতা ও হাড্ডি-সার দেহের কথা ভুলে যান মুহূর্তে।

এই সব অবশ্য এখন বাসি কথা।* এই সব দিনের কথা স্মরণ করেই হয়ত মওলানা সেদিন বলেছিলেন 'এ্যায়ছা দিন নেহি রহেগা।'

হঠাৎ পাড়ার লুলির মা গেল মারা। নিঃস্ব ভিখারিণী লুলির মাব লুলি ছাড়া এ সংসারে আর দ্বিতীয় কেউ নেই। থাকলেও তারা আর এখন কোন সম্বন্ধই স্বীকার করে না। লুলির একখানি হাত আর একখানি পা নুলো। কোন একটা ভাল নাম তার থাকা বিচিত্র নয় কিন্তু তা ব্যবহার হয়নি কোনদিন, শোনা যায়নি কারো মুখে। মা থেকে পাড়ার মাতব্বরেরা পর্য্যন্ত সবাই তাকে ডাকে লুলি বলে। এই তার পরিচয় আশে পাশের সব গাঁও-গ্রামে নুলো বাঁ পা খানি টেনে টেনে সে কোন রকমে মায়ের পেছনে পেছনে যায় এপাড়া থেকে ওপাড়া। কোথাও কিছু উঁচু-নীচু বা গর্ত খন্দক পার হতে হলে মা-ই হাত ধরে করে দিত পার। এমনি করে ঘরে ঘরে ভিক্ষা করেই চল ছিল তাদের মা মেয়ের জীবন। হাতও একটি নুলো বলে কাপড়টাও সে পরতে পারে না নিজের হাতে। মাকেই দিতে হত পরিয়ে। অন্ধের যষ্টি সে মা-ই তার আজ গেছে মারা। লুলিরও বয়সের কোন গাছ পাথর নেই। কেউ মনে করে কুড়ি, কেউ মনে করে সতের-আঠারো। যারা জানে তারা বলে ত্রিশের কাছাকাছি। মুখখানি তার প্রায় বেটা ছেলের মতোই, তাতে পড়েনি বয়সের কোন রেখা-চিহ্ন। নেই তাতে কিছুমাত্র মেয়েলী লাবণ্য, সারা মুখমণ্ডলে জড়িয়ে আছে একটা মর্দানা-ভাব। ঈদে-পরবে মা কোনদিন তার মাথায় তেল ছোঁয়ালেও ছোঁয়াতে পারে, না হয় তার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উসকুখুসকু চুলে কোন তৈল-চিহ্নই যায় না দেখা। শতছিন্ন ময়লা এক খণ্ড বস্ত্র তার পরনে, তাতে কোনরকমে শুধু হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা পড়ে। গলায় একখানা ছেঁড়া তেনা গেরো দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে—মা-ই দিয়েছে। মাঝে

মাঝে অশান্ত বাতাস সেই বস্ত্রখণ্ড উড়িয়ে তাকে করে তোলে বিব্রত। কোন রকমে একহাতে সেই ছেঁড়া তেনাটাকে চেপে ধরে তাকে রক্ষা করতে হয় আব্রু। এখন সেই লুলি হ'ল মাতৃহারা এবং পড়ল অকুল পাথারে।

পাড়ার মড়া। মওলানা সাহেবকে বিনা খয়রাতেই আসতে হল জানাজায়। জানাজা পড়ে মওলানা বাড়ী যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই লুলি টল্‌তে টল্‌তে পা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে এসে মওলানার দু'খানি পা'ই এক হাতে জড়িয়ে ধরে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল। বিলাপের স্বরেই বলে চলল 'আমার কি হবে, আমি কি করে থাকব? কে আমার ইজ্জৎ বাঁচাবে? কেমন করে ইজ্জৎ নিয়ে মরবো? ইত্যাদি ইত্যাদি।'

পড়শীরা ধমক দিয়ে বলে 'ইজ্জৎ চুলোয় যাক্! পেট চলবে কি করে আগে তাই ভাব।'

বুড়া হামজার বাপ বললে '‘ভিক্ষা করে কিছু আনলেও রেঁধে দিবে কে, বেড়ে দিবে কে? কাপড়টা পরিয়ে বা বদলে দিবেই বা কে?"

সব ক'টাই সঙ্গত ও অতি খাঁটি কথা। কিন্তু একটা আস্ত মানুষের ঝুঁকি ত কম নয়। পাড়ার লোক দু' একজন করে পেছনে সরতে লাগল। কেউ কেউ নিজের হাতে করবে একটা ঢেলা দিয়ে কিছু সোয়াব হাসিলের জন্য ব্যস্ত হয়ে সেদিকেই গেল দ্রুত এগিয়ে।

মওলানা সাহেব পাড়ার এই সব দুনিয়াভী ব্যাপার নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামাননি। লুলিকে তিনি যে ইতিপূর্বে দেখেননি তা নয়। দেখেছেন বহুবার। তাঁদের বাড়িতেও ত মা-মেয়ে ভিক্ষে নিতে আসত প্রতি শুক্রবার। বাসি ভাত-টাত বেঁচে গেলে মওলানার বিবি মা-মেয়েকে খাইয়েও দিয়েছেন কতদিন। কিন্তু আলেম মানুষ তিনি, চোখ মাটির দিকে রেখে চলার শিক্ষাই পেয়েছেন কেতাবে। সেই তাঁর অভ্যাস। তাই কোনদিন তিনি মুখ তুলে চাননি লুলি বা তার মার দিকে। কখনো ভাবেননি এদের সমস্যা।

মেয়েটি হঠাৎ অকুল পাথারে পড়ে গেছে দেখে তাঁর মনে মুহূর্তে দয়ার সঞ্চার হ'ল বুঝি। বিশেষত তাঁর মনে পড়ল কোরাণের আদেশ ও হাদিসের শিক্ষা 'এতিম ও মা'জুরের প্রতি দয়ার হস্ত প্রসারিত করবে।' পা সরিয়ে নিয়ে তিনি বললেন, "আজ আমাদের বাড়ী খেতে আসিস! ঘরে আলাপ করে দেখি কিছু হিল্লে হয় কিনা।'

পাড়া পড়শীদের এখনো যে কয়জন অবশিষ্ট ছিল তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস

ফেলে যোগ করলে, 'হুজুর আশ্রয় দেন ত বেঁচে যায়।'

মওলানা কোরাণের আয়াৎ ও হাদিস আবৃত্তি করে সকলকে শুনিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'দেখি বাড়ীর তেনারা কি বলেন?'

তেনারা অবশ্য বিশেষ আপত্তি করলেন না। গিন্নী শুধু বল্লেন, থাকবে কোথায় রাত্রে।

মওলানা বল্লেন, 'কেন, ঢেঁকি ঘরেই না হয় রইল।'

ফজুর মা নিকটেই ছিল সে বলে উঠল, রাত্রে বের টের হবে কেমনে? কেউ একজন না ধরলে সেত দাওয়ায় উঠা-নামাই করতে পারে না।'

মওলানা তারও সমাধান করে দিয়ে বললেন, "কেন ফজুর মা, তুমিও না হয় ওর সঙ্গে ঐ ঘরে রইলে।"

ফজুর মা কিন্তু লুলির সঙ্গে এক ঘরে থাকতে রাজি নয়। হাজার হোক সে ভিক্ষে করে খায়নি কোনদিন। তার উপর সে মুন্সী বাড়ীর চাকরানী—তার নিজস্ব একটা আভিজাত্য আছে যে, যে মনে মনে তা বোধ করে শুধু তা নয় সুযোগ পেলে তা প্রকাশও করে। বিয়ের দিন তাকে ফরিদার সঙ্গে দেওয়া হয়েছে। সেই থেকে এই বাড়ীতেই সে আছে, ফরিদার ফাই ফরমাস পালন করে। আর সুযোগ পেলেই মুন্সী বাড়ীর সঙ্গে এই বাড়ীর তুলনা করে ফরিদার হাত থেকে জর্দা দেওয়া পানের খিলি আদায় করে। ঢেঁকিশালের পাশেই লাগানো রান্নাঘর। ফজুর মা রাত্রে রান্না ঘরেই শোয়।

ফজুর মা জানে বাড়ীর কর্তাকে খুশী রাখা বুদ্ধিমানের কাজ। তাই বললে, 'লুলির বাইরে যাওয়ার হাজৎ হলে আমাকে ডাক দিলেই আমি উঠব। মাঝখানে একটি বাঁশের বেড়াইত শুধু।' অগত্যা এই ব্যবস্থাই কায়েম হ'ল।

লুলির একখানি হাত ও একখানি পাই যে শুধু নুলো ও শীর্ণ তা নয়, সারা শরীরটা চর্ম-সার। এতটুকু মাংসের বালাই নেই কোথাও। হয়ত কোনদিন পেট ভরেই খেতে পায়নি। মা যদ্দিন বিছানায় পড়েছিল তদ্দিন অনেক বেলাই উপুস দিতে হয়েছে নীরবে। কোনদিন হয়ত জুটেছে আধপেটা কোনদিন তাও জোটেনি। বোধ করি এই শীর্ণ চেহারা দেখেই মওলানার মনে জেগেছিল দয়া, আহ, হাজার হোক্ আল্লার বান্দা।'

মাস দুই পরে বোধ করি মওলানা একদিন দুপুরবেলা ফিরছিলেন দূর এক গ্রাম থেকে জানাজার নামাজ শেষ করে। বিল পাতাড়ী এসে তাদের পুকুর পাড়ে উঠেছেন মাত্র হঠাৎ ঘাটে চোখ পড়তেই অবাক হয়ে থমকে

গেলেন তিনি। সরে একটা গাছের আড়ালে গিয়েই দাঁড়ালেন। লুলি এর মধ্যে মাঝে সাঝে যে তাঁর চোখে পড়েনি তা নয়। তবে তিনি কোনদিন চোখ তুলে ভাল করে তাকিয়ে দেখেন নি ওর দিকে। বেগানা ঔরতের দিকে চোখ তুলে তাকানো শরিয়তের মানা। শরিয়ত পা-বন্ধ আলেম তিনি সজ্ঞানে তার অন্যথা করেননি কোনদিন। আজ হয়ত নেহাৎ বে-খেয়ালেই এই-নীতির প্রথম খেলাপ হল।

লুলি ঘাটে লেপটে বসে, ভাল পাটা পানিতে ডুবিয়ে গোসল করছে। একহাতে যতটুকু পারা যায় ডলে ডলে যেন বুকের ময়লা তোলবার চেষ্টা করছে। নিঝুম নিস্তব্ধ দুপুর বেলা। কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া নেই। কাজেই নিশ্চিন্ত আরামে ধীরে সুস্থে বুকের কাপড়টা ফেলে সে গাত্র মার্জনা করছিল অসীম মনোযোগ দিয়ে। এখানে দু'বেলা পেট ভরে খেতে পেয়ে লুলির দেহে যে এমন সব অঘটন ঘটেছে তা ভাবাই যায় না। এটাই মওলানার তাজ্জব হওয়ার বড় কারণ। এত তাজ্জব তিনি হলেন যে নিজেকেই যেন গেলেন ভুলে, চেয়েই রইলেন এক দৃষ্টিতে বেশ খানিকক্ষণ। ফুলো হাত পা দু'খানি ছাড়া বাকি সারা শরীর থল থল করছে লুলির মেদ মাংসে। শীর্ণ মুখমণ্ডল ভরে গোলগাল হয়ে প্রায় ফেটে পড়ার অবস্থা। মওলানার চোখ দু'টি নিবদ্ধ হয়ে রইল তার পুরুষ্টু স্তন দুটির প্রতি। মনে পড়ে তাঁর দেওবন্দে থাকতে মেওয়ার দোকানে সুপুষ্ট ও বেশ বড় বড় আপেল দেখতে পেতেন, যা এক হাতের মুঠোয় ধরত না মোটেও। মনে হ'ল এও এক হাতের মুঠোয় ধরবে না। এমন পুরুষ্টু সুগোল ও সুঠাম বুক বাংলা মুল্লুকে কখনো দেখেছেন বলেই মনে হল না তাঁর। পরক্ষণেই কিন্তু তাঁর মনে হাফেজ মওলানা মোহম্মদ হোসেন জেগে উঠল। তিনি 'তৌবা তৌবা' করে কোন রকমে লুলির চোখ এড়িয়ে নীচে নেমে পুকুরের বাইরের ধার বেয়ে ঘরে ফিরে এলেন।

ফরিদা দেখল স্বামীর মুখ আজ অতিমাত্রায় গম্ভীর, মনে হল তিনি যেন অন্যমনস্ক ও চিন্তিত। ফরিদা জানে স্বামীর গাম্ভীর্য ভাঙাবার পরমৌষধ হচ্ছে—নিজের হাতে এক খিলি পান তাঁর মুখে গুঁজে দেওয়া। সেই ঔষধ প্রয়োগের পর সত্যই হোসেনের ঠোঁট দুটি শুধু লাল হ'ল না তাতে মৃদু হাসিরও সোনালী রেখা দেখা দিল ঘন গুম্ফ শ্মশ্রুর ফাঁকে। ফরিদার দিকে চেয়ে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবেই বলে উঠলেন মওলানা। 'লুলির জন্য বড় দুঃখ হয়।'

বিস্মিতা ফরিদা বলল, কেন? সে ত এখন দিন দিনই খোদার খাসী হচ্ছে। শরীরটা যা হয়ে উঠেছে দেখল ত রীতিমত হিংসা ·······

ফরিদাকে বাক্য শেষ করতে না দিয়ে মওলানা বল্লেন, 'তাইত বেশী করে ভাবছি। কারো সঙ্গে একটা কলমা পড়িয়ে দিতে পারলে খুব সওয়াবের কাজ হত।'

'অমন লুলো মেয়েকে কে বিয়ে করতে যাবে, শুনি!" তারপব ঠোঁটে বাঁকা হাসি হেসে যোগ করলে অত দয়া হলে নিজেই করে ফেলেন না কেন? এক ঢিলেই দু'পাখী শিকাব হবে—মোটা সোটা ও স্বাস্থ্যবতী বৌও মিলবে, ঐদিকে সওয়াব হবে বেশুমার। আমি হ্যাংলা বলে আপনিত সারা জীবনই আফসোস্ করে মরলেন। সেই আফসোস্ আর করতে হবে না। তবে নাকে মুখে কাপড় গুঁজেই ওর কাছে ঘেঁষতে হবে এই যা। ফরিদার শুষ্ক শীর্ণ মুখেও ফুটে উঠল চটুল হাসি।

'দেখ, আল্লাব বান্দাকে ঘৃণা করতে নেই। আল্লাহ্ তাতে না খোশ হন। আল্লার মর্জি কে বুঝতে পারে, তিনিই ওকে ঐ রকম বানিয়েছেন। ওর দোষ কি?'

মিনিট খানেক চুপ থেকে ফেব যোগ করলেন, আমি ভাবছি কত কানা খোঁড়া পুরুষের বিয়ে হচ্ছে, এমন কি সত্তর আশি বছরের বুড়োরাও বিয়ে করেছে কত কচি কচি মেয়ে আর এর বিয়ে হবে না। এ কেমন ইনসাফ? শুধু লুলো' বলে জীবনের একটা বড় লজ্জৎ থেকে এ একেবারে মাহরুম থাকবে এ কখনো খোদার হুকুম হতে পারে না।' সত্যই আন্তরিক বেদনায় মওলানার হৃদয় আলোড়িত হয়ে উঠল। মুখে পড়ল বেদনা ক্লিষ্ট অন্তরের কালো ছায়া।

পরদিন বাড়ীর চাকব গফুরকে এক পাশে ডেকে নিয়ে নিজেই প্রস্তাবটা পাড়লেন। গফুরের বৌ মারা গেছে বছর দুই, এ পর্যন্ত বিয়ে করেনি অর্থাৎ করার সামর্থ্য হয়নি।

মওলানা বললেন, সব রকম খরচ আমি দেব, ওকে সারা জীবন আমরাই রাখব, পালব। তোমার এক পয়সাও লাগবে না। বরং তোমাকে আমি শ'খানেক টাকা এমনিই দিচ্ছি যদি আলাদা ঘর দোর করতে চাও।

গফুর কিন্তু তাতেও রাজি হ'ল না। বললে, মিথ্যা কথাই বললে, 'হুজুর, আমি আর শাদীই করব না। শাদীর মজা হাড়ে হাড়েই টের পেয়েছি—আর না।'

মওলানা সাহেব এই ভাবে আরও দু' একজনকে বাগাবার চেষ্টা করে ব্যর্থকাম হলেন। ফলে তাঁর দুঃখ ও আফসোস গেল আরো বেড়ে।—কি করা যায়, কি করা যায়? ভেবে তিনি অত্যন্ত বে-করার হয়ে পড়লেন। তাঁর বাড়ীতে ও না থাকলে বা হামেশা না দেখতে পেলে তাঁর মন এই ভাবে হয়ত বে-করার ও অস্থির হ'ত না। চেষ্টা তিনি করেছেন, আরো করবেন। হাল ছাড়বেন না—এই তিনি সঙ্কল্প করলেন মনে মনে।

মসজিদে তাঁকে ইমামতী করতে হয়। এরি মধ্যে একদিন ভোর রাত্রে তিনি অন্দরের পুকুর থেকে অজু করে ফিরছিলেন। কাক ডাকেনি তখনো, কেউ জাগেনি কোথাও। এই ভাবে ছোবেহ সাদেকের আগে ওঠা তাঁর চিরকালের অভ্যাস। ঢেঁকি ঘরের পাশ দিয়েই পথ। দেখলেন আজ ঢেঁকি ঘরে কুপি জ্বলছে এই অসময়ে। স্বভাবতই তাঁর কিছুটা কৌতূহল হ'ল। বেড়ার ফাঁকে চোখ দিয়ে ভিতরে চেয়ে দেখলেন। কুপিটা সাম্‌নে রেখে লুলি বিছানার উপর বসে আছে, বুকে ছেঁড়া তেনাটুকুও নেই। চোখে মুখে অতৃপ্ত কামনার বহ্নি-শিখা যেন জ্বল জ্বল করছে। মাঝে মাঝে মাথার ছেঁড়া বালিশটা তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরছে। দুই গণ্ডদেশ বেয়ে ঝরে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম মনে হ'ল দেহে যেন তার চল্‌ছে ভূমিকম্পের প্রচণ্ড আলোড়ন। দেখে মওলানার পুষ্ট দেহও কাঁপতে লাগল বেতস পাতার মত।

কোন রকমে পা দুখানিকে টেনে নিয়ে তিনি নিঃশব্দে ঘরে ফিরে এলেন। ঘরে এসেও মাথার ঝাঁ ঝাঁ ও দেহের কাঁপুনী থাম্‌তে সময় লাগল বেশ খানিকক্ষণ। তারপর বার কয়েক আউজুবিল্লাহ পড়েও তৌবা তৌবা বলতে বলতে তিনি দ্রুত এগিয়ে চললেন মসজিদের দিকে।

লুলির বিয়ে দেওয়ার জন্য এইবার তিনি আরো মরিয়া হয়ে উঠলেন। পুরস্কারের টাকা বাড়িয়ে দু'শ করলেন। অর্থাৎ যে লুলিকে বিয়ে করতে সম্মত হবে তাকেই তিনি দেবেন দু'শ টাকা। বিয়ের খরচ, লুলির সারা জীবনের খাওয়া-পরার ভার সে সাথে ত আছেই। সে ত তিনি নেবেনই।

আশ্চর্য, তবুও পাওয়া গেল না কোন বর। কেউই রাজি হল না বিয়ে করতে ঐ লুলো মেয়েকে, যার পাশ দিয়ে চল্‌তে নাকে মুখে গুজতে হয় কাপড়। এখন থেকে লুলির চিন্তায় প্রায় রাত্রে মওলানার হতে লাগল ঘুমের ব্যাঘাত। আলেম-মানুষ তিনি—হালাল-হারাম, বেহেস্ত-দোজখ ও হুর গেলমান নিয়েই তাঁর কারবার তবুও সেদিন রাত্রে লুলির ঘরে যে দৃশ্য তিনি দেখেছেন তা

কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। মন তাঁর অস্থির হয়ে ওঠে বারবার। ফজুর মা কয়েক দিনের জন্য মেয়ের বাড়ী গেছে বেড়াতে। লুলির শরীর এখন যা হয়েছে ধরে তুলে বার করার আর দরকারই হয় না। একটা লাঠি ভর করে এক পায়েই সে এখন ছোট খাট নালা খন্দক পার হয়ে যেতে পারে। দাওয়ায় উঠা নামা ত করে অতি সহজেই। বিকলাংগের অসুবিধা গায়ের জোরেই সে এখন পুরিয়ে নেয়।

হঠাৎ এক মাঝরাতে মওলানার ঘুম যায় টুটে—ভাবেন লুলির কথা। আপনা থেকেই এসে যায় ভাবনা।

এ রকম এক রাত্রে মওলানা উঠলেন আলগোছে বিছানা ছেড়ে। ছেলে-মেয়েদের দিকে ফরিদা ঘুমুচ্ছে অঘোরে। এক হাতে নিলেন বদ্‌না অন্য হাতে টর্চ। নিঃশব্দে বদ্‌নাটা রাখলেন উঠানের এক পাশে। ঢেঁকি ঘরে বাতি নেই। বাঁশের দরজা—ঠেলে ঘরে ঢুকলেন, টর্চটা একবার জ্বেলে বিছানাটার অবস্থান দেখে নিলেন মুহূর্তে। লুলি ও পাশ ফিরে শুয়ে আছে। বোধ করি ঘুমুচ্ছে। হঠাৎ আস্ত একখানি মানুষের হাত তার উন্মুক্ত ও সমুন্নত বক্ষে এসে লাগল। তারও ঘুম গেল ছুটে - মুহূর্তে সর্বশরীর উঠল শিহরে। ভীতা—বিস্মিতা, লুলি হয়ত কি বা কে ধরে দেখার জন্য ভাল হাত খানি বাড়াতেই তা ঠেকল এমন এক মুখে যা ঘন চাপ-দাড়িতে ভরা। সে জানে এই বাড়ীতে ঐ রকম দাড়িওয়ালা মুখ একখানিই মাত্র আছে।

মুহূর্তে সর্বদেহ যে এমনভাবে স্বয়ংক্রিয় হয়ে উঠতে পারে এই অভিজ্ঞতা লুলির জীবনে এই প্রথম। নৈশ অন্ধকারে জৈব ক্ষুধার আদিম শিকার দুই নরনারীর জীবনে রইল না দিনের বেলার কোন বৈষম্য, তলিয়ে গেল মুহূর্তে সব রুচি ও পাপ পুণ্যের হিসাব-নিকাশ। জেগে রইল শুধু আদি ও অকৃত্রিম মানুষ।

আশ্চর্য, মোহাম্মদ হোসেন ফিরে গিয়ে আজ আউজুবিল্লাহ পড়লেন না একটি বারও। হয়ত ভুলেই গেলেন, হয়ত মনেই হল না আজ শয়তানের কথা।

লুলির দেহ ও মনে কিন্তু বয়ে চলল এক অজ্ঞাত আনন্দের ফল্গুধারা। নুলো হাত পাও আজ তার কাছে মনে হ'ল পরম সম্পদ। মনে হ'ল জীবনটাই একটা মস্ত বড় নেয়ামৎ। বেলা ন'টা পর্যন্ত সে আজ বিছানা ছেড়ে উঠলই না। দরজা ফাঁক করে কে একজন তার বরাদ্দ পান্তাভাতের মাটির বাসনটা রেখে গেছে সেই সাত-সকালে। হঠাৎ একটা কুকুর ঢুকে তাই খেতে লাগল

সপ্ সপ্ শব্দ করে। লুলি চোখ মেলে তাকালো। ক্লান্ত ক্ষুধিত লুলি দুই প্রসন্ন কৌতূহলী চোখ মেলে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে কুকুরের খাওয়া দেখতে লাগল। জিভ্ দিয়ে চেটে খাওয়া, লুলির কাছে ভারী অদ্ভুত ও আশ্চর্য মনে হ'ল আজ।

প্রায় মাস ছয় কাটল।

একদিন ফজরের নামাজের পর মসজিদ থেকে এসেই মওলানা ঘোষণা করে বসলেন: তিনি হজে যাবেন। আজ তিনি মসজিদে যাওয়ার আগে ভোর রাত্রে উঠে গোসল করেছেন। ঘুম থেকে উঠে ফরিদা ঘরের ভিতর ভিজা লুঙ্গী দেখে কিছুটা অবাক হয়েছিল। যে ছেলেটা বিছানায় প্রস্রাব করে সেটা ত তাঁর পাশে শোয় না। স্বামীকে ঠাট্টা করে কি জিজ্ঞাসা করবে—এতক্ষণ ধরে ফরিদা মনে মনে তারই মহড়া দিচ্ছিল। কিন্তু মওলানা ফিরে এসে তাঁর এই মহৎ সঙ্কল্পের কথা প্রচার করতেই তার সব কথা ও খেয়াল গেল গুলিয়ে। কথাটা দ্রুত বাড়ীময়, বাড়ী থেকে আশে পাশের ঘরে এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পাড়াময় রাষ্ট্র হয়ে পড়ল মওলানা হজে যাচ্ছেন।

সময় বেশী নেই। সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই প্রয়োজনীয় দরখাস্ত ও পাসপোর্ট ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে।

ভাইরা ছুটে এসে বললে, 'এত অল্প সময়ের মধ্যে টাকার যোগাড় হবে কি করে? আগামী বছর যান না কেন, ভাইজান?'

'না, আমি নিয়ত করে ফেলেছি। এই বারই যেতে হবে। টাকা কোন রকমে যোগাড় করা চাই-ই।'

ভাই একধারে হাফেজ ও মওলানা তদুপরি হাজী হয়ে ফিরে এলে পারিবারিক নাম ইজ্জৎ আরও অনেক বেড়ে যাবে। অতএব জমি বিক্রয় করে হলেও ভাইরা টাকা যোগাড়ের সঙ্কল্প করল।

কিন্তু জমি বিক্রী আর করতে হ'ল না। কে জানত পাড়ায় এত লোকের মনে মনে এত সব মানস ছিল, আর মেয়েদের ছিল এত সব নিজস্ব সঞ্চয় ও তহবিল! কথাটা রাষ্ট্র হতেই এক টাকা দু'টাকা থেকে দু'দশ বিশ যে যা পারে মওলানা সাহেবের হাতে দিয়ে নিজেদের সাধ আরজু ও মানসের কথা জানালো। কেউ বলল আমার জন্য একটু জমজমের পানি। কেউ বলল আমার জন্য কিছু খোরমা, কেউ বলল ওখানকার কিছু তেঁতুল, কেউ বলল উটের সস্তা গোস্ত আনবেন। কেউ টাকা দিলে কাফনের, কেউ দিলে জেয়ারৎ

করার। কেউ দিলে শুধু দোওয়া করার জন্য। কেউ দু'টো টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে বললে—আমার জন্য ওখানকার শুধু একটু মাটি…। কেউ কেউ মৃত মা-বাপের জন্য হজ করার টাকা গছালে তাঁর হাতে। এমন কি বুড়ী ফজুর মাও দশ টাকার একখানা নোট দিয়ে বল্লে, 'আমার জন্য এক কাফনের কাপড় আনতে হবে বাব।' ফজুর মা ত আর জানে না সেই কাপড় তৈয়ারী হয় ওয়াশিংটন আর ম্যাঞ্চেষ্টারে? সে জানে মক্কা শরীফ থেকে আনীত কাফনে তার মৃত দেহ দাফন করা হলে তার আর কোন গোর আজাবই হবে না এবং সারা জীবন দুই মনিব বাড়ী থেকে সে যা সরিয়েছে আখেরাতে তারও আর কোন জবাবদিহি হতে হবে না। সব গোনাই তার হয়ে যাবে মাফ। তাই তার বহু কষ্টের সঞ্চয়ও সে এনে দিলে মওলানার হাতে। দেশে ফজুর মা ও ফজুর বাপের সংখ্যা ত নেহাৎ কম নয়। কাজেই মওলানা সাহেবের হজের টাকার জন্য জমি আর বিক্রী করতে হল না। বরং ভাইরা হিসাব করে দেখলে—ভাইজান যদি একটু হিসেব করে চলেন বেশ কিছু নগদ টাকা ফেরৎও আসতে পারে। করাচী থেকে বিবিদের জন্য এক একখানা শাড়ী আনলেও ত যথেষ্ট—এখানে শাড়ীর যা দাম। ওদিকে সোনা নাকি খুব সস্তা, চাই কি ইচ্ছা করলে সব বৌয়ের জন্য এক এক পদ অলঙ্কারও হয়ে যেতে পারে। কথা হচ্ছে ভাইজান ইচ্ছা করবেন কি? মুখ খুলে অবশ্য তাঁকে এই সব দুনিয়াভী কথা বলা যায় না। মওলানা সাহেবের বিবি বলে ভাবীর সামনে তাদের যাওয়া কি বাতচিৎ করা একদম মানা। না হয় ভাবীকে দিয়েই তারা সওয়ারের সঙ্গে এই সুবিধার দিকটাও ভাইজানকে বুঝিয়ে দিতে পারত।

জমি যে বিক্রী করতে হ'ল না এতেও অবশ্য কম খুশী হ'ল না তারা। এখনো ত ঘর থেকে বেরিয়ে রেলে চড়ে বসা পর্যন্ত যে যা দেবে তা ত বাকিই আছে। কাজেই ঘর থেকে এক পয়সাও বের করতে হ'ল না।

দুলা ভাই যাচ্ছেন হজে—দীর্ঘ সফরে। তাই যথারীতি বিদায় দিতে শালা সম্বন্ধীরাও এসে পড়েছেন। কবির মিয়া অর্থাৎ এ, কে, এম, কবির উদ্দীন আহমদ, যে শহরের কলেজে ফোর্থ ইয়ারে পড়ে, মায়ের অনুরোধে সেও এসেছে। গ্রাম দেশে এলেও সে পরে পায়জামা ও হাফশার্ট, মাথায় দেয় না টুপি। অনেকের বিশ্বাস সে নমাজ রোজার ধারও ধারে না, ফলে অনেকেই তাকে দু'চোখেও দেখতে পারে না। নামাজের জন্য তম্বি করেছিল বলে ভগ্নিপতি মওলানা সাহেবকে পর্যন্ত সে একবার শরিয়তের দারোগা বলে ঠাট্টা

করেছিল। ফলে মওলানা সাহেব চটে মটে লাল হয়ে তার সঙ্গে বাক্যালাপই বন্ধ রেখেছিল পুরা এক বৎসর।

তাকে দেখে এইবার মওলানার গম্ভীর মুখ অধিকতর গম্ভীর হ'ল। মনে মনে ভাবলেন—নিশ্চয়ই দোওয়া চাই—এই বার বি, এ পরীক্ষা দেবে কিনা। হয়ত মক্কা শরীফে বসে তার পাশের জন্য দোওয়া করতে বলবে। দারোগা বলে যত ঠাট্টাই করুক, ঠেকায় সকলকেই দারোগার দ্বারস্থ হতে হয়।—দুনিয়াভী ব্যাপারে যেমন আখেরাতের বেলাও তার ব্যতিক্রম নেই।

কথাটা ভেবে মওলানা মনে মনে একটু হাসলেনও।

মওলানার অনুমান মিথ্যা নয়। মা এই উদ্দেশ্যেই কবিরকে পাঠিয়েছেন। কবির কিন্তু এসেছিল মা'র অনুরোধ এড়াতে না পেরেই। না হয় ওসবে তার আস্থাও নেই, বিশ্বাসও নেই। তাই বলেওনি সে কোন রকম দোওয়ার কথা দুলাভাইকে। বরং মওলানার গাম্ভীর্যকে অগ্রাহ্য করে কবির বলে উঠল, "মক্কা শরীফ থেকে আমার জন্যে কি আনবেন দুলাভাই। বলেন দেখি?"

'জমজমের পানি ছাড়া গরীব মানুষ আর কী আনব।" কিছুটা নির্লিপ্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গেই মওলানা উত্তর দিলেন।

"ও পানি আমি কিছুতেই খেতে পারব না দুলাভাই। কয়মাস ধরে টিনে আবদ্ধ থাকে, টিনটা আদৌ ধোওয়া হয় কিনা তার ঠিক নেই, কত রকম জারমই যে ওখানে ঢোকে তার কি হিসাব আছে? আর এক রকম যা বিদঘুটে গন্ধ হয়। ও আমি কিছুতেই খেতে পারব না দুলাভাই। ও আনবেনই না, পবিত্র স্থানের জারম্ হলেও ওতে রোগীর মউত আটকায় না।'

'তৌবা তৌবা পাক জিনিষ সম্বন্ধে ওভাবে কথা বললে গোনাহ হয়।' উত্তর দিলেন হাজী নাছির আলী। তিনি এ পর্যন্ত তিনবার হজ করেছেন। মওলানাকে ওখানকার হাল-হকিকৎ বাৎলাবার জন্যই এসেছেন।

'সত্য কথায় গোনাহ হয় না দুলা ভাই।' হাজী সাহেবকে অগ্রাহ্য করেই কবির উত্তরটা দিলে।

পাশের গ্রামের জনাব মুজিবর হক চৌধুরীও তখন ছিলেন হাজির। তিনি তাঁর বাবার বদলে হজের জন্য টাকা দিতে এসেছেন। চৌধুরী সাহেব সেই অঞ্চলের ইউনিয়ন বোর্ড, মুসলিম লীগ, ঈদ-বি-ইউনিয়ন কমিটি, বাজার সমিতি রিলিফ কমিটি ইত্যাদির প্রেসিডেন্ট। নাম বলতে হয় না প্রেসিডেন্ট সা'ব বললে ও অঞ্চলে একমাত্র তাঁকেই বোঝায়। এইবার নতুন করে তিনি স্কুল

কমিটিরও প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। খুব দূরদর্শী লোক—আগামীবার ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ড্, তারপর হয়ত এসেম্বলী। মনে মনে এই তাঁর খসড়া। মন্ত্রীর খোওয়াব অবশ্য এখনো দেখতে শুরু করেননি তিনি। সময়ে সেই খোওয়াবও যে তিনি দেখবেন এই বিষয়ে স্থানীয় লীগ মহলে এখন থেকেই কানা ঘুষা চলছে।

কবিরের কথা শুনে তিনি বেশ বিরক্তি ও উষ্মার সঙ্গেই বলে উঠলেন, 'হাজী সাহেব কথায় এদের সঙ্গে পারবেন না, ওরা হচ্ছে কমিউনিষ্ট—তর্কে ওদের হারাতে পারে এমন বান্দা এখনো পয়দা হয়নি।'

কমিউনিষ্ট কি বস্তু মওলানার তাও জানা ছিল না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'চৌধুরী সাহেব, কমিউনিষ্ট কাকে বলে?'

বিরক্তি-মিশ্রিত কণ্ঠে চৌধুরী সাহেব বললেন, 'ওরা আল্লাহ্ রসুল মানে না, নামাজ রোজারও ধার ধারে না, খালি ভাত কাপড়ের কথাই ওদের মুখে শুনতে পাবেন। ভাত কাপড়ই ওদের সব, পেট আর পিঠ ছাড়া ওরা কিছুই মানে না।'

কবিরও ছাড়বার পাত্র নয়। বললে, 'চৌধুরী সাহেবের কথাটা আংশিক সত্য। কমিউনিষ্ট হই বা না হই আমাদের কথা এই যে আগে মানুষের ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করতে হবে, পরে মানুষ আপনা আপনিই ধর্ম কর্ম ও সাহিত্য শিল্পের দিকে ঝুঁকবে।'

ভাত কাপড়ের কথা শুনে মুহূর্তে মওলানার চোখের সামনে লুলির চেহারা উঠল ভেসে। যদ্দিন ভাত কাপড় জোটেনি তদ্দিন তার চেহারা ছিল চামচিকের মত, চর্মসার দেহে এতটুকু চিহ্ন ছিল না মেদ মাংসের। কেউ একজন সাহায্য না করলে চলতে ফিরতে কষ্ট হত তার। এখন নিয়মিত ভাত কাপড় যখন পাচ্ছে তার সারা দেহে ঘটছে অঘটন। যৌবনের ভারে দেহ যেন তার পড়ছে ফেটে। নুলা পা টেনে টেনে সে এখন ঘুরে বেড়াতে পারে এখান থেকে সেখানে—এ পাড়া থেকে ও পাড়া। এক হাতে যতটুকু পারে বাড়ীর কাজেও নাকি এখন আসে এগিয়ে, করতে চায় এটা সেটা।

সব চেয়ে আশ্চর্য, একদিন মওলানার কাছে এসে বলে কিনা, "আমি নামাজ পড়ব! কিন্তু কি করে পড়ব। নিয়ত জানি না, সুরা জানি না, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি না, ভাল করে বসতে পারি না, কাপড়-চোপড়ও নিজে ধুতে পারি না বলে অনেক সময় থাকে নাপাক। তবুও হুজুর মন চায় নামাজ পড়তে…।'

মওলানা সাহেব সেদিন তাকে বলেছিলেন ; 'মন আল্লার দিকে রুজু হলে যেমনি ভাবে পার তাঁকে ডাকবে। শুধু সেজদা দিয়ে তোমার মনের কথা আল্লাহ্‌কে বলবে, তাঁর কাছে মাফ চাইবে সব গোনাহ্‌, তাতেই তিনি হবেন খুশী।'

কি জানি কেন হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল কবিরের কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়। লুলিই ত তার জীবন্ত প্রমাণ।

কবির আবার বলে উঠল, "আচ্ছা দুলাভাই এই মর্মে এক হাদিস আছে না যে, খানা যদি তৈয়ার থাকে আগে খানা খেয়ে নাও পরে নামাজ আদায় করবে।'

মওলানা 'হাঁ, ঐ মর্মে একটি হাদিস আছে বই কি।'

কবির, 'তা হ'লে আমাদের দোষ কোন্ খানটায় শুনি! আমরাও ত সেই কথাই বলছি—আগে মানুষের পেটের আগুন নেবাও তারপর তাকে আল্লাহ রসুল ও বেহেস্ত দোজখের কথা শোনাও—তখনই সে তা মন দিয়ে শুনবে। দুলাভাই জানেন? এক ইংরেজ লেখক বলেছেন টাকা পয়সা অর্থাৎ যা দিয়ে ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা হয়—তা হচ্ছে মানুষের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। ঐ ইন্দ্রিয় না থাকলে আর পাঁচটা ইন্দ্রিয়ও ভোঁতা হয়ে যায় অকেজো হয়ে পড়ে।'

মওলানার মনে আবার লুলির চেহারা উঠল ভেসে। ভাত কাপড় না পেলে তার এই স্বাস্থ্য লাবণ্য কোথায় থাকত? কোথায় ছিল এতদিন? তাজা ও নিটোল আপেলের মতো দুই পুরুষ্টু স্তনে আজ যে তার বুক ভরে গেছে তা কি কখনো সম্ভব হ'ত? বে-দীন নচ্ছারার কথা হলেও তিনি দেখলেন কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়।

চৌধুরী সাহেব গা তুললেন। তবে যাওয়ার আগে বলে গেলেন, 'পাকিস্তান হ'ল আল্লার মুল্লুক, এখানে কায়েম হবে আল্লার সোলতানৎ, এখানকার ধন দৌলত মালমাত্তা ধান গম পাট সবই আল্লার সম্পত্তি—সেই সম্পত্তি আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা দেবেন, না তার বিরুদ্ধে আপত্তি করা আল্লার সঙ্গে দুশমনি করা ছাড়া আর কি? মওলানা সাহেব, এই কমিউনিষ্টরা হচ্ছে আল্লাহ্‌ ও রসুলের দুশমন, আমার ইউনিয়নে তাই আমি এদের ঢুকতেই দিই না, এ নেহাৎ আপনার ভাই সাহেব বলেই আজ বেঁচে গেল।'

'তা হলে চৌধুরী সাহেব, আপনার গোলাভরা ধানটাও ত আল্লার সম্পত্তি,

আল্লার যে-সব বান্দা খেতে পাচ্ছে না—তার থেকে কিছু দেন না কেন ওদের ?' বেশ শান্ত কণ্ঠেই কবির বলে উঠল।

'আল্লার তাই যদি উদ্দেশ্য হ'ত তা হলে ঐ ধান তিনি আমার গোলায় না দিয়ে দিতেন ওদের গোলায়। জানেন, আল্লার হুকুম ছাড়া একটা বালি এদিক ওদিক হতে পারে না ?' আল্লার মহিমায় গদ গদ হয়ে বললেন চৌধুরী সাহেব।

'তা হ'লে এদের দাবিই ত আল্লার দাবি, এদের জবান দিয়েই আল্লাহ বলাচ্ছেন শুধু! আল্লার ইচ্ছা এ ভৌতিক না হলে এরা কি এই ভাবে ভাত কাপড়ের দাবি করতে পারত ? দেন না আপনার গোলা থেকে কিছু ধান আল্লার এই সব গরীব বান্দাদের।' মিনতির সুরেই বললে কবির।

গা তুললেন চৌধুরী সাহেব। 'আল্লাহ্ নিজে যাদের দেন নি, আমি তাদের দিয়ে অনর্থক আল্লার নাফরমানী করতে যাব কেন ? আল্লাহ রহমানুর রহিম, আমার গোলার ধান ত তাঁরই দান।' শোকর আল হামদুলিল্লাহ বলে হন হন্ করে বেরিয়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট সা'ব। রাগের চোটে অভ্যস্ত সালাম আলায়কুম বল্‌তেও তিনি ভুলে গেলেন আজ। পরদিন ভোরেই মাওলানা সাহেবের যাত্রা করার কথা। রাত্রে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফরিদা ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বললে। শুনে তাঁর পক্ষে কিছুমাত্র অবাক হওয়ার কথা নয়। তবুও অবাক তিনি হলেন, এমন কি যেন আসমান থেকেই পড়লেন তক্ষুনি।

ফরিদার কণ্ঠ এবার স্পষ্টতর হ'ল, 'মুলা মেয়ে বলে মেহেরবানী করে আশ্রয় দিয়েছিলেন এখন ঠেলা সামলান আপনি ত চললেন, কে সামলাবে এ সব ঝামেলা এখন ?'

এমন অভাবনীয় সংবাদেও মওলানা কিন্তু কোন সাড়াই দিলেন না। তাঁর যেন বিস্ময়ের ঘোর এখনো কাটে নি।

ফরিদাই ফের বললে, 'আচ্ছা এমন কাণ্ড কে করল ? এমন মুলো মেয়ের সর্ব্বনাশ এক জানোয়ার ছাড়া কে করতে পারে ?'

মওলানা কোনরকমে বললেন,—'আর কেউ জানে ? সে কিছু বলেনি ?' মওলানার কণ্ঠস্বর ভীতিবিহ্বল ও কম্পিত।

ফরিদা, "এখনো বোধ হয় কেউ জানে না। আমার জা'য়েরা অবশ্য সন্দেহ কচ্ছে আজ কয়দিন ধরেই। এখনো তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

কিন্তু চেহারা ও শরীরের লক্ষণে মনে হচ্ছে ঠিকই। কয়দিন ধরে নাকি খেতেই পাচ্ছে না, খেতে বসলেই নাকি বমি করে⋯দেখে আমারও পুরোপুরি সন্দেহ হয়।'

বাকি রাত্রি মওলানার আর ঘুমই হ'ল না। সকালে যথারীতি তিনি যাত্রা করলেন। তবে মুখ তাঁর সারা পথ অতিমাত্রায় গম্ভীর ও বিষণ্ণ হয়ে রইল। তীর্থ-যাত্রা পুণ্য কাজ, তাই লোকে জোর করে হলেও হাসে। লোকেরা আশ্চর্য হ'ল, মওলানার মুখে হাসি ফুটল না একটি বারও। ট্রেনে তুলে দিয়ে আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীরা ফিরে এল যে যার ঘরে।

শহরে এসে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে মওলানা সাহেবও হাজী ক্যাম্পেই উঠলেন। কিন্তু জাহাজ ছাড়ার আগের দিন কাকেও কিছু না বলে তিনি সরে পড়লেন ক্যাম্প থেকে।

জাহাজ ছাড়ার সময়ও সঙ্গীরা তাঁকে খুব করে খুঁজলেন ইতস্তত। কিন্তু কোন সন্ধানই মিলল না তাঁর কোথাও। জাহাজ যথা সময় দিল ছেড়ে। পরিচিত হজ-যাত্রীদের কেউ কেউ ভাবল- হয়ত পরের জাহাজেই আসবেন তিনি, মওলানা সাহেব দিন কয় শহরে আত্মগোপন করে থেকে রওয়ানা দিলেন সিলেট। জেয়ারত করলেন শাহ জালালের দরগা। সিলেট থেকে গেলেন ঢাকা, সোনারগাঁ, শাহজাদপুর, কোনটাই বাদ দিলেন না, নামাজ পড়লেন, জেয়ারত করলেন সেখানেই। ফিরে এলেন চাটগাঁ বায়জীদ বোস্তামীর দরগা, শাহ আমানত ও বদর শাহের রৌজায় গেলেন—জেয়ারত করলেন অত্যন্ত ভক্তির সাথে। দিলেন সব দরগায় প্রচুর মোমবাতি- এমন কি দিনেও জ্বালালেন বহু। তবুও মনে যেন শান্তি ও স্বস্তি পেলেন না কিছুতেই। এইভাবে দিন পনের কাটিয়ে তেমনি গম্ভীর ও বিষণ্ণ মুখে একদিন ফিরে এলেন দেশে। দেখে সবাই ত তাজ্জবের একশেষ। পাড়ার আবাল বৃদ্ধবনিতা সবাই হ'ল অবাক। তার ভাইরা আশ্চর্য হ'ল সকলের চেয়ে বেশী।

কৌতূহলীদের তিনি শুধু বললেন, 'এইবার হজ আমার তকদিরে ছিল না। মন কিছুতেই এগুতে চাইল না সামনের দিকে। টিকিটের টাকাটাই নষ্ট হ'ল--। তকদিরে থাকে ত আগামী বার ইনশা আল্লাহ্ যাবোই।

"যে যা টাকা পয়সা দিয়েছিল, পাই পয়সা হিসেব করে তা তিনি ফেরৎ দিলেন সবাইকে। ভাইরা এবার মনে মনে না-খোশ হ'ল আরো বেশী।

কিন্তু দেশ-শুদ্ধ লোক শুধু অবাক নয়, একেবারে আসমান থেকে পড়ল দিন

হুই পরে যখন মওলানা প্রচার করলেন—তিনি লুলিকে বিয়ে করবেন। তাঁর ভাইদের মাথা কাটা গেল লোকের সামনে। রাগে গোসায় তারা ফেটে পড়ল তাঁর উপর। কিন্তু মওলানা কিছুতেই টললো না। তাঁর মাদ্রাসার এক মোদাব্‌রেস্‌কে ডাকিয়ে এনে সেই রাত্রেই তিনি কলমা পড়ার কাজটা শেষ করে ফেললেন।

লুলির সম্বন্ধে যে ব্যাপারটা এই কয়দিন মেয়ে মহলে শুধু অনুমান ও কানাকানির মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ তা এইবার সকলের কাছে দিবালোকের মতোই হয়ে উঠল স্পষ্ট, লজ্জা শরম ও ক্রোধে সমস্ত অঞ্চল যেন ফেটে পড়ল মওলানার উপর।

'হুনিয়ায় কাকেও বিশ্বাস করতে নেই।' বললে কেউ কেউ।

'এত বড় হাফেজ-মওলানা হয়ে এই কাণ্ড।' বললে আর এক পক্ষ।

'কেয়ামৎ নজ্‌দিক, কেয়ামৎ নজ্‌দিক—এ তারই আলামৎ।' যোগ করল আর এক বিজ্ঞজন।

'শেষ কালে রক্ষক হয়েই ভক্ষক হলেন মওলানা।' আর একটি বিস্মিত কণ্ঠের উক্তি।

'এত বড় ভণ্ডের পেছনে এতকাল নামাজ পড়লাম, তৌবা, তৌবা।' এক বুড়া মুসল্লী বলেই থুথু ফেল্‌তে লাগল।

'আল্লাহ্‌ বাঁচিয়েছেন, আর একটু হলেই মওলানা এই হারামের বোঝা আমার ঘাড়েই দিতেন চাপিয়ে।' বলাই বাহুল্য গফুরেরই কণ্ঠস্বর।

ফরিদা এই দু'দিন ধরে শুধু মৃত্যু কামনাই করেছে। না ডাকতেই যে-মৃত্যু আসে ফরিদার বহু ডাকা ডাকিতেও কিন্তু সেই মৃত্যু এল না। অগত্যা দিনের বেলায়ও মশারি খাটিয়ে সে তার নীচে শুয়ে রইল। মুখ দেখাবে সে কেমন করে? মওলানা সাহেবের বিবি বলে মনে মনে তার বেশ কিছুটা দেমাক ছিল। সেই দেমাক মাঝে মাঝে বাইরেও যে প্রকাশ না পেত তা নয়। সেই দেমাক কিনা একটা ভিখারিনী মুলো মেয়ের পায়ের নীচে এই ভাবে ভেঙে হ'ল খান খান। মশারির নীচে বসেই ফরিদা কপালে করাঘাত করতে লাগল বার বার।

এরপর সারা অঞ্চল ব্যাপী যে প্রতিক্রিয়া শুরু হ'ল তার প্রথম ধাক্কায় মওলানার মাদ্রাসাই গেল উঠে। মিলাদ-জেয়াফত ইত্যাদির দাওয়াৎও হ'ল বন্ধ। মসজিদের ইমামতীও গেল খসে। খতম পড়ারও হ'ল খতম।
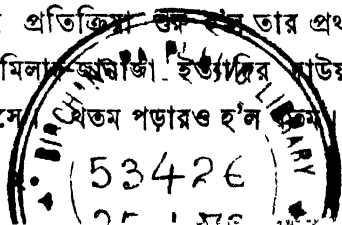
"এমন লোকের পেছনে নামাজ পড়বে কে ? সবার মুখে এই এক প্রশ্ন। ভাইরা বজ্রের মত ফেটে পড়ল : 'আহাম্মক কোথাকার ! হয়েছিল যদি এক কাম হয়েছিলই। হজে যাচ্ছিল চলে যদি যেতে কে এত সবের খবর নিত, কে টের পেত ? কেউ এক জনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেই চলত। লুলিকে শহরে বা অন্যত্র সরিয়ে ফেললেই সব হাঙ্গামা যেত চুকে। বেকুবের মত বিয়ে করতে গিয়েই ত যত সব জানাজানি, আহাম্মক আর কাকে বলে ? না, এমন আহাম্মকের সঙ্গে আমরা আর থাকব না।'

ছোট ভাইটি অধিকতর বিজ্ঞতার সঙ্গে বললে, "আমাদের ডেকে গোপনে বললেই ত হ'ত, অন্য কাউকেও রাজী করান না গেলে আমরাই একজন না হয় স্বীকার করে নিতাম। ওর মান ইজ্জতটা ত বহাল থাকত।"

নিজেদের মান ইজ্জৎ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই হয়ত ভাইরা মওলানাকে পৃথক করে দিল তাড়াতাড়ি।

পৈত্রিক জমিজমা এমন কিছু বিরাট ব্যাপার ছিল না। ভাইরা নিজের নিজের হাতে চাষবাসের কাজ করত বলেই সংসার স্বচ্ছন্দে চলে যেত। ভাগাভাগির খবর পেয়ে বোনেরাও একের পর এক শ্বশুর বাড়ী থেকে এসে হাজির হ'ল বাপের বাড়ী। তাদের দাবি তারা ছাড়বে কেন ? মওলানারা তিন ভাই ও চার বোন। ভাগাভাগি করে প্রত্যেকের অংশে যা মিললো তা অতি সামান্য। নিজের হাতে চাষ করতে পারলে হয়ত কোন রকমে টানা হ্যাঁচড়া করে সংসার চলতে পারে।

মওলানারই হ'ল বিপদ। তিনি ত জীবনে কোনদিন নিজের হাতে চাষবাসের কাজ করেন নি। অথচ আজ তার অন্য সব রকম আয়ের পথ বন্ধ। মা'শাল্লাহ তার বালবাচ্চার সংখ্যা ত কম নয়। বিবি ও বালবাচ্চাকে তিনি ত আর উপুস রাখতে পারেন না। একদিন বড় ছেলেটাকে সঙ্গে করে হাটে গিয়ে মওলানা কিনে নিয়ে এলেন এক জোড়া বলদ। লাঙ্গলও একটি খরিদ করলেন তার পরের দিন। মনে মনে ভাবলেন : হজরতও নিজের হাতেই রুজি রোজগার করতেন। পরদিন ভোরে সমস্ত পাড়া অবাক বিস্ময়ে দেখল : হাফেজ মওলানা মোহাম্মদ হোসেন সাহেব নিজের হাতেই লাঙল ধরেছেন, খবর পেয়ে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে সেই অঞ্চলের দূর গ্রাম থেকেও বহু লোক এসে বিলের ধারে জড় হ'ল। মওলানা কিন্তু ভ্রূক্ষেপও করলেন না এই কৌতুহলী জনতার দিকে।

নিজের হাতে চাষ না করলেও মওলানা চাষী পরিবারের ছেলে, চোখে দেখছেন সব কিছুই। কাজেই কষ্ট হলেও খুব বেগ পেতে হ'ল না। দু'একদিনের মধ্যেই অনেক কিছুই শেখা হয়ে গেল। সপ্তাহ দু'য়েকের মধ্যেই চাষের প্রায় কাজে এক রকম হাত এসে গেল তাঁর। মানুষ অভ্যাসের দাস— মওলানার বেলায়ও তা আর একবার হ'ল প্রমাণিত।

সময়ে দেখা গেল করিদা নিজের কাবিনের শর্ত নিজেই লঙ্ঘন করতে লাগল একটার পর একটা। ছেলে মেয়েদের নিয়ে সে নিজের হাতে শুরু করল ধান মাড়াতে ও ভানতে। এমন কি গোয়াল ঘর পর্যন্ত সাফ্ করতে লাগল নিজে। দেখে মওলানা নিজেই হ'ল তাজ্জব, অন্যদের ত কথাই নেই।

মওলানার এই সব কাণ্ডে বলাই বাহুল্য শুধু তাঁর ভাইদের নয়, তাঁর শ্বশুর বাড়ীর মাথাও গেল কাটা। লজ্জা-শরমে তাঁরা এখন এই দিকে আসাই দিল ছেড়ে।

মওলানার শ্বশুর একদিন বিবিকে শুনিয়ে শুনিয়েই বললেন, 'ফরিদা বলে আমার কোন মেয়ে নেই, ছিল যে মনে করো সে মরে গেছে।' শ্বশুর জামাইয়ে এর পর থেকে মুখ দেখাদেখি হ'ল বন্ধ। এক পক্ষের ছেলেমেয়েরা ছাড়ল বোনের বাড়ী যাওয়া, আর পক্ষের ছেলেমেয়েরা ছাড়ল নানার বাড়ী আসা। এই সব খবর শহরে কবিরের কানেও যে যায়নি তা নয়। সে কিন্তু রইল নির্বিকার। হয়ত কালের চাকা ঘোরার একটা ইঙ্গিত সে এই সবের মধ্যে দেখতে পেল। মনে মনে হয়ত খুশীই হ'ল।

একদিন মওলানা, তাদের পিটা-বাড়ীর পাশের জমিতে ধান ফেলার জন্য খুব করে মই দিচ্ছিলেন। বলদ জোড়ার মত তাঁরও সর্বাঙ্গ হয়েছে কর্দমাক্ত। দেখলে চেনাই যায় না। হঠাৎ চোখ তুলতেই দেখতে পেলেন অদূরে আলোর উপর দাঁড়িয়ে সাদা ধব ধবে পাজামা আর হাফ্ সার্ট-পরা এক ভদ্রলোক মৃদু মৃদু হাসছেন তাঁর দিকে তাকিয়ে। দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কবির ভাইযে, এসেছ? হঠাৎ এদিকে কেমন করে পথ দেখলা?'

কবিরও হাসি মুখে বলল, 'চোখ থাকলেই পথ দেখা যায়।'

'দুলা ভাই, আপনি কেমন ধারা লোক শুনি, আজাদী দিবসেও আজ লাঙল

চালাচ্ছেন? আজ যে ১৪ই আগষ্ট, মনে নেই বুঝি? শহরে আজ সব কাজ কাম বন্ধ। আমাদের কলেজও ছুটি। ভাবলাম দুলাভাইর নূতন জীবনটা একবার দেখে আসি।'

মওলানা তিনি আর নন্। এখন শুধু মোহাম্মদ হোসেন হয়েই বললেন, 'আমরা ভাই চাষী মানুষ। কাজ করেই আমরা পালন করি আজাদী দিবস। আপনাদের মত শহুরে ও ইংরেজি ওয়ালারাই শুধু কোনরকম কাজ না করেই আজাদী দিবস পালন করে থাকেন। অমন আরাম আয়াসী উৎসব আমাদের পোষায় না। ভাইয়া, যে ভাত কাপড়ের কথা বলেন সেই ভাত কাপড় এই ভাবে রোজ রোজ মেহনত করেই রোজগার করতে হয়। সব সময় ধোপ—দোরস্ত কাপড় পরে থাকলে আমাদের মোটেও চলে না—জোটে না ভাত-কাপড়। আচ্ছা এসে কাঁধ মিলান দেখি।' হাসতে হাসতে যোগ করলেন—'বলদের সঙ্গে নয়, আমার সঙ্গেই মিলাতে বলছি।' বলেই আর এক চোট আসমান ফাটা হাসি হেসে উঠলেন মোহাম্মদ হোসেন।

কবির বেশ কিছুটা অবাক হয়ে ভাবল—দুলাভাই যদ্দিন হাফেজ মওলানা মোহাম্মদ হোসেন ছিলেন তদ্দিন ত কখনো এমন হাসি মসকরার কথা তাঁর মুখ দিয়ে বের হয়নি। এমন দিল-খোলা হাসিও কোনদিন শুনা যায়নি। মেহনত কি তাঁর মত লোকের মনেও রসিকতা জাগিয়ে তুলল?

খাওয়া দাওয়ার পর কবির তার এ্যাটাচি কেস্টা বের করল। খুলে চকোলেটের প্যাকেটটা ডেকে ছেলে মেয়েদের হাতে দিয়ে দিলে। কাগজে-মোড়া দু'খানা শাড়ীও ওখান থেকে হ'ল বের—একই রঙের। একই রকমের শাড়ী, একখানা ফরিদার হাতে দিলে। আর একখানা হাতে নিয়ে সে যেন ইতস্তত করতে লাগল।

মোহাম্মদ হোসেন বললেন, 'ওখানা কার?'

'লুলি আপা কই? এখানা তাঁর জন্য।

লুলি দরজার ওপাশেই ছিল। তার এত বয়স পর্যন্ত কোন না-বালক শিশুও তাকে আপা বলে ডাকেনি আর এমন দামী শাড়ীও কেউ তাকে কোন-দিন দেয়নি কিনে। বিয়ের পরেও তাকে পরতে দেওয়া হচ্ছে ফরিদার পুরোনো কাপড়। তার দু'চোখ জলে ভরে এল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কেঁদে উঠল সশব্দে। খুশীতেও যে লোক এমন করে কাঁদে এই দৃশ্য এই প্রথম কবির দেখলে। লুলির এতদিনের উপেক্ষিত লাঞ্ছিত মানবতা আজ সর্ব-

প্রথম তার এই চোখের জলের ভিতর দিয়েই যেন আত্ম-প্রকাশের সুযোগ পেল।

প্রায় এক বছর হ'ল মোহাম্মদ হোসেন লুলিকে বিয়ে করেছে—। একটি ছেলেও হয়েছে তার গর্ভে। কিন্তু, কেউ এখনো তাকে স্বীকার করেনি—তার বিবির মর্যাদা দেয়নি কেউ-ই। সে কি নিজেই দিয়েছে? আজ এই ইংরেজী পড়া শৌখিন ছোকরাটা, যে ছিল তার দু'চক্ষের বিষ, সে কিনা তাকে জানালো প্রথম স্বীকৃতি! কি একটা অজানা ভাবাবেগে হোসেনের বুকও যেন আলোড়িত হয়ে উঠল। সেটাকে চাপা দেওয়ার জন্যই হঠাৎ গলা ছেড়ে হো হো করে হেসে বলে উঠলেন, "এই বুঝি তোমাদের কমিউনিষ্ট নীতি? কমি-নাস্তি বললেই ভাল হয় অর্থাৎ যেখানে কোন কিছুরই কমতি হবে না, সবাই খাটবে, সবাই পাবে, সবাই খাবে।' বলে আর এক চোট হাসি হাসল মোহাম্মদ হোসেন।

কবির বললে, 'ঠিক বলেছেন দুলাভাই, তবে আমি কমিউনিষ্ট বুঝি না, বুঝি, আমার যেমন খাওয়া পরার দরকার, আপনারও তেমনি দরকার। ফরিদা আপার যেমন ভাত কাপড়ের প্রয়োজন তেমনি লুলি আপারও প্রয়োজন।'

'সেই ভাত কাপড়ের জন্যই ত নিজের হাতে লাঙল ধরেছি, ভাইয়া। ফলে একদিন যারা আমাকে সালাম করার জন্য এক চোখের পথ থেকে ছুটে আসত আজ তারা আমাকে দেখলে সরে যায় দু'চোখের পথ। ভাই বেরাদরেরা ত করে রীতিমত ঘৃণা ও হেকারৎ।'

"করুক।" দৃপ্ত কণ্ঠেই কবির বললে। 'মেহনতী মানুষের দিন আসবেই, না এসেই পারে না। কারণ মেহনতী মানুষেরাই গড়ে দুনিয়া। আর সব দেশের চাষীই হচ্ছে সে দেশের মেরুদণ্ড—মওলানা-মৌলবী নয়, পাদরী-পুরোহিত নয়, এমন কি উজির-নাজিরও নয়, চাষী-ই—আপনি আজ দেশের সেই মেরুদণ্ডের অংশ হয়েছেন। আপনি কখনো ছোট হতে পাবেন না।' মোহাম্মদ হোসেন এই সব কথার মাথামুণ্ডু হয়ত কিছুই বুঝল না। তবে এইটুকু বুঝল কবির তার এই জীবনকে তারিফ করছে, আর দেখছে না খাটো নজরে।

মন তার খুশীতে ভরে উঠল। গতবার হজ করতে না পারায় মনের ভিতর যে কাঁটাটা অহরহ খচ্ খচ্ করছিল আজ তা যেন সমূলেই হ'ল উৎপাটিত। দিলটা যে শুধু হালকা হ'ল তা নয়, দুনিয়াটাকেই মনে হ'ল আজ আগের চেয়ে অনেক সুন্দর। এমন কি এই দাড়ী-গোঁফহীন বে-নামাজী শালাটাকে পর্যন্ত মনে হ'ল কত ভাল—আশে-পাশের সব মানুষের চেয়েই যেন সে কত বড়, কত মহান।

মানুষের জন্য

মুনীর চৌধুরী

আত্তাহিয়াতো শেষ করে কেবল ছালাম ফিরিয়েছেন, মোনাজাতের জন্য তখনও হাত তোলেন নি। বাইরে রাত কেটে আলো ফুটছে কিন্তু ফিনকি দিয়ে সে আলোর ফালি ছড়িয়ে পড়েনি তখনও। ফজরের নামাজের প্রান্তে মোনাজাতের আগক্ষণে প্রকৃতির সমস্ত সাদা পবিত্রতাকে চিরে ছিঁড়ে খান খান করে উত্তর বাড়ীব প্রাঙ্গন থেকে আকাশের দিকে উঠে গেল একটা বিকট অশ্রাব্য সম্ভাষণ। চৌধুরী বাড়ীর মুন্সী আফজাল সাহেব জায়নামাজের উপরই একবার মুখ বিকৃত করে ফেললেন সে শব্দে। চেষ্টা করলেন, দু'কানকে কিছু না শুনিয়ে শূন্যে এমনি ঝুলিয়ে রাখতে। প্রাণপণ চেষ্টা করলেন জোড়া হাতের প্রশস্ত গহ্বরে মনকে নিমজ্জিত করে আল্লাহর কাছে পৌছুতে! পৃথিবী থেকে পালিয়ে সম্পূর্ণ মায়ামুক্ত দিল দিয়ে চাইলেন জলদি জলদি মোনাজাত খতম করতে।

আফজল সাহেব পরহেজগার মুসল্লী হলেও এমন কিছু সুফী আউলিয়া ছিলেন না, কাজেই মোনাজাত কববার সময়ও উত্তর বাড়ীর প্রাঙ্গণ থেকে ছদুমিঞার কণ্ঠস্বর তিনি সর্বক্ষণ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলেন? ছদুমিঞার যেমন গলা তেমনি ভাষা। অর্থজ্ঞাপক অঙ্গভঙ্গীও যে নিশ্চয়ই সব সময় ভাষা প্রয়োগকে টীকা হিসাবে অনুসরণ করে চলছিল তাও আফজাল সাহেব অজুকরা রেখাঙ্কিত হাতে স্পষ্ট দেখতে পান।

ছদুমিঞা গালি দিচ্ছে। লক্ষ্যবস্তু বাড়ীর কেউ। বেশী দূর হলেও সে নিশ্চয়ই পাঁচ দশ হাতের মধ্যেই উপস্থিত আছে, কিন্তু গলার স্বর গ্রামের দূরতম গৃহ কোণের গভীরতম নিদ্রায় মগ্ন মানুষকে হঠাৎ উচ্চকিত করে তুলবার পক্ষে যথেষ্ট। আর যে বিষয়বস্তু সে কণ্ঠ দিয়ে নিঃসৃত হচ্ছিল, তার ভাবার্থ হয় না। দ্বিতীয়বার পুনরাবৃত্তিও সম্ভব নয়। যেমন তার বেগ, তেমনি তার আবেগ। সে গালিগালাজ দুপুর অবধি চললেও মনে হবে যেন ছদুমিঞার নিরবচ্ছিন্ন প্রথম বাক্যটাই ব্যাকরণসম্মতভাবে এখনও শেষ হয়নি। প্রতি

উচ্চারণেই সে একটা করে নতুন যৌনসম্পর্ক স্থাপন করছে। এই মুহূর্তে নিজের আপন ভা'কে, মাকে, বৌকে, বোনকে সম্বোধন করছে নিজের ঔরসজাত সন্তান বলে। আবার পরমুহূর্তেই এদের প্রত্যেকের আগত এবং অনাগত প্রতিটি সন্তানের দেহসঙ্গত জন্মদাতা বলে নিজের দাবিও জানিয়ে রাখছে নির্বিকার চিত্তে।

তছবির ছড়া লম্বা কোর্তার পকেটে পুরে আফজল মুন্সী এবার উঠে দাঁড়ালেন। আকাশ ভরে এখন ছদুমিঞার কণ্ঠস্বর, সে বিষ ঠেলে আরো ওপরের কোন পুণ্যস্তরে ভক্তের পবিত্র আর্তনাদ হয়তো পৌছবে না। ছদুমিঞার প্রতিটি স্পষ্ট উক্তি কখন যেন অলক্ষ্যে পিছলে ঢুকে পড়েছে মুন্সী সাহেবের মনের মধ্যেও — চকচকে সাপের পিঠের মত ইচ্ছেমত কিলবিল করে বেড়াচ্ছে এখন।

চারদিক আবার শান্ত না হলে খোদার কথায় মন দেওয়া মুন্সী সাহেবের পক্ষে সম্ভব নয়। নামাজের পাটি থেকে উঠে খড়মজোড়া পায়ে দিলেন। পুকুরের ডান পাড় দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলেন উত্তর বাড়ীর দিকে। অনেক রকম বিলাপ ও গর্জনের মধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধু ছদুমিঞার কণ্ঠ একাগ্রচিত্তে শুনছেন। আর তার খণ্ড খণ্ড সূত্র ধরে প্রাণপণে বুঝতে চেষ্টা করছেন পুরো ঘটনাটা।

উত্তর বাড়ীর আঙ্গিনায় ঢুকে মুন্সী সাহেব আরো হকচকিয়ে গেলেন। ছদুমিঞা একটা ভাঙা পুরানো নৌকার বৈঠা তুলে বার বার চেষ্টা করছে পাশের বন্ধ দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। হুঙ্কারে হুঙ্কারে ঘোষণা করছে, হত্যা করার অটল সঙ্কল্প। সন্ধের মসজিদে যারা নামাজ পড়তে এসেছিল, তারাই ভিড় করে রয়েছে ছদুমিঞাকে ঘিরে। ৪।৫ জন চেপে ধরে রেখেছে অসম্বৃত লুঙ্গিতে আধঢাকা, কামিজহীন, ছদুমিঞার স্ফীত মাংসপেশীর ঘর্মাক্ত কালো বলিষ্ঠ দেহটাকে। কেউ তাকে উপদেশ দিচ্ছে, কেউ হুমকী কেউ অনুনয়ও করছে। কিন্তু ছদু অপরিবর্তিত, শরীরে, আওয়াজে, ভাষায় ভয়ঙ্কর রকম বে-সামাল।

মুন্সী সাহেব বুঝলেন যে, বন্ধঘরের মধ্যেই এমন একটি লোক আছে, যাকে ছদু খুন করতে চায়, কিন্তু কেন? আশ্চর্য, আজ উঠানের একটি লোকও মুন্সী সাহেবের শান্ত, সৌম্য, গম্ভীর মুখ দেখে একবারের জন্যও সসম্ভ্রমে ছালাম জানাল না। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন দেখেও কেউ একটি পিঁড়ি এনে দিল না।

অথচ এই মুন্সী সাহেবের মুখের কথা এ গাঁয়েই শরিয়তের শেষ ফতোয়ার মত মান্য। উত্তেজনায় এত বে-খেয়াল হয়ে আছে সবাই। এমনি নির্লিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ আর এমন চাঞ্চল্যকর দৃশ্য দেখা চলে। মুন্সী সাহেবেরও ধৈর্যের সীমা আছে, কৌতূহলের শুরু হয়। একবার মুন্সী সাহেব ইশারা করে একে ডাকেন, আবার ওকে। আদ্যোপান্ত সবটা ঘটনা জানার জন্য মুন্সী সাহেব ব্যগ্র, চঞ্চল. রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন।

কয়েকমাস আগে ছত্ ক্ষেতে গেছে ধান নিড়াতে। রান্নার কাজ সেরে তফুরী বিবি ঘরের দাওয়ায় বসে পাটি বুনছিল। স্বামীর কিশোরী ছোট বোন হঠাৎ কোত্থেকে ছুটতে ছুটতে এসে ভাবীর গলা জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগলো। একটা বেতের চাঁছা লত। ঠিক ঘর মত বসাতে যাবে এমন সময় ননদের আকস্মিক সোহাগ এসে বাধা দিল কাজে। কৃত্রিম রাগের ঢঙ ধমকে উঠলো—

'এইলা উলালে দেখি একছাব বাছছনা আর। তোর কি আইজ হাঙ্গা লাইগছে নি। ছাড, গলা ছাড়ি দে।'

'একখানে অ্যাক মজার ছিজ দেইখ আইছি ভাবী, কইত্যাম গ্য আঁই।'

মজার জিনিস আবিষ্কার করে যে অত উৎফুল্ল হয়ে ভাবীর কাছে তা প্রকাশ করতে ছুটে আসে, সে জিনিস সম্পর্কে কিছুই গোপন রাখা যে ফজিলতের উদ্দেশ্য নয়, এ কথা বোঝা পানির মত সোজা। বরঞ্চ প্রথমে রহস্য সৃষ্টি করে, পরে প্রকাশের ইচ্ছের মধ্যে একটা কিছু স্বার্থ লুকোনো থাকা সম্ভব। তফুরীর কল্পনা মিছে নয় ভাবীকে চুপ করে থাকতে দেখে ফজিলতই আবার গায়ে পড়ে বলে।

"এক খাওনের জিনিস, বড় মজার। হুইনলেহ জিহ্বাৎ হ্যান আইব।" ভাবী তবু বেশী উৎসাহ প্রকাশ করে না। দীর্ঘ নিটোল বাহুতে ঢেউ তুলে বেতলতা ঘরে ঘরে টানা দিতে থাকে। ফজিলত কানের কাছে মুখ লাগিয়ে ফিস ফিস করে এবার সব বলেই দেয়। এইমাত্র অন্তরের ঘাটলা দিয়ে পানি তুলবার সময় সুপারীর খোলের পর্দার ফাক দিয়ে সে অমন অতুলনীয় লোভনীয় দ্রব্যটি আবিষ্কার করেছে। মোটা ফুটফুটে এক থোকা ঝুলমান বেতফল, শক্রর

চোখে ধূলো দিয়ে যার প্রতিটি ফল ফুলেফুলে নধর হয়েছে ইচ্ছে করলেই নাকি সেই থোকাটা খুব সহজে এখনই পাড়া যায়। ডাগর কাল চোখ নাচিয়ে ভাবীই এবার ননদকে আদর করতে শুরু করে দেয়। মেটে হাঁড়ির তলার কালি আর বাটা মরিচ নুনে ঝাকিয়ে নিলে যে অদ্ভুত তার আসবে ঐ বেতফলের টকে ঝালে—সেই কল্পনাতে উথলে উঠে ভাবী। ফজিলতের পরামর্শ কল্পনাকে নিকট বাস্তবে নিয়ে আসে—

"আঁই আঁকশি বান্ধি ঠিক করি রাইখছি। গেলে অনই উডন লাইগব। হইর কিনারে গোছলের ভিড় জইমলে হেই গুক্তে আর ব্যাত ঝোপের পর্দায় কুলাইত ন।" ভাবীও তৎপর হয়ে ওঠে। ফজিলতের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে ঘাটলার দিকে। কর্মে এত প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ফজিলতের একটা আপত্তি আছে, 'আঁই ছাট-দেয়ালের হেই কিনারে দিনে দুফরে গেলে মা'য়ে হ্যাদাইবো' একটু থেমে সে-ই আবার প্রশ্ন করে, 'আইচ্ছা ভাবী, হেইদিন ত হাললম দিন পাড়া চরি বেড়াইলাম, এই ক'দিনেই আঁই এমন কিইবা ডাঙ্গর হই গেলাম। মা'র উদ্বেগ ও সাবধানবাণীর তাৎপর্য তফুরী বোঝে, ফজিলতের গালে দু'টো টোকা মেরে ছন্দ মিলিয়ে, অঙ্গ দুলিয়ে বলে, "তোর যে দুই দিন বাদে হাঙ্গা।'

বিয়ের কথায় কিশোরী ফজিলত লাল হয়ে চোখ বুজে ফেলে। এটাত আর ঠাট্টা নয়, এ সত্য কথা। ও নিজেও জানে। হাড়ির কালি, বাটা মরিচ, নুন এবং আরো অন্যান্য সরঞ্জাম ঠিক করবার নির্দেশ দিয়ে তফুরী ঘাটলার পথে পা বাড়ায়। ফজিলত তার আবিষ্কৃত রহস্যের চাবিকাঠিটা শেষ বারের মতো ছুঁড়ে মারে, চীৎকার করে। "বাইর বাড়ী দি' যান ভাবী, হুইর কিনার দি। কাঁডল গাছের হোচ্ছম দি' রেইনলেই সামনে বেত্যার থোব দেইবেন।" যেতে যেতে মাথা নাড়িয়ে ভাবী আঁকশিটা তুলে নেয়। শাশুড়ীর উপস্থিতি হঠাৎ কোন বিস্ময়কর দুর্যোগ ডেকে না আনে, এই ভয়ে ত্রস্ত পদে তফুরী মিলিয়ে গেল ছাট-দেওয়ালের ওপাশে। যাবার ভঙ্গিটার কথা ফজিলত কিন্তু তখনও ভাবছে। ভাবীর রূপ যেন থেমে থাকতে চায় না কখনও। বড় বড় পা, বড় বড় হাত, বড় চোখ, বড় চুল, একটুখানি নড়লেই রূপ যেন সারা সাদা অঙ্গে টল টল করে নাচতে থাকে। ফজিলত একবার মনে মনে ভাবে, কিসের জোরে ভাবী শ্বশুর বাড়ীতেও দিগ্বিজয়ী রাণীর মতো বেপরোয়া চলাফেরা করে। সেকি শুধুই রূপের জোরে, না আর কারও সোহাগ বর্ম হয়ে ঘিরে রয়েছে ভাবীকে?

ছদ্দুভাই ভাবীকে আর ভাবী ছদ্দুভাইকে এত ভালবাসে যে, ফজিলত পর্যন্ত মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যায়, তার তৃপ্তিহীন, সীমাহীন, কূলকিনারাহীন উচ্ছ্বাসের কথা কল্পনা করে।

দুটো মাটির হাঁড়ির সরাকে মুখোমুখি উপুড় করে চেপে ধরে ভাবী-ননদে ঝাকুনি দিয়ে তৈরী করেছে বেতুই ফলের ভর্তা। ভাবী এত মশগুল হয়ে আছে যে, বেতে কাঁটায় ছিঁড়ে যাওয়া শাড়ীর আঁচলটা পর্যন্ত স্বামী বা শাশুড়ীর চোখ থেকে আড়াল করার চিন্তাটুকুও নেই। ভাবী-ননদে কাড়াকাড়ি করে খায়। মন্তব্য প্রকাশ করে, কালির ঝুলে বেতলের কাঁচা কষ কতটা কেটেছে আর কতটা রয়ে গেছে। ফজিলত অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারে যে, ভাবীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে জেতা তার পক্ষে সম্ভব নয়। গালের মধ্যে মস্ত একদলা ভর্তা আঙুলের পাতা থেকে পাতলা জিবের ডগা দিয়ে ভাবী তুলে নিচ্ছে। তারপর আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঠোঁট দুটো স্বল্প জোরে সংযুক্ত করেই এক কোণের একটুখানি শিথিল পথ দিয়ে পুট পুট করে এক গাদা স্বাদহীন মসৃণ দানা জিব দিয়ে ঠেলে বার করে দিচ্ছে। ঝগড়া শুরু করে দেয় ফজিলত। লাভ হচ্ছে না দেখে জোরাজোরি, তাতেও হেরে যাচ্ছে দেখে এবং ভাবী নির্বিকার চিত্তে নির্মম বেগে খেয়েই যাচ্ছে বুঝে ফজিলত ফুঁপিয়ে শুরু করে তার অপরাজেয় সংগ্রামের প্রথম পাঠ। নাছোড়বান্দা ভাবী ভর্তার সরাসহ ছুটে সরে পড়তে চাইল রণক্ষেত্র থেকে। মরিয়া হয়ে ফজিলত ভাবীর ফুলে ওঠা উড়ন্ত আঁচল শূন্য থেকে সাফটে ধরলো। চোখের পলকে এক হেঁচকা টানে ফস করে ওর ক্ষুদে মুঠো থেকে বেরিয়ে গেল আঁচল, উড়ে চলে গেল ভাবী। শুধু যাবার সময়ের সামান্য অ-সাবধানতার জন্য মাটির সরাটা পড়ে খান খান হয়ে গেল। শব্দ শুনে হাঁ হাঁ করে এক দিক থেকে বেরিয়ে এল মা, দৈবক্রমে ঠিক সে সময়ে বার থেকেও লাঙ্গল কাঁধে আঙ্গিনায় প্রবেশ করল কর্ম-ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ক্ষুধার্ত ছদ্দু। সুন্দরী স্ত্রীর পলায়মান গতিটুকু দেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসতে লাগল। মনে মনে মরণ ক্ষুধার মধ্যেও নিজের খোশ নসীবের জন্য খোদার কাছে একবার শোকরগুজারী করল। লাঙ্গলটা উঠানের কিনারে রেখে, বৌর উদ্দেশ্যে চীৎকার করে ডাকল। ভাত বাড়ার জন্য, জানিয়ে

দিল খিদেয় সে মরে যাচ্ছে। মা তখন ফজিলতকে জেরা করছে, সরা ভাঙলো কে? বেতুই ফল পাড়তে খোলা পুকুর পাড়ে গিয়েছিল কে? বৌর দুঃসাহস যে কুলটা রমণীর পুকুর পাড় ধরে প্রান্তরে পা বাড়াবার পূর্বাভাস মাত্র, সেটা বেশ জোরে জোরেই রূপসীর স্বামীকে শুনিয়ে দিল। একে পেটের মধ্যে খিদে নাভিমূলে মোচড় দিতে দিতে ব্যথা তুলে দিয়েছে, তার মা'র ঐরকম সুউচ্চ কণ্ঠের হৃৎকাঁপানো মিথ্যে কটাক্ষ। ছতুমিঞার মেজাজটা গরম দুধে লেবুর মত রাগে ঝাঁজে ভরে উঠল। আরো বেশী কিছু শুনতে হয়, এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি বাইরের ঘাটলায় হাত-পা ধুতে চলে গেল। কিন্তু শব্দ বাতাসে ভর করে চলে, যত বেশী জোরে সাড়া দেবে, ততই বেশী দূরে ধেয়ে যাবে। মা তখন বৌ'র শাড়ী ছেঁড়ার পর্ব শুনেছেন মাত্র। বস্মীভূত বিষ তাঁতানো জিব থেকে জ্বলন্ত আগুনের হলকার মত বেরুচ্ছে। শাড়ী তো আর এমনি সব সময়ে ঘোমটা হয়ে বৌ'র মাথায় পড়ে ছিল না। কাঁটায় যখন শাড়ী একবার আটকে ছিল, তখন নিশ্চয়ই শাড়ীর সে অংশটা হয় বৌর গায়ের উপর ছিল. নয় গাছের উপর ছিল। একই সময় একই শাড়ীর আঁচল তো দু'জায়গায় থাকতে পারে না। আর গাছে, আটকেই তো শাড়ী ছিঁড়ে যায় নি, বৌ নিশ্চয়ই তাড়াহুড়ো করে টানাটানি করেছে বলেই ফেড়ে গিয়েছে। গাছে কারো শাড়ীর প্রান্ত অসভ্যভাবে আটকে গিয়ে থাকলে পুকুরপাড় থেকে —হয়তো রহিম মোল্লা হা করে মানুষটাকে দেখেছিল—নইলে বৌ তাড়াহুড়ো করে হ্যাঁচকা টানে আঁচল ছিঁড়বেই বা কেন?

ছতুমিঞা রান্না ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে বৌ'কে আবেকবার ডাকল কর্কশ ঝাঁঝাল কণ্ঠে। নিছক ক্ষুধাতুর মানুষ স্বামী নয়, প্রেমিক নয়—যেমন করে তার রাধুনীকে ডাকে। মাথায় কাপড় টেনে রক্তিম মুখে মাথা নীচু করে এগিয়ে এল তফুরী। এক হাতে সরাটা পরিচ্ছন্ন করে ধোয়া। কিন্তু ঘরে ঢুকেই তফুরী থ বনে যায়। চোখ মুখ তার ফ্যাকাশে হয়ে আসে। হাতের ভাল সরাটাও খসে পড়ে গিয়ে চৌচির হয়ে যায়। ছতু তৎক্ষণে ঘরে ঢুকে পড়েছে। সেও দেখল ভাত আর তরকারীর হাঁড়িটা খোলা পেয়ে পোষা বিড়ালটা আর রাস্তার একটা নেড়ী কুকুর নির্বিবাদে মুখ ঢুকিয়ে মাছ আর ভাত চপ চপ করে খাচ্ছে। ছতুর মাথার মধ্যে কোথায় যেন একটা খুব প্রয়োজনীয় রাগ বুঝিবা অতিরিক্ত রক্তচাপ সহ্য করতে না পেরে ছিঁড়ে ফেটে পড়ল। তফুরী চোখের পানি ঠেলে রেখে কোনরকমে একবার বলতে চেষ্টা

করল, অল্পক্ষণের মধ্যেই সে কিছু চাল ফুটিয়ে নেবে। এই এক ছিলিম তামাক শেষ না হতেই সে আবার ভাত বেড়ে আনছে। ঠায় অমনি চুপ করে ঠিক কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, তা ছদু নিজেও বলতে পারবে না। আচমকা সে চিৎকার করে উঠলো বীভৎসভাবে। রাগে, ক্ষুধায় কাঁপতে কাঁপতে ছদু যা উচ্চারণ করল, তার মর্ম স্পষ্ট। এখন কেন, কোন দিনই আর এই চুলোয় তফুরীকে ভাত চড়াতে হবে না। সে তাকে মুক্তি দিচ্ছে। তফুরী স্বচ্ছন্দে ফুল কাঁটায় আঁচল আটকে মাথার কাপড় বুকের নীচে ফেলে এখনই পুকুর পাড় ধরে রহিম মোল্লার হাতে হাত রেখে প্রান্তরের পথে পা বাড়াতে পারে। তফুরী চিৎকার করে দু'হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরতে ছুটে এসেছিল। বস্তুত তৎক্ষণে চরম বাণী ছদু উচ্চারণ করে ফেলেছে। তালাক। তাও সোজা সহজ কিছু নয়, একেবারে তিন তালাক।

উঠান থেকে মা আর মেয়ে আচম্বিৎ এমন সাংঘাতিক ঘোষণা শুনে শিউরে আঁৎকে ভয়ার্ত আর্তনাদ করে দৌড়ে ছুটে আসে। বাইরের প্রাঙ্গণ থেকে ছুটে এল ছোট ভাই ফজু। সঙ্গে আরো দু'একজন প্রতিবেশী। কিছুক্ষণ আগের তুমুল ঝগড়ার কথা মুহূর্তের মধ্যে ভুলে গিয়ে হায় হায় করে ঘরের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ল মা আর মেয়ে।

তফুরী অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে মেঝের ওপর। ছদু বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে আছে সে দিকে। এগিয়ে এসে ঐ সোনার শরীরকে স্পর্শ করার সাহসটুকু পর্যন্ত [illegible] উবে গেছে। বাজ পড়া মানুষের মতো সে শুধু খাড়া হয়ে আছে। নিশ্চল দাঁড়িয়ে বুঝতে চেষ্টা করছে চোখের পলকে কোত্থেকে কি করে এ কাণ্ড হয়ে গেল। মা মেয়ে পাড়া প্রতিবেশিনীর সহানুভূতিসূচক বিলাপ আর কান্নার করুণ ঐকতানের মধ্যে ধীর শান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে এল বয়সে কম কিন্তু বুদ্ধিতে প্রবীণ, ছোট ভাই ফজু। কেবল সেই উপলব্ধি করছিল যে ছদু'র নিশ্চুপ তন্ময়তা অস্বাভাবিক ও ভয়ংকর। কিছু না বলে সে বড় ভাইকে টেনে বার করে নিয়ে গেল, ব[illegible] কান্নার গোঙানিতে দমবন্ধ করা ঘরের গুমোট আবহাওয়া থেকে।

নিজের হঠকারিতায় যে বুকভাঙা ঘটনার সৃষ্টি করেছে, তার জন্য অনুতাপে শোকে কাহিল ছদু সারা দুপুর কারো সঙ্গে কথা বলতে পারে নি। রহিম মোল্লাও সবটা শুনে ফতোয়া দিয়েছে শরিয়ত মোতাবেক। তিন তালাকের কঠিন বিধি-নিষেধ ছদুমিঞার মহব্বতের জন্য শিথিল করে দেয়া সম্ভব নয়।

ঠিক হলো, পরের দিন লোক এসে তফুরীকে তার বাপের বাড়ী নিয়ে যাবে।

গভীর রাতে নিদ্রাহীন ছদুমিঞার বিছানার প্রান্তে এসে ফজু বসল। ফজু থাকে পশ্চিমের ঘরে। এঘরের ভাইয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক মূলতঃ আর্থিক ও সাংসারিক। নাড়ি আর পরিবারের বন্ধনটাকে গতবছর সে অনেকখানি শিথিল করে দিয়েছে। তখন মেজাজ তার সব সময় একটু রুক্ষ থাকলেও ভেতরে ভেতরে সে ছিল বেজায় রসিক। হপ্তায় হপ্তায় গঞ্জের হাটে, ফুলেল তৈল মেখে, ঢেউ পাটের সিঁথি কেটে একটু গান বাজনা ও ফুর্তির আসরে না বসলে তার চলত না। একবার কিছু সুপারী চুরি করে বেচতে গিয়ে ভাইয়ের কাছে ধরা পড়ে যায়। যোয়ান বড ভাইয়ের হাতে সেদিন প্রচুর মার খেয়েছিল। তারপর থেকেই নাকি তাকে আর কেউ কোনদিন কোন রকম হাসি তামাশার হল্লায় দেখে নি। এর কিছুদিন পর সে নিজেই উদ্যোগ করে জায়গা জমি সব ভাগ করিয়েছে। কিন্তু পাডার দশজনে মিলে দু'ভাইয়ের জমির যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিয়েছে ফজুমিঞার তা মোটেই পছন্দ হয় নি। তার ধারণা, গ্রামবাসীরা তাকে অপছন্দ করে বলে বড় ভাই তাদের সঙ্গে একজোট হয়ে ষড়যন্ত্র করে তাকে ঠকিয়েছে। বেছে বেছে তার ভাগে ঠেলে দিয়েছে। যতো পড়ো, অজন্মা জোলো-জংলা জমিগুলো। লোকে বলে, সে নাকি আব্বার কবরের ওপর দাঁড়িয়ে রোজ রাতে বিড বিড় করে আজও ভাইর বিরুদ্ধে নালিশ জানায়, গজব দেয়। প্রতিশোধের জন্য ক্ষমতা মাগে। ছদু অবশ্য এসব প্রচারের কিছুই বিশ্বাস করে না। সে দেখেছে ফজু কেমন ধীরে ধীরে সুস্থ শান্ত, কর্মঠ, হয়ে উঠেছে। ছদু ঠিক করেছে, ওকে স্বেচ্ছায় আরো কিছুটা জমি ছেড়ে দেবে।

ফজুমিঞা ভাইয়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলল, 'আঁইন্নে যদি আঁরে বিশ্বাস করেন ত একটা কতা কইতাম হারি।'

'কি?'

'ভাবীরে এক দিনের লাই বিয়া করি আঁই ছাড়ি দিমু। কারোত্তন কিছু ন কইলেই শাইরবো। এক লগে হুইতলেও আল্লার দোহাই।'

ধড়মড় করে লাফিয়ে উঠলো ছদু। তার মায়ের পেটের ছোট ভাই। হোলোই বা তালাক দেয়া বৌ, তাই বলে বড় ভাইয়ের অনুরোধে তিন মাস দশদিন পর তাকে একটা লোক দেখান বিয়ে করে একরাত মন ভুলানো ঘর

তার সঙ্গে পেতে সবার চোখে ধূলো দিয়ে সে যদি পরের দিন তাকে তালাক দিতে পারে? রাতের বেলায় অর্গল দেয়া দুয়োরে ফাঁক দিয়ে রহিমত আর উঁকি দিয়ে থাকছে না? আনন্দে উল্লাসে ছতু বুকে জড়িয়ে ধরে ছোট ভাইকে। অস্ফুট কণ্ঠস্বরে আবার বুঝিয়েও বলে যে, তালাক তার ত সত্যি সতি হয় নি। দিল দিয়ে সে তালাক দেয় নি। কাজেই ফজু যেন বিয়ের রাতেও তফুরীকে ভাবীর সম্মান দেখায়। ভাবী, ভাবী, কে না জানে ভাবী মায়ের সমান।

ঠিক তিন মাস দশদিন পর গতরাতে তিনজন সাক্ষী আর একজন মোল্লা নিয়ে ব্যাপারটা তারা এত চুপচাপ সেরেছে যে মুন্সী সাহেব পর্যন্ত একদম টের পাননি। ফজুর সাথে তফুরীর বিয়ে হয়ে গেছে। ভোররাত থেকেই তিনজন সাক্ষীসহ ছতু প্রান্তের আঙ্গিনায় অপেক্ষা করছিল ফজুর জন্য। সকাল বেলাই ফজু তালাক দেবে তার নয়া বিবিকে, পুরানো ভাবীকে। কিন্তু ফজু হঠাৎ ভোরবেলা দরজা খুলেই নাকি ভাইকে দেখে বহুদিন পর তার বাজারের সেই পরিচিত পুরাতন অট্টহাসিতে চমকে দিয়েছে সব্বাইকে। তারপর চিৎকার করে বলেছে—'তালাক আঁই দিতান ন্য। দিতান ন্য। ব্যাক ভালা ভালা জমির টুকরা আঁরে ভাড়াই আননে লই গ্যাছেন্, ইয়াদ আছে হেই কথা? হে—হে—হে। আইজ আননের ব্যাকেরতন ভালা জমির টুকরা আঁই হাইছি। এইডা আঁই ছাড়ুম ক্যা? ছাইড়তান ন্য, আঁই ছাইড়তান ন্য।'

ছতুর শ্রেষ্ঠ সম্পত্তির টুকরো সে যখন আজ একবার মুঠোর মধ্যে পেয়েছে, তখন জান গেলেও ফজু তা ছাড়বে না। সঙ্গে এটুকুও জানিয়ে দেয়, 'হেই লগে এইডাও হুনি রাখেন ভাইজান, জমির লগে জমির ফসলও যায়, বুইজছেন? আঁর জমিৎ আমনে ফসল কইল্লান ক্যা হেইডাও আই দিতান ন্য। গলা টিফি মারি হালাইয়ুম।' ছতুর অনাগত সন্তানকে পর্যন্ত সে গলা টিপে মেরে ফেলতে চায়। বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে ছতু তখন উন্মাদ হয়ে উঠেছে। হাতের কাছে শক্ত যে জিনিসটা ছিল সেটা নিয়েই সে ছুটলো ফজুকে খুন করতে। সড়াৎ করে ঘরের ভেতর ঢুকে ফজু দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, কয়েকজন এসে চেপে ধরেছে ছতুমিঞাকে। চিৎকারে ছতুর গলা দিয়ে যেন রক্ত বেরুচ্ছে, চোখ যেন

উল্‌টে বের হয়ে আসতে চায়।

সবটা ঘটনা বুঝতে পেরে মুন্সী সাহেবের শুভ্র দাড়ি উত্তেজনায় স্ফীত নাসার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ফেঁপে ফুলে উঠলো। সত্তর বছরের দুর্বল দেহটাকে হঠাৎ টান দিয়ে সিটিয়ে শক্ত সবল করে ফেললেন এক ঝাঁকুনিতে। তারপর আচম্বিতে পায়ের খড়ম জোড়া হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ছদুমিঞার ওপর। সকলে হতবাক হয়ে শুনলো মুন্সী সাহেবের গালাগালি—অশ্লীল, অকথ্য, অশ্রাব্য। গ্রামবাসীর দিনন্দিন উত্তেজনার আদিম বুনো পরিভাষা। বল্লাহীন, উদ্দামতার স্রোতবেগ।

'আরামজাদ, জারুয়া—শরীয়ত তোগো লাইন্য, তোগো লাই শারীয়তন্য। হাইওয়ান জানোয়ারের লাই শরীয়ত হয় ন্য—শরীয়ত হইছে মাইনষের লাই।'

দম বন্ধ করে মুন্সী সাহেবের এই অভূতপূর্ব ব্যবহার দেখতে থাকে সবাই। ছদু নিজেকে খড়মের পিটুনীর হাত থেকে বাঁচাতে ভুলে গিয়ে চীৎ হয়ে পড়ে মুন্সী সাহেবের অস্বাভাবিক চেহারার দিকে চেয়ে থাকে, মুন্সী সাহেব প্রচণ্ড চিৎকারে ফেটে পড়েন—

'মজুর মান্দার আরামজাদ কোনানকার। আরামজাদ বিয়া কইছত ক্যা? বিয়া করছ ক্যা? এই দাড় পাকছে না যে কেইড্যা মাইয়া হোলার উপর তালাক লাগে না—হ্যাডে হোলা থাইকলে তালাক অয় না। হেই কথা না জাইনলে তালাক দ্যাছ ক্যা? শরীয়ত মানছ ক্যা? আগে জো মানুষ হ। মানুষ হ। শরীয়ত মাইনষের লাই, হাইওয়ান জানোয়ারের লাই ন্য।'

মুন্সী সাহেব আর পারেন না। হাপাতে থাকেন। ক্ষোভে, ক্রোধে চোখ ভেঙে তার পানি গড়িয়ে আসে। সন্তানবতী নারীকে যে কখনই তালাক দেয়া যায় না এই নতুন তথ্য শুনে উত্তর বাড়ীর প্রাঙ্গণ হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। সব উত্তেজনাহীন, কোলাহলহীন, নীরব। সব্বাই এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ছদু-মিঞার দিকে। ঘট করে একটা শব্দ হতেই দরজা খুলে নতুন লালশাড়ী পরা তফুরী বেরিয়ে এল ঘর থেকে আঙ্গিনায়, এক পা এক পা করে এগুতে লাগলো ছদুর দিকে। নিতান্ত অনভিপ্রেত একটা রূপ ভোরের পাকাধানী আলোতে বার বার কম্পিত তার চুলে, চোখে, আঁচলের প্রান্তে। আর ছদু আজ থেকে তিন মাস দশদিন আগে ঠিক যেমন অর্থহীন মরা চোখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখেছিল তফুরীর ভূলুণ্ঠিত অজ্ঞান দেহটাকে—সেই অকম্পিত চোখ জোড়াই সে আজও আবার মেলে ধরল মুন্সী সাহেবের মুখের ওপর মানুষের জন্ম, হাই

ওয়ান জানোয়ারের জন্য নয়—একথা তৃতীয়বার মনে হতেই মুন্সী ছতুর চোখের ওপর থেকে নামিয়ে নিলেন নিজের চোখ মাটির দিকে। হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করলেন ভোর থেকে পবেটে পরিত্যক্ত কঠিন পাথুরে তছবির ছড়াটাকে।

নতুন জন্ম

শওকত ওসমান

গোমতী নদী এইখানে হঠাৎ মোচড় মেরে আবার সোজা এগিয়ে গেছে। পাশে বন্যারোধী চওড়া বাঁধ, মনে হয়, যেন একখানা সুদীর্ঘ বাহু জলা-খাদ মাঠ গোঠ বনানী-শীর্ষ সবুজ-নীল গ্রামের ভিতর দিয়ে সুদূরে মিশে গেছে। দিগন্তের সরু রেখা ঐ বাহু-প্রান্তে উপুড়-করা কর-তালু-লগ্ন রাঙা আঙুলের সমষ্টি। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে তারই নীচে গোমতীর নেশা-ছলছল চোখ। দূরে দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে গোমতী কারো প্রতীক্ষায়। অনুভূতির ঝঞ্ঝা স্রোত-রূপে উদ্বেলিত বুকের সমতলে ফুঁসে উঠ্‌ছে।

বর্ষার অবেলায় ঝিরিঝিরি বাতাসের পিঠে সওয়ার পাহাড়ী মেঘ আকাশ-বিজয়ে তাঁবু তুল্‌লো এই মাত্র।

নিচে গহ্‌নার নৌকা, মাছ-ধরা জেলে-ডিঙি, সাদা গাং-চিল ছন্দের সমতা বজায় রাখছে।

—হালী আইজ ক্ষেপ্‌ছে।

ডিঙি থেকে একজন মন্তব্য করল। হালী অর্থাৎ শালী।

গোমতীর এই মুহূর্তের ভগ্নিপতি ফরাজ আলি ছোট ডিঙির উপর হাল ধরে দাঁড়িয়েছিল। বাঁশের লগী ঠেল্‌ছে তারই বছর এগারো বয়সের পুত্র আক্কাস।

আকাশের দিকে চোখ ফিরিয়ে একবার দেখল ফরাজ আলি। ঝড়ের সম্ভাবনা আছে! কিন্তু পলকে অন্য চিন্তার ঢেউ ওঠে। ঝড়ের কথা আর মনে থাকে না। হাল বগলে দাবিয়ে গলুইয়ের মুখ থেকে সে বিড়ি বের করে, মাটির হাঁড়ি-জীয়ানো আগুনে ধরিয়ে নিল তাড়াতাড়ি।

গোমতীর বুক, মুখ কালো হয়ে এলো। মেঘের ওপারে সূর্যের অস্তিত্ব এখন অনুমানের ব্যাপার।

বড় আরামে বিড়ি টানে ফরাজ আলি।

স্রোত একটু খর। দুই পাড়ে আছড়ে আছড়ে-পড়া পানির গর্জন-শব্দে

অস্বাভাবিকতা। তা ফরাজ আলির কান এড়ায় না।

দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় শব্দে উচ্চারণ করল সে, 'হালী…।'

আব্বাস লগী ঠেল্‌ছে। শীতার্ত্ত বৃদ্ধের দাঁতের মত ডিঙির গায়ে লগীর ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ হয়। উজানের তোড় খুদে কিশোরের কাছে সহজে হার মান্‌তে চায় না।

ফরাজ আলী উৎসাহ দিতে থাকে, সাবাস বেটা।

আব্বাস দাঁত মুখ খিঁচিয়ে লগী ফেলে আর পা টিপে-টিপে অগ্রসর হয়!

শেষে সে ডাকে, বা-জান।

কণ্ঠে অসহায়তার আবেদন। বা জান, অর্থাৎ আমি হাল ধরি, তুমি লগী চালাও।

জবাব আসে একটু পরে। জবাব নয়, অনুরোধ।

গোমতীর স্রোত ঘুর্ণী-তোড়ে চীৎকার করে উঠ্‌ল।

—হালী আইজ ক্ষেপ্‌ছে।

ফরাজ আলি গোমতীর সঙ্গে এই সম্বন্ধ পাতিয়েছে বহু-দিন!

চেহারা খানা কালো, আঁটসাট গাট্টা-বাঁটন, খাটো কদ্। তার উপর সে ঘা' পীচ-রং, দেখতে ঠিক নধর শিশুকের মত! নদীর সঙ্গে রিস্তা থাকবে না কেন?

ফরাজ আলির কালো ভুরুর উপর খোঁচা খোঁচা চুল এসে পড়ে। চোখে দয়া-মায়ার দাগ পর্যন্ত নেই। চোখ নয় ত, গোল কোটরের ভেতর দুটো কালো কাঁচ বসিয়ে মাঝখানে কেউ অতি ছোট্ট পিদিম জ্বালিয়ে দিয়েছে। কথার বলার সময় ফরাজ আলির দৃষ্টি জ্বালা ছড়ায়। বেঁটে শরীর। আরো বেঁটে, মাংসল, পেশী-খাড়া হাত। থুৎনার দু-পাশে রুক্ষ চোয়াল থেবড়ে বসে গেছে গৃহস্থের দাওয়ায় কাবুলী-ওয়ালার মত—দেনা-শোধ অথবা সুদ ছাড়া উঠবে না।

দম্ভের প্রতিমূর্তি ফরাজ আলির মুখাবয়ব।

এক হাতে পালের দড়ি ধরেছিল সে। কাফ্রি-সম্রাট যেন স্যালুট নিচ্ছে তাঁবেদার ফৌজ মহলে!

কিন্তু ইতিমধ্যে বাতাস মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আকাশের প্রাঙ্গণে ধুমুরী নেমেছে। মেঘ-মহল্লা গোষ্ঠি-সুখ চায় না আর।

ফরাজ আলি তাড়াতাড়ি পাল নামিয়ে ফেল্‌ল, এত বাতাসে ছিঁড়ে যেতে

পারে। গণ্ডা দশেক তালি বাদামের পাঁজ্‌রায়।

—বা-জান, আইস্তা লগি চলাইস্‌।

—ক্যান ? পুত্রের জবাব।

—আমাগো ভিটা ছিল এহানে। তোঁয়ার চাচার কবর আছে।

চাচা ?

—হ। তারে দেখস নাই। হে এক জোয়ান ছিল। ফরাজ আলি উৎসাহে অগ্রজের কাহিনী বয়ান করে। আকাশের দিকে খেয়াল থাকে না। 'তুফানে ডুইব্যা মরছিল।' কথা শেষ করে ফরাজ আলি পুত্রের মুখের দিকে তাকায়। ভয়ের ছায়া কচি মুখে।

—ডর করস, বা জান ? ডরের কি আছে ? 'এই হালী'…ফরাজ গোমতীর শ্রাদ্ধ-শেষে অন্য কাহিনী পাড়ে। বড় জোর স্রোত। হাল বাগ মানে না। রুক্ষ কণ্ঠে বিড়বিড় করে সে, 'হালী…'।

আবার অস্পষ্ট গলায় পুত্রের আবেদন : বা-জান।

আবেদনের দকে লক্ষ্য নেই ফরাজ আলির। নিজের মনে আউড়ে চলে, 'হালী তরে স্থাখুম একদিন। বা-জান ?'

বা-জান তখন লগির সঙ্গে কুস্তি-রত। পলিমাটি ছিল নীচে, লগি পুঁতে গেছে। আকাশ-ও শক্ত ছেলে। লগি তুলে ডিঙির কিনারে-কিনারে এগিয়ে যায়।

—বা-জান, ডর কির লেইগ্যা ?

আবেদন-মাখা কণ্ঠে আকাস বলে, 'বা-জান, আসমানের দিকে চাইয়া স্থাহেন।'

আকাশ কালো হোয়ে গেছে। বেলা বেশী নেই। ফরাজ আলি চেয়ে দেখল। তবু কোন বিকার নেই মুখে।

পুত্র লগি ঠেলে নিঃশব্দে। পিতার মুখের দিকে আর তাকায় না।

গোমতী যেখানে বাইজীর মত কোমর বাঁকায় নৃত্য-ছন্দে, তার-ই কোলে কোলে ঘর আছে। জোর একখানা, দু-খানা। বন্যারোধী বাঁধ আর নদী-তট—মাঝখানে দশ-বারো হাত জায়গা কি আরো কম ফাঁক থাকে। সেখানেই ফরাজ আলির মত আরো যারা আলি আছে তারা আস্তানা বাঁধে। শনে ছাওয়া কুঁড়ে। বাঁধের উপর থেকে মনে হয় ঝড়ে উড়ে এসে কারো ঘর জমিনে মুখ থুব্‌ড়ে পড়েছে। কিন্তু বাঁধের গায়ে পায়েচলা সরু দাগ-পথে

নেমে গেলে দেখা যায়, আর এক জগৎ। আস্ত ঘর। ঘরের মুখ আছে। কান নেই, চোখ নেই। সম্মুখে বালি-চিকচিকে উঠান! কলা গাছের ঝাড় আছে, বান-ভাসি কল্কে ফুলের গাছ আছে। কেউ কেউ চারা ফুলগাছ লাগিয়ে রাখে। ফরাজ আলির চালের সঙ্গে পাখার খাঁচা ও পাখী ঝুলছে, বুনো লতা কঞ্চির দেওয়াল বয়ে চালে উঠে গেছে। শুচিতার স্পর্শ চৌদিকে। ঘর, ঐ ঘরের ভেতর রহস্য পুরী। বাইরের মানুষের কাছে জানার কথা নয়, এখানে আছে বাঁশের তক্তপোষ। সোনার পাথর-বাটির নবতম সংস্করণ। বাঁশের পায়া, উপরে বাগায় বিছানো -মাদুর পেতে শোয়ার কাজ চলে। কিন্তু আরো অভিনবত্ব আছে মায়া-পুরীর ভেতর। তক্তপোষ, ঐ তক্তপোষের নানা সাইজের পায়া জড়ো করা থাকে এক কোণে। বর্ষা ও কোটালের জোয়ারে গোমতী একটু গৃহ-সুখ চায়, তখন জলের পরিমাপ অনুযায়ী পায়া বদল চলে। মাঝে মাঝে তক্তপোষ আশ্চর্য্য কলে মট্‌কায় গিয়ে ঠেকে, কারণ খুব লম্বা বংশ-পায়ার উপর আসান থাকেন 'কর্তা'। পানির সঙ্গে সঙ্গে আবার খাড়াই ছোট হয়ে আসে।

ফরাজ আলির ছোট উঠানের পাশে দু-ঝাড় কলা গাছ দু-দিকে। মাঝখানে বাঁশের পৈঠা। গ্রীষ্মের সময় নদীর পানি সরে যায়। তখন পৈঠা বয়ে নীচে নেমে থালা-বাসন ধোয়া, গোসলের কাজ চলে। অঢেল ভাদ্রের সময় মাচাং-পোষ (মাচা ও তক্তপোষ) থেকে আর নামতে হয় না কোন কাজের জন্য। কলাগাছ খুব বাড়ে পলিমাটির উপরে। তলায় দাঁড়িয়ে এইখান থেকে পাতার ফাঁক দিয়ে ফরাজ আলির স্ত্রী দেখত, দূরের আকাশ আর সূর্যোদয়। দু-বছর আগে সে মরে গেছে। এখন সেই জায়গায় মাঝে মাঝে আনমনা হোয়ে দাঁড়ায় আক্কাস।

বসুন্ধরা কত কৃপণ, এখানে এলে বোঝা যায়। দিগন্ত-বিস্তার কত ছোট হোয়ে গেছে! এক ফালি জায়গার বেশী ধাত্রী তার শিশুদের আর কিছু ঋণ নিতে বিমুখ। ওভারসীয়ার সাহেব এসে বলেছিল, 'ফরাজ আলি, বে-আইনী ঘর তুলেছো।' 'হুজুর নদীর লগে হব গ্যাছে গ্যা'। তার মুখের কথা কেড়ে নিয়েছিলেন ওভারসীয়ার সাহেব, 'জমিনটুকু শুধু বাকী। তা ঠিক। কিন্তু কিছু দিতে হয় যে--'

—বে-আইনী করতাছি দিমুনা ক্যান ?

—ঠিক বুঝেছো। ওভারসীয়ার সাহেব তখন পরিতৃপ্ত মুখে বিড়ি গুঁজে

বলতেন, 'জানো ফরাজ আলি, আমাদের আবার ইঞ্জিনীয়ার সাহেবকে দিতে হয়। এই দেয়া-নেওয়ার খেলা চল্‌ছে দুনিয়ায়! দিবে আর নিবে, মিলিবে মিলাবে…'। পাঠ্য-পুস্তকের ঢেকুর তুলছিলেন তারপর। সেদিকে ফরাজ আলির কোন কৌতূহল থাকার কথা নয়। দেওয়ার ব্যাপারেই উৎসাহ বেশী। নদীর কোল ছাড়া মন টেকে না। যাক্, কিছু যাক্।

ফরাজ আলীর এক প্রতিবেশী প্রায় বল্‌ত, 'চলেন মিয়া বাই, চইলা যাই এহান থেইক্যা'।

—যামু কোথা? এই হালীর লগে বড় পীরিত, আর কোথাও মন লয় না। গ্যাহো, চুলের লাহান সোতের গেরো।

চুলের মত স্রোতের গ্রন্থি।

কণ্ঠস্বরে ফরাজ আলির অনুভূতি রূপ পায়। অবয়বে সে পাষাণের মত অনড়।

প্রতিবেশী হাসত। 'বড় জবর পীরিত, মিয়া বাই। শাদী করেন এবার। ভাবী-সাব ত বহুৎ জমানা এন্‌তাকাল করছেন।'

— না। আর শাদী করমু না। এই হালী লগ ছাড়ে কৈ। কিন্তু আমার লগে এত পীরিত ক্যা?

—পছন্দ অইছে।

—হালীরে কৈ, হালী—আঁর কি আছে। ক্ষেইপ্যা উঠস্, ক্ষেইপ্যা ওঠ। যা' হালী বাঁধ ভাইঙা কুমিল্লা শহরৎ—ওহানে বড় বড় সা'ব আছে—পীরিত মজাসে করতা পারবি। সাব মটোর চড়াইবো, শরাব পিলাইবো। যা, হালী যা'—ওহানে ইমারৎ মিল্‌বো—পাতার ঘরৎ আস্‌স ক্যা—হালী হুনল কৈ—

অবিকৃত মুখে ফরাজ আলি শ্যালিকার উপর অভিসম্পাত ঝাড়ত।

আজও স্ত্রীর সহোদরা নির্বিকার।

বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে গোমতীর স্রোত দ্রুত শুরু হয়। বাঁশের লগির গায়ে খল্‌খল্ কল-হাস্যে আছড়ে পড়ে।

আকাশে হুঙ্কার-রত পুরু মেঘ ছিন্ন-ভিন্ন কালো গো-পালের মত গুঁতো-গুঁতি শুরু করে।

আব্বাস এবার দাবি-দৃঢ়কণ্ঠেই কথা চালায়, 'বা-জান। আঁই আর পারতাম নজ। লগি ধরেন আপনে!'

এতক্ষণে হুঁশ হয় ফরাজ আলির, আরো জোরে ঝড় উঠতে পারে।

সমস্ত আকাশ ঝুলে পড়েছে। গোমতীর দূর-বিস্তার-বক্ষ মেঘের অন্ধকারে লুপ্ত। আশে-পাশে কোন নৌকা নাই। পিতা-পুত্র কালো পট-ভূমির গহ্বরে যেন সেঁধিয়ে যাচ্ছে।

—বা-জান, জল্দি করেন।

আশঙ্কা-ক্লিষ্ট চীৎকারে পুত্র হুঁশিয়ারি ছাড়ে। শন্‌শন্ বাতাসের আওয়াজ মৃদু-ভাষের কোন দাম নেই আর! ফরাজ আলির চীৎকারে জবাব দিতে হয়: আইতেছি।

পিতার জায়গায় পুত্রের সমাসীন হোতে কয়েক মুহূর্তের অপচয়। তারই ভেতর নৌকা চর্কির মত তিন পাক খেয়ে গেল।

জোরে চীৎকার করে ফরাজ আলি, 'হাইল জুরসে কোলের দিকে টানতে লাগ্, বা-জান।'

আরে কওয়া লাগবে না।

এম্নি আক্কাস শান্ত ছেলে। এখন তেজী গলায় বিরক্তি ষোল আনা জানান দেয়।

নৌকা সায়েস্তা হোয়ে গেছে। লগি ফেল্‌ছে ঝপঝপ ফরাজ আলি। নিমেষে চারিদিক সীসার থাপে যেন ঢুকে গেল। ঝড় উঠ্‌ল জোরে।

চীৎকারে এখন সাধারণ বাক্য বিনিময় হয়। ফরাজ আলি বলে, 'ডর না করস, বা-জান। হাইল ঝিক্যা দে। ঝিক্যা দে!'

···দিতাছি। বালকের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর বাতাসে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

—হালা ক্ষেপ্‌ছিস, হালী। তোরে ডরাই না। তোরে ডরাই না! বাচ্চা লগে। হালী আর সময় পাইলি না মস্করার। তরে খাহামু, ছিনাল···

আপন মনে চীৎকার করে আর লগি ঠেলে ফরাজ আলি। কুঁজো হোয়ে যাচ্ছে সে। লগি বেঁকে যাচ্ছে ধনুকের মত! দরদর ঘাম ছুটেছে গা থেকে।

আক্কাস আন্দাজে হাল চালায়।

শন্‌শন্ বাতাসের সঙ্গে এবার বৃষ্টি শুরু হোলো। শব্দে কান পাতা দায়। চতুর্দিক মুছে গেছে। আঁকা-বাঁকা নানা কোণে বৃষ্টির ফোঁটা তীর বেগে ছুটে আসছে।

ফরাজ আলির ডিঙি থামে না। আঁকছে, বাঁকছে—ঢেউ-এর দোলায়

নেচে নেচে তলিয়ে যাচ্ছে, আবার মাথা ফুঁড়ে উঠ্‌ছে। হাতের পেশীর কাছে প্রাকৃতিক আক্রোশ বৃথাই ফোঁস চালায় বিষ-শূন্য নাগিনীর মত।

টোকা মাথায় দিতে যায় ফরাজ আলি, উড়ে পড়ে গেল নদীর ভিতর।

—যা 'হালী লিয়া যা, শরীফ খান্দানের মাইয়ার লাহান বুকে কাঁচুলি বাঁধবি। বা-জান, তর টোকা ফেইল্যা দে—ফেইল্যা দে। একখান কাঁচুলি তোয়ার লা আম্মার বুকে বেতপ ভাহাইবো—ফেইল্যা দে—।

বাতাসের রন্ধ্রে ফরাজ আলির চিৎকার দাপটের পথ পায়।

আকাশ পিতার অনুরোধ রাখে না। চুপ-চাপ নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে।

হেসে উঠল ফরাজ আলি। দাঁত বেরোয় না, ঠোঁট কাঁপে না, গালে টোল পড়ে না। তবু হাসে সে। আজব ধরণ। বুক শুধু গুরগুর করে ওঠে, দোলা খায় বার-বার।

ফরাজ আলির মুখ বন্ধ হয় না: 'তুলা বাইয়ের লগে মস্করা করতাছস? আঁই মরদ। বুজ্‌ছনি হালী? মহাজনের কেরায়া নাউ, নইলে ভাহাই দাম হালী নাউ চালান্ ক'রে কয়।'

ফরাজ আলির স্বগতোক্তি কেউ শোনে না। শোনে সে। হয়ত শোনে উন্মাদিনী গোমতী।

গাছ-পালার মেরুদণ্ড রবারের মত কুঁচকে আবার সটান হোচ্ছে। ঝাপসা বৃষ্টি-শীকরে বোঝা যায় না, ওইগুলো গ্রামান্তরে গাছ-পালা। পুঞ্জীভূত কালোর পাহাড় যেন ভূমিকম্পে কাঁপছে। তারই আর্তনাদ, ছলাৎছল পাগল ঢেউএর অট্টরবে, বাতাসের গলা টেপা গোঙানির শব্দ-পটে।

হাজার লকলকে জিভ নিয়ে বিজলীর সাপ আকাশের আলকাৎরা গা চেটে নিচ্ছে।

ফরাজ আলি এই চকিত ইশারার ফাঁকেই দেখতে পায়: নিকটে ঘর ও ঘাট। বাঁকের মুখে এসে পড়েছে তারা।

আর একবার ভেংচি দিল সে কালিকার উদ্দেশ্যে।

বৃষ্টি থেমে এলো ইল্‌সে-ফোঁটায়। ঝড়ের আক্রোশ অবিরাম গতি তেমনই চল্‌ছে।

ঘাটে নৌকা বেঁধে ফরাজ আলি চুটিয়ে ঝাল নিংড়ে দিল, 'আয় হালী, দেহি তু'র। বা-জান, টোকা ফেইলা দে—।'

শেষ সম্বোধন পুত্রের উদ্দেশ্যে।

আক্কাস কোন কথা কানে না তুলেই জাল কাঁধে ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

ঝড়ের জুলুমে মাছ ধরা মাটি। আক্কাসের বড় খারাপ লাগে।

পৈঠায় নৌকা বেঁধে পেছন পেছন এলো ফরাজ আলি।

আগেই ডিপা জ্বেলে দিয়েছে আক্কাস।

ভিজে গামছা খুলে কালি লুঙ্গি পরছিল, ফরাজ আলি তখন জিজ্ঞেস করে, 'সালন পাক করতা চাস্, বা-জান?'

মাথা দোলায় আক্কাস। না।

—আব্বা। ছাডান দিন্। ফজরের বাতে অইব।

আর কথা বল্তে পারে না সে। হি হি করে শীতে কাঁপতে থাকে। অনেক বৃষ্টি গেছে কচি মাথার উপর দিয়ে।

বাঁশের আল্না থেকে কাঁথা টেনে গায়ে দিল আক্কাস।

ফরাজ আলিরও খুব শীত পেয়েছে। এখন প্রয়োজন সামান্য তামাক। নৌকায় সব ভিজে গেছে। বাঁধের উপর, আরো দক্ষিণে রহম মুদীর দোকান আছে। যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না এমন দুর্বিপাকে।

দুইজনে ক্লান্ত।

আক্কাশ বেশী কথা বলে না। চুপচাপ থাকে। কিন্তু মনে মনে সংলাপ চলে সে অবিকল পিতার সংস্করণ। খেলাধূলায় খুব পটু ছিল। আজকাল বাপ সঙ্গী হিসেবে তাকে মর্যাদা দিয়েছে। মৃত পত্নীর স্মৃতি অথবা জীবিকার জুটি-রূপে। তাই আরো চুপ করে থাকে আক্কাস। অনেক দিন ঘরে বসে বা ডিঙর লগি ঠেলার সময় নদীর পাড়ে ছেলেদের কোলাহলে তার মেজাজ তেতে, মুখের পেশী শক্ত হয়ে উঠতো। কিন্তু মুখে সরব কিছু শোনা যেত না।

বাইরে অন্ধকার নদী আর ঝড়ের গর্জন একাকার মিশে গেছে।

পিতা-পুত্র পাশাপাশি বসে আছে। দুইজনে নীরব। সামান্য নড়া-চড়ার ইচ্ছাটুকুও অন্তর্হিত।

আক্কাস মাঝে মাঝে কান খাড়া করে।

পৈঠার উপর গোমতী মাথা কুটছে। পাড় ভেঙে পড়ছে ঝপঝপ শব্দে।

কলাগাছের জন্য আক্কাসের দুঃখ হয়। সব হয়ত নদীতে ভেঙে পড়বে কাঁদিসহ।

—বা-জান, নদী যা' গরজাইতেছে কেলা গাছ হব পইড়া যাবো, চলেন

কাঁচা কাইট্যা আনি।

—আইজ ঠিক থাইকব।

জনক অভয় দিল সংক্ষেপে।

আক্কাস তবু উসখুস করে। তার মন সরে না। সামান্য গড়িমসির ফলে এমন তৈরী জিনিস নষ্ট হবে। এক সপ্তাহ থাকলে পাকা কলা বাজারে বিক্রী করে আসতে পারত।

ঘরের প্রবেশ-পথে সে মুখ বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করল। জোরে ঝড় দিচ্ছে, অন্ধকারে আন্দাজেই সে দেখতে পায় যেন, কলাগাছ জোরে নাড়া খাচ্ছে। শিকড়ে বেশী মাটি নেই। রাত্রি কাবার হোতে-হোতে গাছের আয়ুও কাবার হবে।

কিন্তু নিকটে কি যেন সাদা সাদা দেখা যায়। দমকা বাতাসে ছলাৎ শব্দ হয় পৈঠার নিকট। পানি কি বাড়ছে তবে?

আশঙ্কিত ডাকে আক্কাস, অ বা-জান। বা-জানের খোয়ারী লেগেছিল। আক্কাসের গলা অতদূর পৌছায় না।

আরো জোরে ডাকল সে, অ বা-জান।

কি ক'। সুপ্তোত্থিত কণ্ঠ।

—ত্যাহেন। পানি বাড়তাছে। বান আইতা পারে।

গোমতীর রগ্ চেনে ফরাজ আলি। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল সে। মাটির বাসন আড়াল দিয়ে পিঁদিম হাতে এগিয়ে এলো। ফিকে আলো নদীর ধারে পৌছায়।

ফরাজ আলি চেয়ে দেখে, নূতন ফেনা পৈঠার গায়ে। আক্কাসের আশঙ্কা মিথ্যা নয়।

আশঙ্কায় ফরাজ আলির বুকও হয়ত কাঁপল। সে বিড বিড় শুরু করে, 'হালী, এহন-ই জ্বালাইতা লাগছস।'

গালি দেওয়ার বেশী অবসর নেই। ঘরে ফিরে এলো সে। এক কোণে স্তূপীকৃত বংশ-পায়া ঠিক আছে কিনা, পরীক্ষা করল। বান বাড়লে, মাচান-পোষই একমাত্র আশ্রয়।

বাইরে চড়চড়-ধ্বঅস-স শব্দ হোলো। আবার স্রোতের হুট্‌পাট। যেন কুমীর কোন জংলা হাতী শিকার ধরেছে।

আক্কাস বলে, বা-জান। নদী গাছ নিতাছে, নদী। চলেন…'

—না' আন্দারে যাওনের কাম নাই।

পিতার কণ্ঠ রুক্ষ। সমস্ত নদীর গায়ে কত ফাটল। এখন যাওয়া সমীচীন নয় মোটে। আক্কাস বোঝে না কেন?

বাঁশের পায়া ঠিক করে, দুইজনে প্রতীক্ষায় থাকে। হুড়হুড় শব্দ হচ্ছে। ষাঁড়ের পাল গাঁ-গাঁ রবে মাঠের সড়ক ধরে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। ঝড়ের দাপট পূর্ববৎ।

আধ ঘণ্টার ভেতর বন্যার জল হু হু বাড়তে থাকে। পৈঠা করে পার হোয়ে, এখন ঘরে ঢুকছে।

ওসব দুর্বিপাক ফরাজ আলির গা-সওয়া। কিন্তু আরো কত বাড়ে বন্যা, সেখানেই সমস্যা।

সে আরো কয়েক ইঞ্চি লম্বা পায়া লাগালো মাচাং-পোষে।

আক্কাস চুপচাপ হাঁটুর ভেতর মাথা গুঁজে বসে থাকে। বাবা একবার খাওয়ার তাড়া দিল। কিন্তু ক্ষুধা তার মিটে গেছে। ক্রূর কালো অন্ধকার পটে দৃষ্টি মেলে সে এক-একবার তাকায়। তার কিশোর মনে হাজার রকমের প্রশ্ন অর্থহীন জিজ্ঞাসায় ভিড় করে।

দু-ঘণ্টায় বানের জল হু হু করে ঢুকে পড়ল চারিদিকের রন্ধ্র পথে। মাচাং এবার দ্বীপ। পিতা-পুত্র দ্বীপের অধীশ্বর। এখনও জলছে টিম্‌টিম্ প্রদীপ। ঝড়ের দমকে ঘরখানা মচ্‌মচ্ শব্দে কাঁপছে। থুবড়ে পড়বে না তো সব নিয়ে! ফরাজ আলি একবার ভাবল।

নীচে হাঁটুর বেশী পানি। দড়ির শিকেয় হাঁড়ি-কুড়ি ঝুলছে। পাখীর খাঁচা ঘরে তোলা হয়েছিল। ডানায় মু্খ গুঁজে ঘুমিয়ে আছে পাখীটা এক পায়ে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ খাঁচা নড়ে উঠল। ডানার ঝটপটানি ওঠে।

সান্ত্বনার স্বরে ফরাজ আলি বলে, 'র', 'র'।' বিষণ্ণ খেচর আবার মাথা গুঁজে ডানার ভেতর।

ঝড় সামান্য কম্‌লো। কিন্তু বন্যার জল মেঝের উপর এক বুক।

এমন বহু রাত্রি কাটিয়েছে ফরাজ আলির স্ত্রীর সঙ্গে। সেও আজ ভয় পায়। নূতন তৈরী ঘর। এই যা' ভরসা।

নেশাগ্রস্ত প্রাণীর মত আক্কাস ঝিমোয়।

চোখে নিদ্রা। বুকে ভয়। দোটানায় ঝড়ের দমকে ঘর কেঁপে ওঠা মাত্র হঠাৎ সে হাউ-মাউ করে উঠল।

—বা-জান' ?

—চুপ র'। ডরাস ক্যা ?

ধমক দিল ফরাজ আলি ; কিন্তু পর মুহূর্তে সে-ও বিবেচনার লাঙল চালায় মনে মনে। বন্যা পড়েছে, বাড়ছে। এমন কালরাত্রি। এখনও সাঁতার দিয়ে বাঁধে ওঠা চলে।

কিন্তু ঝড়ের মুখে পড়া যুক্তিযুক্ত নয় !

সৌভাগ্য তাদের। ঝড় থেমে গেল একটু পরে। কিন্তু আকাশ সাক্ষী যে-কোন মুহূর্তে আসতে পারে আরো জোরে। দমকা বাতাস থামেনি এখনও।

এই সুযোগ !

আব্বাস বাবার ধমক খেয়ে মাচাঙে শুয়ে পড়েছিল কাঁথা মুড়ি দিয়ে।

ফরাজ আলি তা-কে ঈষৎ ঠেলা-মেরে বলে, 'বা-জান, ওড্। এহানে আর না।'

—কুই যাবো ?

—কি কস ? এহানে আর না। বাঁধের উপর যামু।

আব্বাস যেন এমনই অনুরোধের প্রতীক্ষা করছিল। এক মুহূর্তে তৈরী সে।

ফরাজ আলির গলা-সই পানি। আব্বাসের সাঁতার ছাড়া উপায় নেই।

ফরাজ আলি ভাতের হাঁড়ি, মাদুর কাঁথা মাথার উপর চাপিয়ে দিল। শেষে চোখে পড়ে, খাঁচা আর পাখী। তা-ও মাথায় তুলে নিল সে। মনে মনে বলে, 'ময়না, এ ঝড়ের রাইত। তোরে ছাড়মু না। জান্ যাবে তোগোর। কাল বিহানে ছাইড়া দিমু। হালী…'

ডিপা নিভে গেল একটু অসাবধানতার ফলে। অন্ধকারে উঠানে নাম্‌ল ফরাজ আলি।

'বা-জান'। পুত্রকে সম্বোধন করে বলে সে, 'বা-জান আমার কান্ধার পর হাত রাইখ্যা সাঁতার দিতা র'। ঠিক যামু বান্ধের লগে।'

আকাশে কোন-কোন ঠিকানায় মেঘ সরে গেছে। নিষ্প্রভ চাঁদ ছিল শুক্লা তিথির। এইটুকু বিরাট সান্ত্বনা ফরাজ আলির কাছে। হোক ঝাপসা বাকীটুকু আন্দাজ পরিপূরক।

আব্বাস পিতার কাঁধ ধরে সাঁতার কাটে। এগিয়ে যায় ফরাজ আলি। বাঁধা সব জায়গা দিয়ে উপরে ওঠা চলে না। পায়ে পায়ে পথ-পড়া দাগ খোঁজা চাই। চাঁদের আলো আর একবার দুই মনুষ্য সন্তানের উপকারে এগিয়ে এলো।

বাঁধের উপর পৌছল তারা।

আকাশ আরো পরিষ্কার হয়ে আসে। মেঘ-মুক্তির আস্বাদে জ্যোৎস্না ফুটফুটে রোশনাই ছড়ায়।

কাঠের কয়েকটা মোটা গুঁড়ি পড়েছিল চওড়া বাঁধের এক পাশে। তারই উপর পুনর্বসতির মহড়া। সব গুছিয়ে রাখল ফরাজ আলি।

তার গামছা, লুঙ্গি পরিধেয় সম্বল দুই ভিজে গেছে। যা' শীত, স্যাঁত্‌সেতে কিছু পরে থাকা অসহ্য। ফরাজ আলির উপস্থিত বুদ্ধি সর্বক্ষণ ঘটে জমা থাকে। সে চট করে ভিজে লুঙ্গি খুলে ফেলে উলঙ্গ হয়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে বসে পড়ল কাঠের গুঁড়ির উপর।

আক্কাস মাথায় গামছা বেঁধে সাঁতার দিয়েছিল। তার পরনে কাপড়। শুধু গা শির্‌শির্ করে শীতে। সে দাঁড়িয়ে থাকে।

ফরাজ আলি বলে, বয়, বা-জান।

—আঁই বইতাম ন।'

— ক্যা?

—আঁই আর এহানে থাকুম না।

—যাবি কুই?

—শহরে যামু।

—খাইবি কি ওহানে?

—চুরি করমু, ডাকাইতি করমু, কাম করমু—

—মরদের বাচ্চা, চুরি ডাকাইতি করতা চাস, শরম করে না—শরম করে না?

চিড-ধরা গলায় জবাব দিল আক্কাস, 'মানসে এ্যামনে থাহে? তুমি সুমুন্ডের বাচ্চা, না মানুসের বাচ্চা? নদীর লগে-লগে থাকার চাও, তোয়ার শরম করে না? সুমুন্ডের বাচ্চার লাহান খালি ...।' শিশুকের বাচ্চা। বিস্ময়ে তাকায় ফরাজ আলি পুত্রের মুখের দিকে।

তারপর জোর করে রুষ্ট পুত্রকে পাশে বসিয়ে বলে, 'বয়। ঠিক কইছস। বিয়ান আইতে দে। আমিও যামু তর লগে। মহাজনের নাউ দিয়া দিমু।'

ঠাণ্ডায় হি হি করে কাঁপে আক্কাস।

ফরাজ আলি সস্নেহে তাকে কাঁথার ভিতরে মুড়ে দিয়ে নিতে

নিতে অপরাধীর মত বলে, 'শরম না করস। আঁই তোয়ার পোলা ন, বা-জান ?

বিবস্ত্র পিতা। পাশে গাম্ছা-পরিহিত পুত্র।

দুইজনে ভোরের প্রতীক্ষা করে।

আরো দুটি মৃত্যু

হাসান হাফিজুর রহমান

নারায়ণগঞ্জ থেকে বাহাদুরবাদ যাচ্ছে যে রাত্রির ট্রেনটা, এই যে ষ্টেশনে এসে থামলো, মাত্র দুমিনিট দাঁড়ায় এখানে। অন্ধকার রাত, কিছুই চোখে পড়ছে না। ষ্টেশনে ঘরটার জানালা ও দরজায় যে আলোর আভাস ছিল, চোখের ওপর অকস্মাৎ ঝাপটা দিয়ে চলে গেছে ট্রেন থামতে না থামতেই। কামরাগুলোর আলোকিত গহ্বরকে চারিদিক থেকে মুড়ে দিয়েছে কালো রাত। বাইরে হাতটি মেলে ধরলেও চিহ্নিত করা যাবে না। ভীষণ শীত পড়েছে ; যাত্রী কেউ উঠবে, কি উঠবে না কে দেখে। ভেতরে সব গুটিশুটি মেরে বসে আছি নির্লিপ্ত হয়ে।

এমন সময় পাশের কামরা থেকে আওয়াজ শোনা গেল, এহানে জাগা নাই, এহানে জাগা নাই, আবে দেহ না? কথাগুলো শেষ হতে না হতেই ব্যস্ত সমস্ত থপ-থপ পায়ের আওয়াজ, চুড়িরও শব্দ। মানুষের হাঁপানোর সাথে সাথে কে যেন কামরা ছেড়ে সামনে এগোতে লাগলো। তারপর আমি যে কামরাতে বসেছিলাম সেইটের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল যারা, ওরা চিৎকার করে উঠলো, এহানে জাগা নাই, এহ..ন জাগা নাই, আরে দেহ না!

কিন্তু ততক্ষণে ঘণ্টি বাজিয়ে দিল ষ্টেশনের। গাডও চলার ইঙ্গিত জানালো হুইসিল বাজিয়ে। কেউ এবার অধৈর্য হয়েই যেন হাতল খুলে দরজাটা ভেতরের দিকে ঠেললো যতো জোরে পারে। নিচে কিশোর কণ্ঠে ভয়ার্ত চিৎকারও শোনা গেল একটা, কাকীমা গো! শব্দটা সেই ভয়াবহ নিথর নিস্তব্ধতাকে মুচড়িয়ে দেবার মতো যে লোকটা উঠতে দেবে না বলে দরজাটা চেপে ছিলো এতক্ষণে, সে এমনি বিমূ..য়ে গেল যে তার হাতদুটো নিজের থেকেই সরে এলো, নিজেও পেছিয়ে গেলো দুপা। এরপর, প্রথমে একটি পুটলি ও টিনের সুটকেস ঠেলে দিয়ে ভেতরে উঠলে প্রৌঢ় একজন হিন্দু ভদ্রলোক। সাধারণ ধুতি কাপড় পরেছে, ঘিয়ে রঙের চাদর গায়ে জড়ানো। দাঁড়াবার একটু জায়গা করে নিয়েই হাত বাড়িয়ে নিচের থেকে কিছু তোলার জন্যে এমন

সযত্ন ভঙ্গিতে চেষ্টা করতে লাগলেন যেন ঠুনকো কাচের কিছু তুলছেন। কিন্তু যা তুললেন তা একজন মেয়েলোক। মধ্যবয়স্কা, প্রায় ত্রিশ। প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হয় যে স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। উঠে পড়েই মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে বসে হাঁপাতে লাগলো। এরপর ছোট একটি মেয়ে উঠলো, ন'দশ বছরের দৌড়তে দৌড়তে। কেননা ট্রেন ততক্ষণে হুইসিল বাজিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে ঝকঝক করে।

আমরা যেটায় বসে ছিলাম সেটা একটা 'একুশ জন বসিবেক' কামরা। ঠাসাঠাসি করে বসে, একজন অন্যজনের উপর ঢুলে পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ ধাক্কা খেয়ে ঘুম ভাঙছিলাম আর ঘুমাচ্ছিলাম। দুজন বেপরোয়া লোক উপরে দেদার জায়গা নিয়েছে। আমি নিজে ঘুম তাড়ানোর চেষ্টা করছিলাম। কারণ তন্দ্রার ঘোরে পাশের লোকটির শরীরের ওপর পর পর দুবার ঢুলে পড়ার জন্যে যে বিভীষিকাময় আপত্তি শুনেছি, আমার নিজের বেলাতে অন্য কাউকে যদিও তাই তাই বলতাম, তবু হজম করতে পারি নি।

জেগে থাকতে থাকতে প্রথমে কথা বলার ইচ্ছে করছিল। কিন্তু চার পাশের লোকগুলোকে এমনি স্থবির মনে হলো যে প্রাণপণ বেগে ঘা দিলেও এদের একজনের ভেতর থেকে শব্দ বেরুবে না। ফাল্গুনের বিদায়ী শীতের ঠাণ্ডা তো আছেই, তাছাড়া এমনি ক্লান্তির স্তব্ধতা সারাটা ঠাঁই জুড়ে, যেন কথা বলতে গেলেই যতটুকু উষ্ণতা জমিয়ে নিয়েছে বুকের ভেতর এতক্ষণ ধরে, তাও শেষ হয়ে যাবে। এরপর আমাদের জমে যাওয়া ছাড়া কোন উপায়ই থাকবে না। সেজন্যেই শ্বাস প্রশ্বাসের উত্তাপটুকু এতো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে উঠেছিলো, এবং সেটুকুই উপভোগ করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই ছিল না। পরস্পরের অজ্ঞাতেই আমরা একে অন্যকে অনুভব করছিলাম শুধু।

এ স্তব্ধতা যে শুধু ক্লান্তির তা নয়,—আতঙ্কেরও।

আমি ঢাকা থেকে আসছি, সেজন্য এ অনুভূতিটা আমার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট। পরস্পরের প্রীতির ওপরেই যেমন সামাজিক সুস্থতার নির্ভর, তেমনি পরস্পরের আক্রোশের ভেতরই সবচেয়ে বড়ো অশান্তি। এ অশান্তি যে কি, আমি জেনেছি ঢাকার দাঙ্গায়, কোলকাতার পরেই যা শুরু হয়েছিল। এমন ভয়ংকর যন্ত্রণার অনুভূতিতেই কোন দিন ক্লান্ত হইনি, এই চল্লিশ বছরের জীবনে কখনও জানি নি। ঢাকায় গিয়েছিলুম মেয়েকে দেখতে, জামাই রেলওয়ে কলোনীর বাসিন্দা, সেখানেই ছিলাম। এই এলাকা দাঙ্গাকে রোধ করেছিল। সেই হয়েছে এক

মুশকিল আমার জন্যে। খুন-উন্মত্তদের ভেতরে থেকে যদি আমারও সারা শরীর তেতে উঠতো, যদি চিন্তাবুদ্ধি উবে যেতো ধুয়োর মতো আগুনের হলকায়—তা হলেও হয়তো এক সান্ত্বনা ছিল। কিন্তু যে পরিবেশে আমি ছিলাম সেখানে থেকে এই পাশবিকতাকে ঘৃণা করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না যে সুস্থ প্রতি-রোধের ভেতর আমি ছিলাম, সেখানে থেকে এই হিংস্রতার ভয়াবহ পরিণতিকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা ছাড়া কোন পথ ছিল না। এই ঘৃণা যে একবার অনুভব করেছে তার অস্বস্তি যে কি আমি জানি।

জরুরী কাজ ছিল বটে, বাড়ী ফিরতে পারি নি। মাঘ-শেষের পড়ন্ত-শীতের দিন, অথচ এমনি হিম বাতাস ঝাপটা দিচ্ছিল যে আমার মনে হয়েছিল অন্ততঃ আমার জীবনের এতগুলো বছরের সজাগ অভিজ্ঞতায় এমনটি আর কখনো দেখিনি। আকাশে প্রান্তরে ছিল শীত আর আতঙ্ক. মানুষের মুখে মুখে ছিল স্তব্ধতা আর আতঙ্ক। শান্তিকামী কলোনীর সারা ঠাঁই জুড়ে সে কি প্রতিরোধ. দাঙ্গাকে রুখতে প্রাণান্ত হয়েছিল।

আত্মীয়তার এই শেষ রশ্মিটুকু যদি না দেখতাম তবে হয়তো পাগলই হয়ে যেতাম।

এখন ফিরছি বাড়ী, না জানি সেখানে কি হয়েছে। যমুনাপারের দুর্দান্ত মানুষগুলো যে হুজুগে মাতে, আমি তো তা জানি, আপন ভাইকেও মানাতে পারি নে। এখন অবশ্য আবহাওয়া শান্ত হয়েছে অনেকটা। মানুষের স্বভাব শুভ বুদ্ধি ও চেতনার জন্যেই এ অবস্থা টিকতে পারে না। যদি গুণ্ডা বদ-মায়েশের অত্যাচার একেবারে শেষ হয়নি, তবুও অনেক শান্তির আশ্বাস এসেছে মনে। এবং এই সুযোগেই যে এই হিন্দু ভদ্রলোকটা সঙ্গে আর দুজনকে নিয়ে, অনেকেরই মতো নিরাপদ জায়গায় চলে যাচ্ছেন তা আমি প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলুম।

লোকটা উঠেই একটিমাত্র কাজ করলো শুধু, জড়িয়ে বাঁধা বিছানাটা, হয়তো ওর ভেতর অনেক প্রয়োজনীয় জিনিসই আছে যাতে বেশ মোটাসোটা দেখাচ্ছে, মেঝেতে সমান করে রাখলো, হাত ধরে বসিয়ে দিলো মেয়েলোক টাকে সযত্নে! যেন পবিত্র কিছু রাখছে, এমনি সম্ভ্রমশীল, স্পর্শকেও যেন পবিত্র

করে নিয়েছে। ছোট্ট মেয়েটি ওঁর শরীর ঘেষে বসলো বাকী জায়গাটায়। এরপর প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি কোন দিকে না চেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ওদের পাশেই। এমন মনে হলো যে, কোন দিন কিছু দেখবেন না, কোন কিছু দেখতেও চাইবেন না। যান্ত্রিক; মূক।

লোকটাকে দেখেই প্রথম অবধি আমার কেমন ঠেকছিল। অনুভূতিটা ঠিক যে কি বুঝতে পারি নি অথচ একটা স্পষ্ট আকর্ষণ ছিল মনে, চোখই ফেরাতে পারছিলাম না।

ভয় আর আতঙ্কে মুখটা তার চুপসে গেছে, ফ্যাকাশেও হয়েছে, বেশ একটু দূরে বসলেও আমাব নজরে পড়লো। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, আর একটু বড় হলেই মৌলবীদের মুখের মতো হয়ে উঠবে। কিন্তু লোকটা পরে এসেছে ধুতি, তিনটি মানুষেব ভেতরে কারুরই—ওরা যে হিন্দু এই ইঙ্গিতটি লুকিয়ে ঢেকে রাখবার এতটুকুও চেষ্টা নেই। অথচ ট্রেনটা নিরাপদ, এমন মনে করাব কোন কারণ আছে বলে ভাবা যায় না। ট্রেনেও খুন খারাবি হয়েছে এবং হচ্ছে। একজন হিন্দুর পক্ষে বিপদটা এখানেও কম নয়। লোকটা একথা জানে বলেই মনে হলো। উট পাখি যেমন বালুতে মুখ লুকিয়ে বিপদ এড়াবার চেষ্টা করে, তেমনি আমাদের কারো দিকে একবার পর্যন্ত না তাকিয়ে ভয় আর আশঙ্কা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য প্রাণপণে নিজেকে শক্ত করে রাখছে! সে জন্যেই আমার সহযাত্রীদের মুখের দিকে একবাব কবে চেয়ে চেয়ে না দেখে পারলাম না। প্রায় সবাই ঘুমিয়ে আছে, দু-চার জন যারা জেগে, তাদের চেহারাটাই কেমন স্তিমিত। চাইছে যখন ভেজা আর নিরীহ চোখে কি ম্লান দৃষ্টি! ওদের সবাই এদেরকে লক্ষ্য করেছে সহজেই বোঝা যায়। লোকগুলোর দৃষ্টিতে এবং কয়েকটা দীর্ঘ শ্রান্ত শ্বাস প্রশ্বাসে এই প্রমাণ করছিল যে এই তিন জনের এমন দুরবস্থার জন্যে ওবা নিজেরাও কম অনুশোচনা ভোগ করছে না। কম অস্বস্তি নয়।

সব মিলিয়ে কেমন একটা ক্লান্ত গুমোট ভাব।

আমি অনেক স্থানে যাতায়াত করেছি, রাজধানী ঢাকায় প্রায়ই তো আসতে হয়। কিন্তু এ দুর্বিসহ মুহূর্তের স্পর্শ কোন দিন পাই নি। আমার

মনে হচ্ছে, এটা দাঙ্গার আতঙ্কেরই ফল। চারদিকের অমানুষিকতাই মনগুলো এমন করে থুবড়ে ছেঁচড়ে দিয়েছে। এ বিষণ্নতা অপরাধ বোধের।

লোকটাকে যমুনার গাঢ় জলের মতো ঘোলা, দৃষ্টিহীন চোখ মেলে আছে আর আমি উৎকণ্ঠিত।

সারাটা কামরার কেউই কি ওর সঙ্গে একটিও কথাও বলবে না? সংকোচই কাটাতে পারছে না কেউ। না এর সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজনই সবার মিটে গেছে হঠাৎ? যেন এ এখন এক আলাদা জগতের মানুষ, যার সাথে আবার সহজ সম্বন্ধ করার জন্যে এমনই অনুভূতির প্রয়োজন যা আসবে কি যে এক আত্মমন্থন থেকে, যে ভাবতেই শিউরে উঠতে হয়।

এতক্ষণে আমার কাছে স্পষ্ট হলো, লোকটার জন্যে একটা নিবিড় করুণাও অনুভব করছি মনে মনে।

সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হলো, লোকটা অত্যন্ত সরল; জীবনের ভয় আছে, ফাঁকি ঝুঁকি নেই। অথচ এমনি প্রাণের তাগিদে বেরিয়ে আসতে হয়েছে যে এই রাত্রি বেলাতে ট্রেনকেও নিরাপদ মনে করতে হয়েছে।

ভাবলাম একবার ডাক দিই, ভাবলাম একবার কাছে এনে বসাই।

পর মুহূর্তেই সমস্ত কামরাটার দিকে চেয়ে গলা দিয়ে আর শব্দই বেরিয়ে আসতে চাইলো না। মনে হলো এখন যদি একটি মাত্র কথাও বলি, তবে তা ভারী কাচ ভেঙ্গে চুরমার হাওয়ার মতো শব্দে খান খান করে ফেলবে এই দুঃসহ নিস্তব্ধতাকে। সেই আওয়াজ অনন্ত কাল ধরে কুরে কুরে বাজতেই থাকবে, কোনদিন থামবে না। আর সেই তিনটি মানুষও ভয়াবহ আতঙ্কে ও শঙ্কায় শুধু কাঁপবেই, কাঁপতেই থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না বিবর্ণ নীল হয়ে মরে যায়।

যমুনার সেই উত্তাল ঢেউগুলো যেন খলখল করে উঠলো বুকের ভেতর। কেমন একটা ভয়ে চুপ করে গেলাম।

মানুষের বন্য আক্রোশ ওদের তাড়া করে ফিরছে।

মুখটি ঘুরিয়ে নিয়ে ঘাড় গুঁজে রইলাম কতকক্ষণ নিচের দিকে চেয়ে। তারপর লাইটের চারদিকে ঘূর্ণমান পতঙ্গগুলোর অধৈর্য পাখা ঝাপটানো

দেখলাম। আমাদের কামরায় তিনটি সার। আমি বসেছিলাম জানালার কাছের একসারে। মধ্যের সারের লোকগুলোরই অসুবিধা বেশী। ওদের হেলান দেয়ার সুবিধে আমাদের মতো নয়, তাছাড়া হাওয়াও তো পায় না গরমে। ঠিক যেন মাঝের জমি, নালার পানি পায় সবচেয়ে কম। ওদের একজনের লালা গড়িয়ে পড়ছিল চোয়াল বেয়ে। ঘুমকাতুরে আর একজনের দাড়ির অগ্রভাগটা গাড়ীর ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে যেয়ে লাগছিল আর একজনের ঘাড়ে। সে লোকটাও ঘুমে—সুড়সুড়ি লাগা জায়গাটা বারবার চুলকিয়ে নিচ্ছিল ঘুমের ঘোরেই।

অন্যসময় হলে হাসতাম হয়তো। কিন্তু এখন কেমন মায়া লাগলো তিনজনের ওপরেই। ঘাড় ফিরিয়ে আবার চাইলাম সেই হিন্দু লোকটার দিকে। লোকটা এখন আমার উল্টো দিকের থাকে রাখা বেডিংয়ের সাথে ঝুলানো একটি লোটার ওপরে চোখ রেখেছে। তৃষ্ণায় নিষ্প্রভ চোখ দুটো যেন জ্বলছে। কয়েকবার শুকনো ঢোকও গিল্‌লো বলে মনে হলো। মনের জড়তাকে এক মুহূর্তে ঝেড়ে ফেলে হাত নেড়ে হঠাৎ ডাকলাম তাকে। লোকটা অপ্রস্তুতের মতোই সামনে এসে দাঁড়াল ধীরে ধীরে। আসবে কি আসবে না এই ইতস্ততটুকু করার সাহস পর্যন্ত নেই। ঠোঁট নেড়ে বললোও যেন কি! কিছুক্ষণ অসাড় কণ্ঠে সাড়া জাগাতে চাইলাম আমি নিজেও। পরে সহসা পাশে অনেকটা জায়গা করে দিয়ে বলে উঠলাম, বসেন। আমার পাশের লোকটাও সমর্থন করে বলে উঠলো হ্যাঁ, হ্যাঁ, বসেন। অন্ততঃ শরীরের গরমে আর একটু চাঙ্গা হওয়া যাবে—আমাদের শীতের কাপড় যা আছে তা ত হু……

এদিকে রাতও শেষ হয়ে আসছে। আমরা অনেকগুলো ষ্টেশন পার হয়ে এসেছি ইতিমধ্যে। লোকটা বসলো। উপায়ান্তর নেই বলেই বোধ হয়। কিন্তু উসখুস করতে থাকলো কেমন। বারবার তার সাথের অসুস্থা স্ত্রীলোকটার দিকে তাকাতেই লাগলো। উৎকণ্ঠায় একটা শিখার মতো দপ্‌ দপ্‌ করে উঠছে, আবার নেতিয়ে যাচ্ছে। ওর পাশ থেকে চলে আসার জন্যেই কি অস্বস্তিটা হঠাৎ বেড়ে গেছে? ভাবলাম, হয়তো বা আমাদের সান্নিধ্যে এসে সে কিছুতেই সহজ হতে পারছে না।

লোকটা গলা উঁচু করে বসেছিল। কণ্ঠনালীর বাঁকা জায়গাটায় আলোর চিকচিকে ছাট এসে পড়েছে। হঠাৎ চোখ পড়লো আমার তার ওপর। ওই

সামান্য জায়গাটুকু—জোর টান দিলেই হয়তো, একটু ছুরির আঁচড় লাগালেই তো শেষ হয়ে যেতে পারে লোকটা! এত ক্ষীণ প্রাণ মানুষ, এতো সংক্ষিপ্ত। একেই নিশ্চিহ্ন করার জন্যে কি বিভীষিকাময় পরিকল্পনা, এতো হিংসা। লোকটাকে যেন মুঠির ভেতর অনুভব করতে পারছি। সম্পূর্ণ আয়ত্তে আমার সে! এতো ছোট, ভীরু কপোতের মতো একটা মানুষ!

বুকটা শির শির করে উঠলো। লোকটাকে কি আমি মুচড়িয়ে দিতে পারি? এক্ষুনি?

বুকের উত্তাল ঢেউটি জোরে বাঁক নিয়ে নামলো। সঙ্গে সঙ্গে কেমন অদ্ভুত একটা স্নেহে ঝিমিয়ে এলাম। নিস্তেজ, তৃপ্ত অবসাদে।

ইচ্ছে হলো সারাটা রাত গল্প করে কাটিয়ে দিই। নিয়ে যাই একে আমাদের বাড়ী। কোথায় যাবে কষ্ট করে আর নিরাপত্তার খোঁজে, আমি ওকে আগলাবো।

লোকটার দিকে চেয়ে .পারে একটা নিঃশ্বাস ফেললাম।

মেহনতী মানুষ আমরা, প্রাচুর না থাকলেও দুটো তিনটে মানুষকে যে ভার বলে মনে করবো, এতো ছোট হয়ে যাই নি। কিন্তু গ্রামের কথা ভাবতেই প্রথমেই মনে হলো, এদের নিয়ে যাব বাড়ীতে, আমরা সব একসাথে বসতি করব, এমন সময় আর নেই। আবার কবে তা আনবে, তাও জানিনে। গ্রামের কথা মনে হতেই আরো চিন্তা এলো বানের পানির মতো হু হু করে। কি হয়েছে, কেমন আছে, কেমন চলছে—সংসারের মধ্যে জড়িয়ে গেছি আমরা—চিন্তা একবার শুরু হলে একেবারে অতলে ডুবে যেতে হয়।

কিন্তু সব ফেলে পাশের লোকটার দিকেই যে খেয়াল দেয়া প্রয়োজন, তাই মনে হলো! নেড়েচেড়ে বসলাম জুতোটা খুলে। ভাইয়ের ছেলের জুতো পরে এসেছিলাম, আঁটসাট হওয়াতে পা গেছে কেটে। টাটাচ্ছিল। পা তুলে নিলাম ওপরে। শরীরটা একটু প্রসারিত হলো। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা এমন সংকুচিত, একটি সরল রেখার মতো শীর্ণ হয়ে জায়গা দিতে চাইলো যে লজ্জায় শিউরে উঠলাম।

এখনো কি সে ভয় করছে আমাকে। ভয়?

পা নামিয়ে নিলাম তাড়াতাড়ি করে। ওর পিপাসার কথাটাও মনে হলো তখনি। অনেকক্ষণ থেকেই খচ্ খচ্ করছিল। হঠাৎ প্রশ্ন করে উঠলাম, পানি খাবেন?

মাথা নেড়ে বলল, না।

কথাটা শেষ হতে না হতেই সারাটা শরীরও কেঁপে উঠলো তার থরথর করে। ঘাড় ফিরিয়ে স্থির, নিস্পন্দ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল সেই মেয়েটার দিকে। এবার অবাক হলাম আমি। মেয়েটাকে ঘিরে ওর অস্বস্তিকে লক্ষ্য করেছি। কিন্তু কাঁপছে কেন এ? এতো? কিন্তু ওর দৃষ্টিকে অনুসরণ করে যা দেখলাম তাতে অবাক হলাম আরো। গাড়ীটা যতোবার কেঁপে উঠছিল, মেয়েটারও সারা শরীরে ঝাঁকি দিয়ে অদ্ভুত বেদনায় কুঁকড়ে দিচ্ছিল মাংস পিণ্ডগুলো। প্রত্যেক কাঁপুনির সাথেই এমনি করে সে শিহরিত হচ্ছিল। যেন মৃত্যুর দাঁত থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে বার বার।

ইচ্ছে হলো জিজ্ঞেস করি, ব্যাপারটি কি।

কিন্তু লোকটা নিজেই এবার মুখ ফিরিয়ে বলল, আর্ত, অথবা চাপা, ফিসফিসে স্বরে.—প্রসব!

কথাটা প্রথমে বলকিয়ে বলকিয়ে সেই ভয়াবহ নিস্তব্ধতাকে দুমড়াতে লাগলো। তারপর থমথম করে বাজতে থাকলো। অবশেষে সমগ্র নিস্তব্ধতাটাই যেন কথাটার ভেতর স্থির হয়ে, পাথরের ওপর খোদাই করা অক্ষর যেমন থাকে, তেমনি স্থবির হয়ে গিয়ে সমস্ত কামরাটা ভরাট করে ফেললো। মেয়েটা যে আসন্ন-প্রসবা, তা আমার প্রথমেই লক্ষ্য করা উচিত ছিল। গ্রামে একটা সুনাম আছে, সবার টুকিটাকি খোঁজও রাখি বলে। কিন্তু এটা এমনি অসম্ভব যে আমার ধারণাতেও আসার সুযোগ পায় নি। কেননা একজন প্রসব-উন্মুখ মেয়েকে পথ হাঁটিয়ে আনা, গাড়ীর ঝাঁকুনিতে অন্য কোথায়ও নিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক কথা নয়। এদের সম্পর্কে অন্তত: এতটুকু কল্পনাতেও আসেনি আমার। কিন্তু এখন ভাবতেই সারা দেহ রাগে শির শির করে উঠলো। কেমন, মানুষ! লোকটাকে ধিক্কার দেব মনে করলাম, মনে করলাম অভিসম্পাত করব। সেজন্যেই মুখ ফেরালাম। কিন্তু তখনি মনে হলো এ ছাড়া হয়তো এদের আর কোন উপায় ছিল না। মৃত্যু এদের সব দিকে ঘিরে আছে। যে মুখটাতে অভিসম্পাতের বিষ ছড়াবো ভেবেছিলাম, সেখানে চাইতেই দেখি সেই ম্লান চোখ দুটো ছল ছল করছে! কান্নাকে প্রাণপণে ঠেকিয়ে রাখলে যেমন হয়, তেমনি।

ছোট মেয়েটা ঘুমুচ্ছে। আর ও মেয়েটা সমস্ত বেদনাকে সংযমে রাখার জন্যে এখন এমনি তীব্র আবেগে শরীর চেপে রাখছে যে একটি নিঃশব্দ গর্জনই

যেন প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে গুমরিয়ে উঠছে। কাঁপছে, কুঁচকাচ্ছে; মাথাটা হাঁটুর ভেতর সেঁধিয়ে দিতে চাচ্ছে। অথচ রা পর্যন্ত করছে না। কি যে দুঃসহ এই জনান্তিকে লক্ষ্য করা! বিহ্বল করে ফেলে সমগ্র চেতনাকে। নিরুপায় বিহ্বল।

এতক্ষণে ঘেমে উঠেছি আমি।

আরো, আরো কতকাল সে অমনি নিঃশব্দে গুমরাতে থাকবে!

মেয়েটা সেখানে থাকতে পারলো না আর। বেদনা এখন সারা দেহে সংক্রমিত হয়ে পেশীগুলো উৎক্ষিপ্ত করছে। অবশেষে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে পায়খানার ভেতর চলে গেল, নিজেকে প্রাণান্ত চেষ্টায় ছ্যাচড়িয়ে টানতে টানতে।

এবার লোকটা নিশ্চয়ই চিৎকার করে উঠবে? বুক ফাটিয়ে দেবে চৌচির করে, নয়তো দুহাতে ওকে চেপে ধরবে যেয়ে উচ্ছৃঙ্খলের মতো। কিন্তু সে কিছুই করলো না। আরো শক্ত হয়ে বসে রইল নিজের জায়গাটাতেই।

এ অবস্থায় কি করা যায় ভেবেই পেলাম না, কি সাহায্য করা যেতে পারে ধারণাতেই আসলো না। লোকটা কি সংজ্ঞালুপ্ত হয়েছে? বজ্রাহত মানুষ যেমন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, একটু স্পর্শ পেলেই হুড়মুড়িয়ে পড়ে যায় মাটিতে, এও তেমনি,—স্থির হয়ে আছে, একটু স্পর্শ পেলেই ভেঙে পড়বে কি?

ভেবেছিলাম সমবেদনা জানাব,—চুপ করে গেলাম।

ভেবেছিলাম নানা রকম গল্প করে মনটা সরিয়ে নেব তার গাঢ় উদ্বিগ্নতা থেকে,—গলা দিয়ে কথাই বেরুল না।

মনে হলো আমারও পিপাসা ভীষণ!

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। আর একটা স্টেশনের পরেই ঘাট। যমুনা বিধৌত বাহাদুরাবাদ। ঘাটেই নামতে হবে আমাকে। বাড়ি সেখানেই তো। ইতিমধ্যে এই কামরার অধিকাংশ যাত্রীরাই নেমে গেছে। গুটি কয়েক যারা ছিলাম, খুব সম্ভব আমি বাদে সকলেই নদী পার হয়ে যাবে। এখন জেগে উঠছে। আয়েশের হাই তুললো কেউ কেউ জোরে জোরে। অস্ফুটকণ্ঠে দু-একটা ঠুনকো কথাও বললো আলগোছে। সেই প্রসব-বেদনা-কাতর দীর্ণপ্রাণ মহিলাটির গোঙানির আওয়াজও শোনা যাচ্ছে নাকি? এতক্ষণে জাগছে সব শ্লথ-ভাবে। এখন কেমন করছে সে পায়খানা ঘরটার ভেতর? বিছানাপত্তর বাঁধতে লাগলো অনেকে। বন্ধ জানালাগুলো নামিয়ে

দিলো। বাইরের আবছা আলোয় লাইটের দগদগে লাল মুখটা নিষ্প্রভ হয়ে গেলো। নিষ্প্রভ মুখ। সকালের হাওয়ায় অনেকটা চাঙ্গা হয়ে উঠলাম, লোকটাও এবারে কিছু জোর পাবে মনে হয়তো।

অনেক সংকোচ কাটিয়েই দমকা হাওয়ার মতো হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলাম, একবার দেখা যায় না, তাঁর কি হলো · ·· উচিত······

কিন্তু এ কথা শোনামাত্রই এক অকস্মাৎ লজ্জায় লোকটা এমনই বিমূঢ় হয়ে গেল যে, মনে হলো, তার সমস্ত শরীরটাই আগুনের হলকার মতো জ্বলে উঠেছে, শিরা উপশিরা দপ্‌ দপ্‌ করছে। স্পষ্ট দেখতে পেলাম তার ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপছে। বুড়ো মানুষেব এমন করে ঠোঁট কাঁপতে আর কখনও দেখি নি আমি। অন্ততঃ এই চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতায় যতদূর জানি—এই বয়সের মানুষ সাধারণত ভেতরের দুর্বলতাটা কিছুতেই জানাতে চায় না। কিন্তু লোকটা সংযম হারাচ্ছে।

এতো লজ্জা আর সংকোচই বা কিসের বুঝতেই পারলাম না।

কিছু জিজ্ঞেস করে যে উত্তর পাবো, লোকটা তেমন অবস্থায় আছে—তাও মনে হলো না।

প্রায় এক ঘণ্টারও ওপরে হয়ে গেল মেয়েটা সেই যে পায়খানার ভেতরে ঢুকেছে, কি যে হলো তার। এই লোকটার মতোই আমার নিজেরও চুপ করে থাকা ছাড়া কি উপায় আছে। ব্যাপারটা আমার আওতার বাইরে বলেই হয়তো, হয়তো এমন নিষ্ক্রিয়তা অসহ্য ঠেকছিল সে জন্যেই, এক অদ্ভুত উষ্মায় মনটা ছাড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছিল বার বার।

যা হচ্ছে, মোটেই কাম্য নয়। এখুনি কিছু করতে হবে।

কিন্তু লোকটাকেই তাড়া দেব, না আমি নিজে কিছু করব ; ব্যাপারটা আদতে কেন এমন হচ্ছে, তাই জিজ্ঞেস করব, না অভিসম্পাত দেব বুড়োকে —কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। দপ্‌ দপ্‌ করতে থাকলো রগগুলো। অবশেষে আরো স্তব্ধ হয়ে যেয়ে অস্বস্তিকে শান্ত করতে চাইলাম।

কান পেতে রইলাম আকাঙ্ক্ষায় উৎকীর্ণ হয়ে—হয়তো নবজাত শিশুর কোমল কান্নায় এই ভয়াবহ ফসিলের মতো স্তব্ধতা এক আর্ত নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ, তীব্র প্রতিবাদে ডুমড়িয়ে যাবে এই স্থবিরতা। এই প্রাণান্তকর গাম্ভীর্যের অবসান হবে নবজাত সৃষ্টির কলকণ্ঠে। তাই হোক, তাই হোক।

কিন্তু কিছুই হলো না।

দাতে দাঁত চেপে ফিরে তাকালাম লোকটার দিকে। এই শীতেও আমার কপালে জমে উঠেছে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। ঘৃণায়, বিরক্তিতে কাঁপছে ঘাড়ের রগ! কঠিন দৃষ্টিটি ফেরালাম উদ্ধত করে; কিন্তু সে শীর্ণ প্রৌঢ় মুখে তখন গড়িয়ে পড়ছে পানি, কোঠরাগত চোখ বেয়ে বেয়ে।

অবশেষে এক ভারী নিঃশ্বাস ফেলে বুকটাকে শূন্য করতে চাইলাম।

ইতিমধ্যে ঘাটে এসে ঢুকলো ট্রেন। দুপাশে সার দেয়া কুলির ভেতরে থামলো অবশেষে। যাত্রীরা সব হুড়মুড়িয়ে নামতে লাগলো। এতক্ষণের স্তব্ধ-মানুষগুলো সহসা নতুন এক বেগ পেয়ে ছটফটিয়ে অসম্ভব ধৈর্যহীনতায় চারদিকে ভাঙতে থাকলো। এও এক নতুন বিসর্জনের গর্জন যেন। এ স্তব্ধতার আওয়াজ আছে, আরো ভয়ংকর। আবছা অন্ধকারে মানুষগুলো আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে লাগলো। কামরায় কেউ রইলো না আর। মনে করলাম লোকটা এবারে উঠবে। কিন্তু সে নড়লোও না।

আমিও দাঁড়াতে পারছিলাম না কেন, জানি নে।

ঘুমকাতুরে ছোটমেয়েটা যাত্রীদের দাপাদাপিতে জেগে উঠেছিল। চোখ মুছলো, হাই তুললো। তারপর আশে পাশে কোথাও কাকীমাকে না দেখে উদ্বিগ্ন হতে থাকলো। অস্ফুট চীৎকার করে উঠলো, কাকী, কাকীমাগো। বুড়ো লোকটার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে সে চীৎকার করলো। কিন্তু সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করতে পারলো না কিছুই। দুর্বোধ্য লোকটা তেমনি রইল যেমন ছিল, স্তব্ধ, নিথর, নিষ্প্রাণ।

সেখান থেকে কোন উত্তর আসবে না জেনে আমিই চেঁচিয়ে উঠলাম প্রাণ-পণে। কিন্তু পরক্ষণেই টের পেলাম গলা থেকে আওয়াজই বেরুচ্ছে না এতটুকু, শুধু হাতটা নেড়ে নেড়ে ইশারা করছি মেয়েটাকে। তারপর শব্দ যখন বেরিয়ে আসলো নিজের কাছেই কেমন বেসুরো ঠেকল, ওই পায়খানাটায় দেখ, খুলে দেখ······শিগগির······ওই, ওই খান ····

মেয়েটা হতভম্বের মতো দেখলো আমাকে। ছুটে গেলো সেদিকে। দরজা খুলল। তড়িৎপৃষ্টের মতো দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ভেতরে বিকট চীৎকার করে, কাকীমাগো! অনবরত সে চীৎকার করতে

লাগলো। জেঠা মশাই গো,……আমনা গো……কি হলো গো,……কাকী…

ভয়ে আমি দাঁড়িয়ে পড়েছি। সমস্ত লোম সোজা হয়ে উঠেছে। শির শির করছে।

লোকটার দিকে তাকালাম, সে আরো স্থির হয়ে গেছে। এতক্ষণ নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ হচ্ছিল, বুক উঠছিল নামছিল—এখন তাও বন্ধ। তারপর পাগলের মতো দু'হাতে ঝাঁকাতে লাগলাম তাঁকে।

পিতৃস্থানীয় জেঠামশাই ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর অমন বীভৎস মৃতদেহ দেখবেন না, বুঝতে পারলাম এতক্ষণে। ছোট মেয়েটা কাঁদতেই থাকবে কুরে কুরে আমারও যে বলার কিছু নেই—তাও মনে হলো। আমরা তিনটি প্রাণীর উৎকণ্ঠা যে কি, কে বুঝবে। কে বুঝবে!

ভাবলাম একবার দেখি, অবস্থাটা কি। কিন্তু যে আজন্ম সংস্কার আর নিরুপায় বিহ্বলতা সেই প্রৌঢ় লোকটাকে অমন করে ফেলেছে তাই আমাকেও স্থবির করলো। অসহ্য নিষ্ক্রীয়তায় চোখদুটো বন্ধ হয়ে এলো। তীব্রতম আবেগের মুহূর্তেই মানুষ বুঝি এমন করে বন্ধ্যা হয়ে যায়।

চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেলো, সামনে নিরন্ধ্র অন্ধকার।

অন্ধকার, যেখানে স্পষ্ট একটি নারীদেহ ভেসে উঠেছে। রক্তাক্ত দেহ, মুখ হাঁ হয়ে আছে। পেট অত্যন্ত উঁচু। চোখ উল্টে গেছে বিকৃত হয়ে অসম্ভব বেদনাকে সহ্য করার অস্বাভাবিক চেষ্টায়। একটি মা। একটি মাতৃত্ব আকাঙ্ক্ষী নারী, জীবনের জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুঝেছে! তার ফুলে-ওঠা পেটের ভেতর আছে একটি শিশু, একটু আগেও জীবিত ছিল যে। জন্মাতে পারলে অনেক কিছুই হয়তো করতে পারতো, সুখী আগামী পৃথিবীর বুকে শ্বাস টানতে পারতো অন্ততঃ। এ জন্মকে রুখলো কে?

তখনি কি এক যন্ত্রণায় সারা বুকটা কুঁকড়িয়ে উঠলো আমার। আর কি ঘৃণা। ধ্বংসের জন্যে ঘৃণা। অসহ্য।

প্রৌঢ় লোকটার মুখ আমি মনে করতে পারিনে আর; কিন্তু তার স্তব্ধতাটি এখনও আমার বুকের ভেতর জড়িয়ে আছে।

এপার থেকে ওপার

সুচরিত চৌধুরী

চোখ ধাঁধানো দিগন্ত মাঠের ওপারে ভ্যাপসা আকাশটা থমকে আছে। তার নিচে পোড়ো পোড়ো ভিটে ঘর,—মজা খাল। পোড়ো পোড়ো মানুষের ছায়ারা যেন তাদের ভাঙা ফুসফুসটাকে নিঃশ্বাসে সঞ্জীবিত করবার জন্যে পোকার মতো কিলবিল করছে। এপার থেকে ওপারের ওই শুকনো ঝলসানো বুকটা দেখলে মন কাঁদায়, বুক ভাসায় আর চোখ জ্বালায়।

কিন্তু একদিন ওপার থেকে ভেসে আসত রাখালিয়া বাঁশীর মিঠে সুর। ক্ষেতে ক্ষেতে ছিল প্রাণসজীব শাকসব্জীর ইশারা, ধানশীষের ঢেউ। পথ চলতে চলতে লাজ শরমে রাঙিয়ে উঠত কলসী কাঁখে নেওয়া বৌ-কন্যারা। ঢেঁকিশালে ছিল ধানভানার রাত। ভিটে ঘরের দাওয়ায় বসে তাগড়া মরদ জোয়ানরা হল্লা করে গাইত বারমাস্যা, মলুয়া সুন্দরীর কাহিনী, ধান তোলার গান। হঠাৎ পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ এসে সমস্তই তচ্ নচ্ করে দিয়ে গেল। ফসলভরা মাঠটায় জ্বলে উঠল আগুন। লাঙল-জোয়াল পড়ে রইল দাওয়ায়। বেচাকেনার হাটে ঘনিয়ে এল দুর্যোগ। এক মুঠো ভাতের জন্যে ভিটে বাড়ী, ঘটি বাটি, সর্বস্ব খুইয়ে শেষকালে প্রাণটুকু কান্নায় কান্নায় মিশে গেল হাওয়ায়। সে কি কান্নার বৃষ্টি! শ্রাবণ বৃষ্টিকেও যেন হার মানায়। বিন্দু বিন্দু, তির্যক। প্রতিটি বিন্দু যেন এক একটি শব্দের ইতিহাস ' ভাত, ভাত, ভাত। রাখালিয়া তার বাঁশীটি বুকে জাপটে ধরে পেটের জ্বালায় কুকড়ে মরল পথে, কাঁখের কলসীর সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়ল বৌ-কন্যাদের উপচে পড়া যৌবন, মরদ জোয়ানদের গান হয়ে গেল স্তব্ধ। যে দিকে তাকাও সেদিকেই মৃতের পাহাড়। অনেক মরল, অনেকে বেঁচে রইল আবার অনেকে শহরমুখো ভুখ মিছিলের পায়ে পা মিলাল। যারা মরছে তাদের কান্নার ইতিহাস, আর যারা বেঁচে রয়েছে তাদের বেঁচে থাকবার শেষ প্রচেষ্টা—এই সব মিলে মিশে এক অদ্ভুত সুরের বন্যা বয়ে চলল দিক থেকে দিগন্তরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, মাঠ থেকে মাঠে—প্রত্যেকটি দুর্ভিক্ষ পীড়িত পোড়া পোড়া মানুষের বুকের খনিতে,—ওপার থেকে এপারে।

স্রোত, ঢেউ, কম্পন। তারপর দুর্ভিক্ষ শেষ, যুদ্ধ শেষ। সবাই ভাবল, এবার বাঁচব—ক্ষেত, ভিটে-ঘর আর বৌ-কন্যাদের নিয়ে সংসার পাতব, আকাশ দিগন্তে সূর্যের লুকোচুরি দেখব। কিন্তু কিছুই মিলল না, মিলল শুধু হতাশা আর হৃদয় নিংড়ানো ব্যথা।

দিন যায়, রাত্রি আসে। পোড়া পোড়া মানুষগুলোর চোখ তবু সবুজ স্বপ্নে রাত্রি জাগর। ধুঁকতে ধুঁকতে কুকুরের মতো জন্ম দেয় নবজাতকদের, পোকার মতো কিল্‌বিল্ করতে থাকে ওরা। এপার থেকে ওপার, গ্রামকে গ্রাম নাকি বদলে গিয়েছে। একদিন ওরা কান সজাগ করে শুনল, যুদ্ধের সময় যে সব সাদা চামড়ার লোকগুলো এখানে টহল দিয়ে বেড়াত—ওরাই নাকি এখানের আকাশ বাতাস বিষিয়ে তুলছে। সুতরাং তাড়াও ওদের—ওরা চলে গেল। তারপর নিজেদের মধ্যে দাঙ্গা—ভাগাভাগিতে মীমাংসা। গগনঠাকুর, ধীরু কোবর্ত, নোটন চাষী তাদের দুর্ভিক্ষ পীড়িত ধুকধুকে প্রাণটি নিয়ে চলে গেল। দূর বহুদূর, মাঠ ক্ষেত পেরিয়ে—সেখানে নাকি তাদের ভাগের দেশ। মুখ চাওয়া চাওয়ি করল সবাই। ওপারের পোকাদের ভিড় কমল। তবু সেখানকার ভ্যাপসা আকাশে সূর্য উঠলো না, পোড়ো পোড়ো ভিটে ঘরে আলো জ্বলল না। কুকুরের মতো দিন দিন বাড়তে লাগল নবজাতক শিশুরা। একদিন এরা জানবে এদের বাপ মাদের কান্নার ইতিহাস, কবিয়ালদের মুখে মুখে শুনবে দুর্ভিক্ষের কাহিনী। তারপর হয়ত জীবনের আসল সত্যের সন্ধান পেয়ে ভ্যাপসা আকাশটা মেঘমুক্ত করে তুলবে। হয়ত আবার ওপার থেকে ভেসে আসবে রাখালিয়া বাঁশীর মিঠে সুর, পথ চলতে চলতে বাঙা হয়ে উঠবে কলসী কাঁখে বৌ-কন্যারা, মরদ জোয়ানরা গাইবে বারমাস্যা, মলুয়া সুন্দরীর কাহিনী আর ধান তোলার গান। এপার থেকে ওপারের প্রাণ সজীবতা দেখে তখন আনন্দে মন কাঁদাবে বুক ভাসাবে, চোখ ধাঁধাবে।

এপারে শহর ওপারে গ্রাম। এপারে হঠাৎ ঝলসে উঠা চোখ, ওপারে পোড়ো পোড়ো চোখ। এপার আর ওপারের সবগুলি চোখ একই আকাশকে চেয়ে চেয়ে দেখছে।

ওপারের ওই দৌলত মাঝির মেয়ে আমিনা। ভরা কলসীর মতো উপচে পড়ে দেহের যৌবন, নোংরা ছেঁড়া শাড়ীর মধ্য দিয়ে উঁকি মারে ওর পাকা আতার মতো দু'টি বুক। তেলহীন রুক্ষ চুলগুলি আষাঢ়িয়া মেঘের মতো বাতাসে ওড়ে। দৌলত মাঝি দাওয়ায় বসে মেয়েটার দিকে চেয়ে শুধু

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। সাজ নাই, পোশাক নাই রাজ-কন্যার রূপ। ওর মাও ছিল ঠিক অমনটি, একরাশ কালো চুলের অরণ্য নিয়ে যখন সামনে এসে দাঁড়াত তখন জুড়িয়ে যেত দু'চোখ। সাদা সাদা কতকগুলি ভাতের জন্যে মরে গেল সে। কোলের একরত্তি মেয়েটা বেঁচে রইল ধুঁকতে ধুঁকতে। উঃ, কি ভীষণ যন্ত্রণা। ভুলতে পারবে না দৌলত মাঝি। মেয়েটাকে দেখলে চমকে চমকে জাবর কাটতে থাকে সে।

'আব্বা তুমি কি ভাবতাছ?'

'কই? কিচ্ছু না।'

গা ঝাড়া দিয়ে দৌলত মাঝি উপুড় হয়ে বসে দাওয়ায়।

'ক্ষেতে যাইবা না?

'হ হ।'

উঠে পড়ে দৌলত। ক্ষেতে যেতে হবে, দিন মজুরীর কাজ। ঢিলা চামড়ার শরীরটা দিয়ে তবু যে ক'দিন চলে হাড় খাটুনি খেটে যেতে হবে। না হলে উপোস দিয়ে মরতে হবে। একদিন সব ছিল—ক্ষেতে ক্ষেতে ধান, বিরিষ গরুর হাল, নিকানো দাওয়া, সে সব শুধু অতীতের স্মৃতি। এখন সর্বহারা, চোখে স্বপ্ন। লাঙল চালাতে চালাতে ভাবনা যতো বাড়ে মন ততো শুকনো মাটির ঢেলার মতো শক্ত হয়ে উঠে।

'পান্তাবাত খাইয়া যাবা না?'

'ও। হ।'

মাটির বর্তনের ভিজে চপচপে কয়েক মুঠো ভাত গোগ্রাসে গিলে লম্বা লম্বা পা ফেলে দৌলত এগিয়ে যায় দিগন্ত প্রসারিত মাঠের দিকে। আমিনা বাঁশের খুঁটি ধরে এক পলকে চেয়ে থাকে সেদিকে। আর ভাবে, আব্বা অতো ভাবে ক্যান্?

'কি লো কইন্যা, চান্পানা মুখখান অতো মেঘ মেঘ ক্যান্? ঝাঁকড়া কোকড়া চুলওয়ালা মহসীন কবিয়াল এসে সামনে দাঁড়ায়। কচি বয়েস, হলুদ ছোঁয়া গায়ের রং। এতটুকুন বয়েস থেকে মুখে মুখে গান বানিয়ে আসছে। কি সুন্দর সব গান। গাঁয়ের প্রত্যেকটি ছেলে বুড়ো ফ্যাল ফ্যাল করে শোনে।

আমিনা ফিক্ করে হেসে দেয়। ছোটবেলা থেকে এক সঙ্গে বড় হয়েছে, চামচিকের মতো এ বিলে ও বিলে ঘুরে বেড়িয়েছে, পেটের খিদেয় এক সঙ্গে কেঁদেছে।

'বিজলীও য্যান্ চমকাইতাছে।'

আমিনার মুখ রাঙা হয়ে ওঠে।

'তুর লাইগ্যা একখান্ চিজ্ আন্ছি আমিনা।' কাগজে মোড়ানো একটি বোতল দেখায় মহসীন।

আমিনা তার মিছরির দানার মতো না সাজানো দাঁত বের করে শুধোয়, 'কি?'

'তুই ক দিখিন।'

'আলু।'

'ধেৎ। তুই একখান্ আস্ত পাগলী। তেল, তেল—খশবু তেল।'

'খশবু তেল?' আমিনার চোখে বিস্ময়।

'হ। তুর মেঘের মতন চুল ছাইপ্যা খশবু ছড়াইবো আসমান থাইক্যা আসমানে ফুল থাইক্যা ফুলে।'

আমিনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে। খপ্ করে মহসীনের হাত থেকে কাগজ মোড়ানো বোতলটা নিয়ে দৌড়ে পালায় ঘরের ভেতর। মহসীন চিৎকার দিয়ে হেসে ওঠে। তারপর দাওয়ায় বসে গুন্ গুন্ করে গানের কলি ভাঁজে:

কইন্যা তোর আলুথালু কেশে আমি
ঝড়ের হাওয়া দেখি
ও ঝড় ভাইংগা চান্ সুরুযের
দেখুম্ ঝিকিমিকি।

আমিনা ভেতর থেকে খিল্‌খিল্ করে হেসে ওঠে। মহসীন তার ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলো দোলাতে দোলাতে আর সুর তোলে:

চাঁপা বরণ রংরে কই
পদ্মকলির মুখ
ওই মুখেতে আছে কইন্যার
ভাংগা বুকের দুখ।
কইন্যা আমার আক্ষি তুইল্যা
আড়ে ঠাড়ে চায়
মরা মানুষ দেইখ্যা কইন্যা
ভয়েতে চমকায়।

মহসীন চোখ বন্ধ করে গেয়ে চলে। আমিনা সামনে এসে দাঁড়ায় কালো

কেশে খশবু তেল ছাপিয়ে ওঠে, চান্‌পানা মুখটি আকাশ চন্দ্রিমার মতো উজ্জল, উপোস দেওয়া শরীরের ভাঁজে ভাঁজে যেন মরাগাঙের মতো দু'কূল ছাপানো বন্যা।

কইন্যা আমার ভাতের লাইগ্যা
বুক কুড়য়িা মরে
রসের যৌবন নিল ঝাপটায়
আষাঢিয়া ঝড়ে।

ফুলেল তেলের খশবু পেয়ে মহসীন চোখ খুলে তাকায়। আমিনার ওই কালো কুচকুচে কেশ দেখে সে মুগ্ধ হয়ে যায়। আমিনা দাঁত বের করে হাসে বলে, 'বন্ধ করলা ক্যান? তারপর?'

মহসীন নীরব। তারপরের কাহিনী মর্মান্তিক, হাজার হাজার বৌ-কন্যাদের করুণ ইতিহাস।

'তারপরে কথাডি হুন্‌লে তোর চোখ থাইক্যা পানি ঝরব।'

'ঝরুক, ডর নাই।'

'না। সময অইলে গামু, এহন নয়।'

'কোন্ দিন?'

'যেদিন তোর কাঁচা বুকখন্ ভাইংগা যাইব।'

'ধেৎ। আমার বুক আবার ভাংগব ক্যান্?'

'ভাংগব, ভাংগব। ভাইংগ্যাই আছে, তুই টের পাস্ না।'

আমিনা অবাক হয়ে যায়। হসীন এত কথা শিখল কোত্থেকে? এতটুকুন বয়স থেকে সে তা'কে দেখে আসছে। মা নেই, বাপ নেই, মাথা গুঁজবার ভিটে-ঘরটি পর্যন্ত নেই। এ বিল থেকে ও বিলে, এ পথ থেকে ও পথে সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। খেয়েছে কি খায়নি সে খবর কেউ রাখে না। কেবল গান গায়, মুখে মুখে গান বানায়। গান শোনায়।

আমিনা তার ছেঁড়া শাড়ীটি দেহের সঙ্গে লেপটে ধরতে ধরতে জিজ্ঞেস করে, 'এতো কথা তুমি কোত্থাইকা শিখ্‌লা?'

ভ্যাপসা আকাশটার নিচে পোড়ো-পোড়ো ভিটে-ঘর ও মজা খালের দিকে আঙুল দেখিয়ে দেয় মহসীন।

বোকা বোকা দৃষ্টি মেলে আমিনা তাকায়, কিছুই সে বুঝল না।

'বুঝছস্ ?'

'না।'

মহসীনের মুখে ফ্যাকাশে হাসি। ভাবে, কচি কাঁচা মন ভেঙে একদিন বুঝবে। সেদিন আর চোখের তারায় এমনটি অজানার কুয়াশা থাকবে না, বিদ্যুৎ চমকাবে, ঝলসাবে।

আমিনা মহসীনের নিষ্পলক দু'চোখ দেখে দেখে জিজ্ঞেস করে, 'কি ভাবতাছ ?'

'তর কথা, আমার কথা, ' পোড়া পোড়া বিল্‌ডির কথা।'

হঠাৎ আমিনার জিজ্ঞাসা, ' াইচ্ছা আমার আব্বা কি ভাবে ?'

বিজ্ঞের মতো ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি দুলিয়ে মহসীন উত্তর দেয়, 'তর আম্মার কথা, লাঙ্গল জোয়ালের কথা, ঘরডির কথা।'

'আর আমার কথা ?'

'হ। তর কথাডিও ভাবে।'

আশ্চর্য মহসীন মনের কথাও বলতে পারে। তাকে বড্ড ভালো লাগল আমিনার। আরো ভালো লাগে ওর কথাগুলো।

মহসীন দাওয়া থেকে উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'চল্‌লাম। সারাডি রাইত গানে গানে কাটাইয়া দিছি, এহন ঘুমামু।'

'গান গাইছো ? কোন্‌হানে ?'

এপারের দিকে আঙুল নিক্ষেপ করে মহসীন বলল, 'ওই হান্‌ডায়। বিজ্‌লী বাতি আর হাওয়া গাড়ী যেহানে, হেই শহরডায়।'

আশ্চর্য চোখে আমিনা এপারের দিকে তাকায়। ভাবে, যদি পাখী হতো সে'—তবে উড়কা মেরে একবার শহরটার চাকচমক দেখে আসতো।

'আইচ্ছা, ওই হান্‌ডায় মাইয়া লোক কত গুলাইন্ ?'

দু'হাত প্রসারিত করল মহসীন।

'অগো সুবৎ কেমন ?'

চোখ বিস্ফারিত করল মহসীন।

'তোমার লগে কথা কইছে ?'

'হ।'

আমিনা গম্ভীর হয়ে গেল।

মহসীন হাসে।

তারপর পা বাড়িয়ে দেয় সে পথে। আমিনা দাওয়ায় খুঁটি ধরে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

চলতে চলতে মহসীন ভাবে অনেক কথা এপারের কথা, ওপারের কথা। শহরের কবি গানের জলসা বেশ জমেছিল। তার ওস্তাদজী করিম কবিয়াল পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন, বাঃ ব্যাটা। কি জমজমাট লোক। সকলেই ওর গানের তারিফ করেছিল। দুর্ভিক্ষের গান: হাজার হাজার নরনারীর ব্যথিত কাহিনী। এ গান গাইতে গাইতে তার সব সময়ে মনে পড়ে জলিল মাষ্টারের কথা। একদিন পোড়া মাঠটার ধারে শুনেছিল মহসীনের গলা, তারপর দোস্তর মতো অনেক কথা বলেছিল মহসীনের কানে কানে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঢেলে দিল চোখের তারায়। এর পর থেকে মহসীন গেয়ে চলল অদ্ভুত রকমের গান। তার ওস্তাদজী ভ্রূ কুঁচকাল, পরে বুকে টেনে নিল। গ্রাম থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল মহসীনের নাম। আগে সে মনে করতো ভদ্দর মিঞারা ওর গান শুনে মুখ ভেংচাবে, কিন্তু গত রাত্রির জলসা তাকে সে ধারণা থেকে মুক্তি দিয়েছে। জন কয়েক ভদ্র ছোকরা এসে তাকে আবেগে জড়িয়ে ধরেছিল। বলেছিল, আরো চাই আরো। অর্থাৎ কবিয়াল তুমি আরো কাহিনী সৃষ্টি করো, যে সব কাহিনী প্রত্যেকটি মানুষের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে। ভাবতে ভাবতে মহসীন এগিয়ে চলে। অনেক গান বানাবে, গাইবে। জলিল মাষ্টার, সেলাম তোমাকে সেলাম। যেখানেই তুমি থাকো—জেলে কিম্বা হাসপাতালের মৃত্যুশয্যায়, আমার শ্রদ্ধা তুমি নিয়ো। এই দিগন্ত পোড়ো পোড়ো মাঠ আর পোড়া মানুষদের পিঙ্গল চোখে যে আগুন ধিকধিকি জ্বলছে, সে আগুনের প্রত্যেকটি কণিকা হবে আমার কাহিনী। ভাবতে ভাবতে আবেগ মুখর হয়ে উঠে মহসীন। আমিনার কথাও তাকে ভাবিয়ে তোলে। কবুতরের মতো মেয়েটা যুদ্ধ দানবের আক্রমণে পর্যুদস্ত হাজার হাজার মেয়ের প্রতিনিধি। বুকের লজ্জা ঢাকবার জন্যে এক টুকরো কাপড় নেই, এক মুঠো ভাত নেই। চুলগুলো তেলের অভাবে রুক্ষ হয়ে গেছে, উকুনে বাসা বেঁধেছে। তবু ভালবাসবার কি আকুল ইচ্ছা। খশবু তেলের গন্ধ ছড়িয়ে মরদ জোয়ানদের স্বপ্নে দু'চোখে প্রতীক্ষা। বোকা বোকা মেয়েটা। উপোস দিয়ে দিয়ে বুকটা পাথর হয়ে গিয়েছে। জানে না, বোঝে না—কেন তারা উপোসে রাত

কাটায়! কেন তার কুচ্‌কুচে চুলগুলোয় তেল জোটেনা? দিন দিন আমিনার এই ভাবনা মহসীনকে ভাবায়, ওর বুকের বন্যা আমিনার পোড়া বুকে বয়ে যেতে চায়।

ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলে মহসীন।

দুপুরের ইস্পাত-গরম রোদ। খাঁ খাঁ করে ওঠে মাঠ, ক্ষেত, খাল, পথ আর প্রত্যেকটি মানুষের বুক। যুদ্ধ বিধ্বস্ত, দাংগা বিধ্বস্ত এই গ্রাম। চারদিকে চাপা হাওয়া, চাপা গোঙানী।

ছনের চালাঘরের খুপড়ি খুপড়ি ভিটে-ঘর, ঘাড় গোঁজা মানুষের জীবন। যেদিকে তাকাও সমস্ত মাঠ ক্ষেতের মালিক জমিদার ইউনুস মিঞা, বিরাট জায়গা জুড়ে তার খামার ঘর। মুঠো মুঠো ধান গিয়ে উঠে সেখানে। পোড়া পোড়া মানুষগুলো ঠিকরে পড়া চোখে সেদিকে তাকায়। জমিদার ইউনুস মিঞা শহরে থাকেন, এখানকার জায়গা জমি তদারক করেন এক বেঁটে খাটো লোক। নাকটা ছুঁচোলো, এক চোখ কানা নাম কাদের মিঞা। সবাই ডরায়, নেকড়ে বাঘকে কে না ডরায়?

'এই ব্যাডা হুন্।'

কাদের মিঞা মহসীনকে দূর থেকে ডাকে।

মহসীন সামনে এসে দাঁড়ায়।

'তুই রমজান আলীর পোলা না?'

'হ।'

'থাকস্ কই?

ভ্যাপসা আকাশটার দিকে তাকিয়ে পোড়া পোড়া ভিটে ঘরগুলির দিকে আঙুল নিক্ষেপ করল মহসীন। কাদের মিঞা পাখা বিস্তার করা ছাতাটি মাথা থেকে সরিয়ে সেদিকে তাকায়।

'কি কাম করতাছস্ এহন?'

'গান গাই।'

থুথু ফেলল কাদের মিঞা। ওর পাশে ইদ্রিস আলী ছাগলের মতো ডাক ছেড়ে হেসে উঠল। লোকটা যুদ্ধের বাজারে মেয়ে মানুষের বেসাতি করত। সব সময় কাদের মিঞার পেছন পেছনে লেগে থাকে। ধূর্ত শেয়ালের মতো চোখ। মা বোন বিচার নেই, যার দিকে চোখ পড়ে তাকেই বঁড়শিতে গেঁথে নেয়।

কাদের মিঞা ইদ্রিস আলীর দিকে তাকিয়ে বলে, 'সবুর, সবুর। তারপর মহসীনকে শুধোয়, 'কি গান করস্?'

'দুর্ভিক্ষের গান।'

'হেইডা কেমন?'

ইদ্রিস আলী ফোড়ন দেয়, 'যুদ্ধের বাজার ভাইংগ্যা দিলো আমাগো জীবন ওই সব।'

কাদের মিঞা চমকে উঠে।

'এ গুলাইন্ গাস্?'

'হ।'

'তবে রে,···বলেই ছাতাটা গুটিয়ে নিয়ে সেটা দিয়ে মহসীনের পিঠে সজোরে আঘাত করে। মহসীন চেঁচিয়ে উঠে, 'মারতাছেন ক্যান?' তারপর ফস্ করে কাদের মিঞার ছাতাটি সে বাগিয়ে ধরে।' ইদ্রিস আলী ঝাঁপিয়ে পড়ে মহসীনের ওপর। মাঠ ভেঙে ছুটে আসে ক্ষেত মজুররা। সবাই থমকে দাঁড়িয়ে থাকে। কিলের পর কিল্, লাথির পর লাথি। ইদ্রিস আলী আর কাদের মিঞা সমানে মহসীনকে ঠেঙিয়ে চলে।

মাথা যায় ফেটে, মুখ থেকে বেরোয় সাদা সাদা ফেনা, তারপর বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে মাটির ওপর।

ক্ষেত মজুররা ভিড় জমায়। ভিড়ের মধ্যে থেকে এক জোড়া চোখ ঝলসে উঠে,—সে চোখ বুড়ো দৌলত মাঝির।

'যা—যা ভাগ।'

সবাই মাঠে গিয়ে নামে।

কাদের মিঞা ও ইদ্রিস আলী হাঁফাতে হাঁফাতে খামার ঘরের দিকে পা বাড়ায়। যেতে যেতে বলে, 'খানকির বাইচ্যা। আবার যদি ও-গুলাইন গায় তো জানে খতম্ কইরা দিমু।'

ইদ্রিস আলী ফোড়ন যোগায়, 'কতো আগেই না আম্নারে কইছি, কানও দেন নাই। হক্কলডিই জলিল মাষ্টারের কাম। হেই ব্যাডা ইস্কুল ডারে কাফেরগা আড্ডা বানাইয়া গেছে, পর্জা গুলাইন্রে যা তা তালিম দিয়া গেছে।'

কাদের মিঞা গর্জে উঠে, 'আমি দেইখ্যা লমু। ওই ব্যাডা এহন জেইলে মরতাছে।'

'হাঁছা?'

'হ। শহরে গিয়া কি সব বে আইনী কাম করছে। আমাগো সরকার যেমন তেমন আদমী নয়, খান্‌কীর বাইচ্যারে ধইরা জেইল ভইরা দিছে।'

ইদ্রিস স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। ওই জলিল মাষ্টারটাকে তার বড্ড ভয় লাগত। চোখগুলি কেমন জানি আগুনের মতো ছিল ওর। যাক্‌ ভালোই হয়েছে, আপদ বিদেয় হয়েছে।

'চলেন হুজুর ইস্কুলডারে একবার চাক্‌ মাইরা যাই!'

'যাইতে হইব না। সব ঠিক আছে। নতুন মাষ্টার আমদানী করছি, সেই ব্যাভা কুত্তার মতন পা চাইট্যা থাকব, ডর নাই।'

'কিন্তুক হুজুর ওই শিক্ষিত গুলাইন্‌রে বিশ্বাস নাই।'

'গুলি মারো শিক্ষিত, টাকা দিলে হক্কলডিই বশ।'

ইদ্রিস আলী কিন্তু সে কথা মানতে চাইল না। জলিল মাষ্টারকেও তো টাকার লালচ দেখানো হয়েছিল, কিন্তু সে তো বশ মানেনি। সন্দিগ্ধ মন নিয়ে সে কাদের মিঞার পেছন পেছন পোষা কুকুরের মতো হেঁটে চলে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। তারপর রাত। হাজার তারার মিছিল।

ক্ষেত থেকে ফিরবার পথে ওরা সবাই মহসীনকে পথের ওপর খুঁজতে লাগল, নাম ধরে ডাকল কয়েকবার। তারপর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে বিস্ফারিত চোখে ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে দিল। দৌলত মাঝি এদিক ওদিক তাকিয়ে ওদের সঙ্গে হেঁটে চলে কি যেন সে হারিয়ে ফেলেছে।

ওরা। ক্ষেত মজুররা। ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলতে বলতে চলল:

'রাতের দিনের গান গায় তো কি হইছে?'

'হের লাইগ্যা মারবা ক্যান্‌?'

'রমজান চাষার ঘর খাইলা, বৌ খাইলা আবার পোলাডিরেও ধইরা মারলা কুত্তার মতন। এতো জুলুম সওন্‌ যায় না।'

দৌলত কিছুই বলল না। মাথা নিচু করে সে এগিয়ে চলল।

বুকের ভেতরটায় হাজার হাজার ঝিঁঝি পোকার গোঙানী, মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা, সমস্ত শরীরটায় বিষ ফোড়ার মতো আগুন। দীঘির পাড়ে এসে হাঁফাতে থাকে মহসীন। পানির তেষ্টায় বুকটা ফেটে যাচ্ছে। হামাগুড়ি দিয়ে নামল পানিতে। আঁজলা ভরে পানি নেয়, কাঁপতে থাকে হাত দুটো। ঢোক গিলতে কষ্ট হয়। পানির ভেতর জ্বলে উঠে আকাশ তারার মিছিল। টলতে

টলতে পাড়ে এসে নরম ঘাসের ওপর মাথা এলিয়ে শুয়ে পড়ে সে। চোখ দুটো আকাশের দিকে নিবদ্ধ, ঝাঁকড়া, কোঁকড়া চুলগুলো মৃদুমন্দ বাতাসে দোলে। কি আশ্চর্য ওই আকাশ, কি আশ্চর্য এই বাতাস, কি আশ্চর্য ওই তারার মিছিল। মহসীনের মনে হল, ওই আকাশটার বুকে যেন হাজার হাজার অত্যাচারীতদের খুন কালো হয়ে জমাট বেঁধেছে, মনে হল এই মৃদুমন্দ বাতাস যেন সেই সব আহতদের চাপা গোঙানী, মনে হল ওই সব হাজার তারার মিছিল যেন হাজার হাজার মানুষের সংগ্রামোদ্যত মিছিল।

দিঘির পাড় ঘেঁষে একটা ছায়া নড়ে ওঠে। মেয়ে মেয়ে ছায়া। চুলগুলো রুক্ষ, কাঁধের ওপর আঁচলটুকু নড়ছে, মাথাটা একবার এদিকে একবার ওদিকে ঘুরছে, গলা থেকে বেরোচ্ছে একটি চাপা ডাক, 'মহসীন।'

'আমিনা', মহসীন যন্ত্রণাকাতর মাথাটা তুলে ডাক দেয়, 'এই তো আমি এহানে।'

আমিনা সন্ধানী চোখে রাত্রির অন্ধকার ছিঁড়ে মহসীনের সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসে। মহসীনের মাথাটা কোলে তুলে নেয়। তারপর কাঁপাস্বরে শুধোয়, 'জমিদারগো লোক গুলাইন নাহি তোমারে মাইরা ফেলাইছে?'

'দূর পাগলী, অতো সোজা কাম্ না।'

মহসীনের কণ্ঠে উপেক্ষার সুর।

'না, না। অরা তোমারে মাইরা ফেইল্‌বো।'

'ক্যান্?'

আমিনা নিরুত্তর। শুধু বলে, 'জানি না।'

'তোরে কইছে কে?'

'আব্বা।'

হেই বুঝি ছুইড্যা আইলি?'

আমিনা নীরব।

মহসীনের ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলোতে নরম এক আঙুল চালাতে থাকে আমিনা। ওর আঙুলগুলি খুনে খুনে চপচপে হয়ে যায়। আমিনা অস্ফুট শব্দ করে ওঠে, 'খুন, ইস্ তোমারে তো মাইরা ফেলাইছে।'

মহসীন দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণা দমাবার চেষ্টা করে। আমিনা হঠাৎ কোল থেকে মাথাটা সরিয়ে উঠে এক দৌড় দেয়।

'কই যাইতাছিস্? আমিনা, আমিনা।'

আমিনা বলতে বলতে ছুটতে থাকে, 'তোমার লাইগ্যা দাওয়াই লইয়া আছি।' অন্ধকার সমুদ্রে মিলিয়ে যায় মেয়েটা।

মহসীন ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে। কি বোকা মেয়েটা। খবর শুনেই বেপরদা ছুটে এসেছে। আসবে না? মহসীন যে তার ছেলেবেলার সঙ্গী, এক সঙ্গে ক্ষিধের জ্বালায় কেঁদে উঠেছে, ইউনিয়ন বোর্ডের লঙ্গরখানায় খিচুড়ী ভাগ করে খেয়েছে।

সহস্র বৃশ্চিকের কামড়ের মতো সমস্ত দেহের যন্ত্রণায় মহসীন কতক্ষণ নির্জীব হয়ে পড়েছিল সে জানে না, যখন সে চোখ খুলল দেখল তার মাথাটা কতকগুলো ঠাণ্ডা পাতায় মোড়ানো—তার উপর পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা কাপড়ের ন্যাকড়া। কোলের উপর মহসীনের মাথাটা আল্‌তোভাবে চেপে ধরে আমিনা চুপি চুপি শুধোয়, 'ক্যামন্ লাগতাছে?'

মহসীনের কণ্ঠে উত্তর নেই। চোখের দৃষ্টি ঘনায়িত, বিন্দু বিন্দু অশ্রুজল। হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'আমিনা তুই আমার লাইগ্যা এতো করছ ক্যান্?

'জানি না।'

ওর কোমল হাত দুটি শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে মহসীন বলে, 'তুই জানস কিন্তু ক'স্ না।'

আমিনা নীরব। টপ্‌ টপ্‌ করে পানি টপ্‌কে পড়ে মহসীনের কপালের ওপর।

'কাঁদতাছস্ ক্যান্ আমিনা?'

আমিনার কান্নার বাঁধ ভেঙে যায়। ডুক্‌রে ডুক্‌রে কেঁদে উঠে মেয়েটা। 'তুমি আমারে ছাইরা চইল্ল্যা যাইবা। আমি কি বুঝি না? হক্কলডিই বুঝি। দেশে দেশে গান গাইয়া নাম কিইন্যা তুমার মাথা ঘুইরা গ্যাছে। আমার কথা একটুকাইন্‌ও ভাবো না। খালি ভাবো ঐ পোড়া পোড়া বিল্‌ডার কথা, মানুষ গুলাইনের কথা।' হাওয়ায় হাওয়ায় ঘুরে বেড়ায় সেই কান্না মিশানো কথাগুলো।

মহসীন ভাবে, মেয়েটা কি বোকা! কিন্তু কি সরল! হাজার হাজার পোড়ো মানুষের কথা ভাবি—এখানে ওর অভিমান। কিন্তু ও জানে না ওকে নিয়ে শান্তিমুখর একটি স্বপ্ন দেখে মহসীন।

বিস্ফারিত বুকটা দেখিয়ে মহসীন বলে, 'এই বুক্‌ডা দেখ্‌তাছস্?'

'হ।'

'বুকডায় তলে একটা পরাণ ধুক্ ধুক্ করতাছে না ?'

'হ।'

'হেই পরাণডা যদি না রয় তাইলে বুকডা রইব কোনহানে ?'

আমিনা অবাক হয়ে যায়। বোকা বোকা দৃষ্টি মেলে শুধু বলে, 'কোনহানে থাকব না, ভাইংগ্যা যাইব।

'তুই হইলি আমার বুক, ওই পোড়া পোড়া বিলখান্ আর মানুষ গুলাইন হইল আমার পরাণ। তার লাইগ্যাই তো অগো কথা ভাবি।'

আমিনা মুগ্ধ হয়ে যায়, কি সুন্দর কথা।

'পরাণডা উইড়া গেলে বুকটা ফাইংগ্যা যাইব, তেমন আমাগো এই পোড়া পোড়া বিল্‌ডা আর মানুষ গুলাইন যদি এক্কেরে মইরা যায় তাইলে তুইও তো ভাইংগ্যা যাইবি।'

'হ।'

'তাইলে ?'

'পরাণডারে বাঁচাইতে হইব।'

'হ। হ। তুই হক্কলডিই বুঝস, কিছুক বুঝস না বুইলা ভান করচ খালি।'

আমিনা আত্মসন্তুষ্টি পায়। মহসীনের মাথাটা বুকের কাছে চেপে ধরে। মহসীনের চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসে যন্ত্রণা মেশানো আবেগে।

আকাশে তখন হাজার তারার চোখ, অন্ধকারের ঢেউ, চামরদোলা বাতাস।

মশালের আলো দেখে ওরা চমকে উঠে। আমিনা কোল থেকে মহসীনের মাথাটা সারিয়ে উঠে দাঁড়ায় ভীত চকিতা হরিণীর মতো, মশাল হাতে দৌলত মাঝিকে দেখে, তারপর সে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলে, 'আব্বা' ?

দৌলত মাঝি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, 'পাইছস্ ? কই ?'

মহসীনের শায়িত শরীরটার দিকে আমিনা আঙুল দেখায়। দৌলত মাঝি মশালের আলোয় মহসীনের চেহারাটা দেখে আঁৎকে ওঠে।

'ইস্ এক্কেরে মাইরা ফেলাইছে।'

তারপর আমিনার দিকে চেয়ে বলল দৌলত, 'ধর্ ধর্, ঘরে লইয়া চল্। এহানে থোয়া খাইয়া মইরা যাইব।'

মেয়ে বাপেতে মিলে ওরা ধরাধরি করে নিয়ে এল মহসীনকে। এনে ছেঁড়া কাঁথার বিছানা করে দিল দাওয়ায়। ঘর নেই, বাড়ি নেই, মা নেই, বাপ নেই এমন ছেলেকে এ অবস্থায় বাইরে থাকতে দেখলে কার না প্রাণ কাঁদে। দৌলত ভাবে, তা' ছাড়া দিল বলে তা একটা জিনিস আছে। ভাত নেই, কাপড় নেই—কিন্তু সেটা থাকতে দোষ কি?

মহসীন সারারাত ছটফট করে কাটাল। সকালে উঠে চলে যেতে চেয়েছিল কিন্তু দৌলত যেতে দেয়নি। আমিনা এসে জোর করে তাকে শুইয়ে দিল বিছানার ওপর। খড়কুটো কুড়িয়ে এনে জেলে গরম পানির সেঁক দিতে লাগল মাথার ক্ষতস্থানে। তারপর হাঁড়ি উজাড় করে কয়েক মুঠো চাল সিদ্ধ করে খেল দুজনে মিলে। দৌলত সকালে উঠে ক্ষেতে চলে যায়, রাত্রে আসে হাঁপাতে হাঁপাতে। মজুরী যা পায়, সংসার চলে না। তবু স্বপ্ন আছে ফসলের, স্মৃতি আছে অতীতের।

মহসীনের শিয়রে বসে বক্ বক্ করে চলে, আমিনাও বাঁশের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে।

'রমজানের ব্যাডা বুঝলিনি, হেইদিনের কথাডি মনে পড়লে বুকডা ফাইট্যা যায়। এই লম্বা লম্বা লাউয়ের ডগা, এই থোপা থোপা মরিচের ক্ষেত। আমিনার আম্মা যেহানে হাত দিছে, ওহানডা সোনা হইয়া গ্যাছে! এক কাণি জমিন্ আছিলো, গরু লইয়া লাঙ্গল চালাইছি তো চালাইছি, একেরে ধানকে ধানে ভইরা গ্যাছে। ওই জমিন্ গুলাইন্ এহন জমিদারগো হাতে। হেইদিন লাঙ্গল চালাতে গিয়া কতোই না কাঁদলাম, মাডি গুলাইন যেন্ কাঁইপ্যা উঠল। হক্কলাডই ভোজবাজি। বুঝলানি রমজানের ব্যাডা?'

মহসীন মাথা দোলায়, বুড়ো দৌলত আবার বকে যায়, 'তোরা তহন্ মাডির লগে কথা ক'স্। উরে বাপরে কি যে অবস্থা। চর্‌চর্ কইরা চাইলের দাম বাইড়্যা গেলো, কাপড়ের দাম বাইড়্যা গেলো। বাজারে কি যে সোরগোল। হক্কলাডর মুখে একই কথা: আমরা মইরা যামু, মইরা যামু। কথার লগে অমনে সিধু তাঁতির ঘরডা খাঁ খাঁ কইর্যা উঠল। হেই ব্যাডার জমিন নাই; ক্ষেত নাই—আছিল্ খাল ইন্দুরের বাইচ্যার মতন কতো গুলাইন পোলা। কাজ নাই, রোজগার নাই, একেরে মইরা গেল ভাত ভাত কইর্যা। আমার তবু টিইকা রইলাম জমিনের জোরে। কিন্তুক পারলাম না। এহানে ওহানে গিয়া যা কিছু পাইতাম তা দিয়া সংসার চলত। এক কাণি জমিনের ধানে কি আর দশ

এগারো জনের খোরাকী চলে? আব্বা আছিলো বুড়া মানুষ, আম্মা, তহন কবরে, আমার ভাইগো পরিবার, আমি ওর ওই আমিনার আম্মা। কি করমু, কি করমু? ভাই আইস্যা কইল, জমিন বেইচ্যা দাও, দিলাম বেইচ্যা। হাঁড়ি চড়লো চুলায়, তারপর চাল নাই। কি করমু তহন? গরুডা বেইচ্যা দাও—বুকডা ছাঁৎ কইর‍্যা উডল। গরুডা ত হাডে যাইবার চায় না। কি সুরতই ছিলো গরুডার। আমার ডাক হুইন্যা যহন তহন ছুইড্যা আইত মাইনষের লাহান। কত্তাইন্ তাল বাহানা কইর‍্যা অইডারে দিলাম বেইচ্যা। তারপর আবার চোখ আঁধার। বুড়া বাপডা রাইতের বেলায় মইর‍্যা গেল্, ফজরে উইড্যা দেহি—সারা শরীরে মাছিতে ভন্ ভন্ করতাছে। এমনি কইর‍্যা ভাই, ভাইয়ের জেনানা, পোলাগুলাইন্ গেল্ মইর‍্যা। সারা ঘরখান্ খাঁ খাঁ কইর‍্যা উডল। আমিনার আম্মাগো না খাইয়া না খাইয়া দড়ির মতন শুকাইয়া গেল্। বুঝলিনি রমজানের ব্যাডা, হেইদিনের কথাডি ভুলন্ যায় না। এ ঘর থাইক্যা ওঘরে, এ মাঠ থাইক্যা ওমাঠে- খালি মরণের কাঁন্দন্। কি কাঁন্দনরে বাপ্! কাইন্দা কাঁইন্দা কইলজ্যাডা ছিইড়া যায়, তবু কাঁন্দন থামে না। শেষে আর কাঁন্দনের পানিও নাই, মুখ থাইক্যা আওয়াজও বাহিরনা। জমিদার ইউনুস মিঞাগো অই খামার ঘরডি তহন কি সুন্দর ধানে ধানে ভরতি। একদিন হক্কলডি জোট বাইন্দ্যা গেলাম হেইহানে অহন মিঞা আমাগো লড়াইয়া ছুডল। তারপরে ঘুবঘুইট্যা রাইত্যা গোলার তলে যাইয়্যা ঢুকলাম, লুঙ্গীবস্তা ভইর‍্যা ধান লইয়া দে ছুট। আইলাম ঘরে। আমিনার আম্মাডারে যাওনের সময় দেখছিলাম ছডফড করতাছে. কিন্তু বেড়ি মুখ বুইল্যা কিছু কয় না। আমি ত বুঝি, আমিনা তহন এই একটু একটু ইন্দুর লাহ, কেবল ইঁদুরের বাইচ্যার মতন চ্যাঁ চ্যাঁ করত। ইউনুস মিয়াগো গোলার ধান চুরি কইর‍্যা আইন্যা আমার কি খুশী। আইজ ভাত খাইমু। কিন্তুক ঘরের ভিতর ঢুইক্যা হাত বাড়াইয়া দেহি আমিনার আম্মাডি একদম ঠাণ্ডা হইয়া গেছে, আমিনা তখন চ্যাঁ চ্যাঁ করতাছিল। বেকুব বইন্যা গেলাম, হাবাডি রাইত বইস্যা রইলাম অর পাশে। ফজরের সুরুয ঢুকল ঘরে। হেই সুরুযের সোনা সোনা রইদে দেখলাম আমিনার আম্মার চোখ দুইডা গেছে উইল্ট্যা। কিচ্ছু কইলাম না, কাঁন্দলাম না পর্যন্ত। বুগের ভেতরডা য্যান্ পাথর হইয়া গেল।'....

এই বলে দৌলত থামে। একটা চাপা কান্নার শব্দ শোনা যায়,

আমিনা কাঁদছিল। মহসীন পাথরের মতো নিথর। কতক্ষণ নিস্তব্ধতা। আমিনা ঘরের ভেতর গিয়ে ঢোকে। সেখানে গিয়ে ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠে।

দৌলত চুপি চুপি বলে ওঠে, 'বুঝলিনি রমজানের ব্যাডা, অর আম্মার কথা মনে পড়ছে। না?'

মহসীন নীরব, তার মুখ থেকে এর কোনো জবাব আসে না। দৌলত চুপসে যায়। রাত্রির গাঢ় অন্ধকার তখন কালো মেঘের মতো হাওয়ায় জটলা পাকাচ্ছিল। একটা তারা আকাশ থেকে ধনুক তীরের মতো ছুঁড়ে পড়ল দূরে বহুদূরে। মহসীনের চোখে ঘুম নেই। যুদ্ধের আক্রমণে হাজার হাজার মানুষের বিধ্বস্ত আত্মা যেন তার চোখের তারায় এসে ভিড় জমায়।

রাত্রি পেরিয়ে ভোর। জলন্ত সূর্যটাকে দেখায় অগ্নিপিণ্ডের মতো। তার বিচ্ছুরিত অগ্নিকণায় মাটি হয় তপ্ত, খালের পানি যায় শুকিয়ে, ধান শীষ পড়ে নুইয়ে। অথচ মানুষের মুখে মুখে সূর্যের স্তব আলোর সমুদ্রে স্নাত হবার জন্যে, জীবনকে রঙে রঙে ভরিয়ে তুলবার জন্যে। কিন্তু এ জলন্ত সূর্য সমস্ত মাঠ ঘাঠ, নদী পথ, মানুষের প্রত্যেকটি হৃদয় পুড়ে ছারখার করে দিয়ে যায়! কি নির্মম, কি নিষ্ঠুর। মানুষ ভাবে, এ সূর্য ওদের স্বপ্ন কামনা নয়। তাই ওর প্রতীক্ষায় থাকে নতুন আরেক সূর্যের।

মহসীনের মাথার ক্ষত দুদিনেই সেরে গেল। আমিনা এসে বাঁশের খুঁটি ধরে লতার মতো দাঁড়িয়ে শুধোয়, 'একডা কথা কমু?'

মহসীন আড়চোখে তাকায়। বলে, 'ক।'

'তুমি আইজ্ কাইল্ গান গাওনা ক্যান্?'

মহসীনের ঠোঁটে ফিকে হাসি 'গাই না বুঝি?'

'না।'

'তুই টের পাস্ না।'

আমিনা ক্ষেপে ওঠে। মহসীন ওকে নিশ্চয়ই বোকা বোকা মনে করে— এখানে তার অসহ্য। সেদিন রাত্রে আব্বার মুখে দুর্ভিক্ষের গল্প শুনে কতোই না সে কেঁদেছিল, ওই পোড়ো পোড়ো মাঠটার দিকে চেয়ে কতোই না দীর্ঘ নিঃশ্বাস তার বুক থেকে বেরোয়।

আমিনার থমথমে গলাটার দিকে চেয়ে মহসীন বলে, 'রাগ করছস্?'

আমিনা কথা বলে না, মুখ ফিরায় অন্যদিকে।

কতক্ষণ নীরবতা।

মহসীন হঠাৎ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলগুলো বাঁ হাতে সরাতে সরাতে গানের কলি ভাঁজে :

গোস্থায় কইন্যার আমের মতন
গাল্‌খান্ পাইক্যা ওডে,
চোখের থাইক্যা বিজ্‌লী চমকায়
এদিক ওদিক ছোডে।

আমিনা ফিক্ করে হাসে।

মহসীন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আবার সুর তুলে গায় :

কইন্যা আবার হাসে যেমন
ধরাল্ করা ছুরি,
কাইড্যা কুইড্যা মনে ঢুইক্যা
বুকখান্ করে চুরি।

আমিনা ঝট্ করে এসে মহসীনের পিঠে থাপ্পড় আঘাত দেয়। মহসীন খপ্ করে জড়িয়ে ধরে ওর দু'হাত। আমিনা কবুতরের মতো হাত সাপটায়। চুপি চুপি বলে, 'ছাইরা দাও'—

মহসীন চোখের বঁড়শী তুলে সুর ভেঁজে বলে,

ছাইরা দাওরে চেম্‌রা বঁধু
আমার মাথা খাও
চাইর দিগে হাওয়ার ঝাপটা
কুকিলার রাও।

আমিনার হাত অবশ। মহসীন ওকে বুকের কাছে টেনে নেয়। আবার কি ভেবে ওর হাত দুটো ছাড়িয়ে নেয়। বলে, 'গান হুন্‌বি ?'

আমিনা হরিণের মতো চোখ তুলে তাকায়।

'নয়া একখান্ গান বানাইছি, হুন্‌বি ?'

রাজহাঁসের মতো চিবুক উঁচু করে আমিনা শব্দ করে, 'হু।'

'কিন্তুক অই গান তর ভাল লাগব না।'

'খুব লাগব।'

'তাইলে হুন্'—

বাঁ হাত কানে লাগিয়ে মহসীন সুর তোলে :

নছিব হায় রে হায়—

ওরে গাছ বিরিক্ষ নদী নালা পুন্ন মাসীর চান্
তোম্‌গো বুকে লুকায়া আছে হাজার বুকের গান।
হাজার বুকের গানরে নছিব হায়রে নছিব হায়
হেঁাতের মতন ভাইস্যা চলে এই দুনিয়াডায়।

নছিব হায় রে হায়

ওরে আসমানের তারা ওরে আসমানের তারা
তোমার মতন জাইগ্যা রইছে মেডির মানুষেরা।
বিরিষ্টি আসে, বজ্জর আসে
আসে ঢেউয়ের ঝড়
হক্কলডিরে রুইখ্যা রুইখ্যা থুনে ঝর ঝর।

ওরে নছিব হায়—

দুনিয়ার ইনসাফেরে ভাই বুকখান্ ফাইড্যা যায়।
মানুষ হইল এগই নদী
সায়রের জলে
দুকূল গাঙে সোনা ফলায়
জানের বদলে।......

মহসীন একটানা গেয়ে চলে। আমিনা খরগোসের মতো কান সজাগ করে শোনে। কিছু বোঝেনা, অথচ এটুকু বোঝে মানুষ আকাশের তারার মতো ঝড় বাদলের আঘাতে আঘাতে প্রতিদিন ঝলমল করছে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। ঝিঁঝি পোকার গোঙানী, গাছ পালার মাথায় মাথায় রাত্রি তার কালো শামিয়ানা টানে। দৌলত হাঁফাতে হাঁফাতে ঘাড় নিচু করে ঘরে ফেরে, তারপর মহসীনের বাঁশীর মতো গলায় গানের সুর শুনে দাওয়ায় এসে নিস্তব্ধ হয়ে বসে।

মহসীন গেয়ে চলেছে, চোখ দুটি বন্ধ। আমিনা শোনে, দৌলতও নীরব শ্রোতার মতো বুকে হাঁটু জড়িয়ে শোনে।

নিস্তব্ধ রাত্রির সমুদ্র ভেঙে মহসীনের গানের কলি এক একটি ঢেউয়ের মতো কম্পন তুলতে লাগল চারিদিকে।

ঠিক এই সময়ে চারটি মানুষের ছায়া আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছিল দৌলত মাঝির দাওয়ার দিকে। এসে থামল, তারপর শব্দ করে উঠল দৌলত,

হৈই দৌলত।

মহসীনের গান থামে।

দৌলত বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিল, মহসীনের ধাক্কায় ধড়মড় করে উঠে চোখ দুটো বড় করে জিজ্ঞেস করল, 'কি ? কি ?'

ছায়া চারটি এসে উঠল দাওয়ায়। একটি মেয়ে, অন্য তিন জন পুরুষ। মেয়েটি কাঁদছিল।

আমিনা এসে মেয়েটিকে অন্ধকারে ভালো করে দেখল। তারপর বলে উঠল, 'আরে আমাগো সখিনা য্যান্। ক্যান্ আইছস্ ?' মেয়েটা আমিনার কাঁধে মাথা এলিয়ে দিয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

'থাম্! এই হারামজাদি থাম্ কইতাছি। ছায়ার ভেতর থেকে একজন ধমকে উঠল।

দৌলত অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে এদের দিকে। মহসীন জিজ্ঞেস করে 'আমিন চাচা না ?

'হ।'

'উডি কে ?

'মিঞাজান কালা মিঞা আর আমার মাইয়া সখিনা।

আমিন এইটুকু বলেই হাপাতে হাপাতে বসে পড়ে দাওয়ায়।

'কিয়ের লাইগ্যা আইছ চাচা ?'

আমিন নীরব। কথা বলল কালা মিঞা।

'অই সখিনাডারে বেহজ্জতি করছে।'

'ক্যাডা ?'

'কাদের মিঞা আর ইদ্রিস আলীডা'

এইটুকু বলেই কালা মিঞা থামল।

মহসীনের চোখ দুটো জ্বলে উঠে। ওই টুকুন মেয়ের ওপর বেইজ্জতি। উঠে দাঁড়ায় সে। মেয়েটা ডুকরে কাঁদছিল। মহসীন আবার শুধোয়, 'ব্যাপারডা খোল্‌সা কইর‍্যা কও দিখিন।'

কান্নার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা বলে চলল : সন্ধ্যার সময় নাকি পুকুর ঘাট থেকে ফেরবার সময় ইদ্রিস আলি তাকে দেখতে পায় এবং ফেউয়ের মতো পিছু নেয়। সখিনা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ভিটে ঘরে ঢুকে পড়ে। রাত্রে শোবার পর তার আর কিছু মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে, তার মুখ হাত

চেপে ধরে কে যেন তাকে কোলে তুলে নিয়ে পালাচ্ছিল। ওই দূর খামার ঘরটির ভেতরে তাকে নিয়ে যাওয়া হল। ওই কাদের মিঞা আর ইদ্রিস আলী—মেয়েটা দুই হাতে মুখ চেপে ধরল আর কিছুই বলতে পারল না সে।

মহসীনের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয় তপ্ত লাভা, মিঞাজান, কালামিঞা আমিন চাচা মুখ নিচু করে বসে আছে! দৌলত অবাক, আমিনা কম্পিত।

'তুই পালাইয়া আইলি ক্যামনে?'

'পলাইয়া আই নাই, অরা আমারে খেদাইয়া দিছে।'

মহসীন আবার জ্বলে উঠল। কি বদমাইশ! প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই লাথি। কি ভেবে হঠাৎ মহসীন শালগাছের মতো থমকে দাঁড়ায়। গলায় অদ্ভুত একটা স্বর তুলে বলে, 'আমিন চাচা তুমি এহন কি করবা?'

আমিন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, 'হের লাইগ্যাই তো তোগো কাছে আইছি।'

মিঞাজান ও কালামিঞা মাথা দোলায়।

পাড়ার হক্কলডি লোক এই খবর জানে?

'না। তবে হ্যাঁ, অই দিল্লু চোরার পোলাডা কি নাম জানি অর—হ হ জইল্যা চোরা, হেরে কইছি।

মহসীন জিজ্ঞেস করল, হে গ্যাছে কই?

'জানি না। খবরডা হুইন্যা মাত্র এক দৌড়।'

মহসীন হঠাৎ বলে ওঠে, 'চল চাচা।'

আমিন চোখ পাকায়, 'কই?'

'জমিদারগো খামার ঘরে।'

মিঞাজান ও কালামিঞা আঁৎকে উঠল। আমিন চাচাও চমকে উঠে বলে 'অগো কাছে যাইয়া কি হইব?'

'অনেক কিছু হইব?'

ওরা ইতস্তত করতে লাগল

মহসীন বলে, ডর নাই, অরা আমগো গিইল্যা ফেলাইব না। এদ্দিন চুপ কইর‍্যা ছিলাম বুইল্যাতো অরা আমাগো উপর জুলুম কইরা গ্যাছে।

মিঞাজান হাবার মতো বলে ওঠে, কিন্তুক অগো যে দোনাইল্যা বন্দুক আছে।

'কিছু হইব না। চল।'

ওরা নড়ল না একটুকুও।

মহসীন রেগে ওঠে। বলে, 'চাচা যাইবা না?'

'কিন্তুক।—

'কিন্তুক কি চাচা? তোমার মাইডারে বেইজ্জতি করছে, হেইডা তুমি ভুইল্যা গেলা?

মেয়েটা আবার কেঁদে উঠল।

আমিন হঠাৎ বলে উঠে, হ—হ—যামু। চল্।

মিঞাজান ও কালামিঞা একসঙ্গে শুধোয়, যাইয়াছ?

'হ। আয়। দৌলত যাইবা না?'

কোন সাড়া শব্দ নেই, দেখা গেল দৌলত আগেই দাওয়া থেকে নেমে গিয়েছে। আমিনা ও সখিনার দিকে চেয়ে আমিন বলল, ত'রা থাক এহানে।

তারপর সবাই ভারী ভারী পা ফেলে এগোয় সামনের দিকে।

পথে এসে মহসীন সবাইকে বলে, 'চল ঘরে ঘরে যাইয়া হক্কলডিরে লই।

আমিন নিঃশব্দে হাঁটতে হাঁটতে বলে, 'তর খুশী।'

মিঞাজান হাবার মতো সায় দেয়, 'কথাডা মন্দ নয়।'

এক একটি ভিটে ঘরের সামনে সবাই গিয়ে দাঁড়াল, আর একজন বেরিয়ে আসল, কেউ কেউ ভয়কুঞ্চিত চোখে ঘরের ভিতর পালাল। তারপর সবাই এগিয়ে চলল ভারী ভারী পায়ে।

দিঘির পথ ধরে ওরা এগিয়ে চলল। কতকগুলি ছায়া ছায়া মূর্তি। হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় অন্য কতকগুলি ছায়া দেখে।

কে?

সেই ছায়ার ভিড় থেকে শব্দ ভেসে আসে, আমিন চাচানি ও?

'হ।'

মহসীনরা এগোয়, ওদের মুখোমুখি দাঁড়ায়।

'আরে জইল্যা চোরা যে! কই যাইতাছস্? আমিনের চোখে বিস্ময়।

জলিল চোরা বলে, তোমরা কই যাইতাছ?

'জমিদার গো খামার ঘরে।'

'হাঁছা? আমরাও তো যাইতাছি।'

'ক্যান?'

'তোমার মাইয়াডার বেইজ্জতির বদলা লমু।

আশ্চর্য। সবাই থ বনে যায়। ছিঁচকে চোর, এখানে সেখানে চুরিচামারি করে পেট চালায়। কারো ঘরে আগুন লাগলে পর্যন্ত সেখান থেকে হাঁড়ি কুটো সরিয়ে নেয়। আর মুখে এই কথা!

মহসীন এগিয়ে আসে। জলিলের কাঁধ ছুঁয়ে বলে, চল্।

সবাই পা চালায়।

রাত্রি তখন মধ্য প্রহর।

রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে ওদের ভারী ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল অনেকটা ঢাকের আওয়াজের মতো। খামার ঘরের ভেতর কাদের মিঞা ও ইদ্রিস আলি চমকে উঠল, পাইক পেয়াদারাও খরগোসের মতো কান খাড়া করে দাঁড়াল।

'এত্তো আওয়াজ ক্যান্?'

ইদ্রিস পিট পিট করে তাকিয়ে উত্তর দেয়, হুজুর ডাকাইত।

'ডাকাইত?

'হ।'

'এই জব্বর আলী, এই শহর্‌ল্লুক। লইয়া যা আমার সোনালী বন্দুকডা লইয়া আয়।' কাদের মিঞার গলায় উত্তেজিত কণ্ঠস্বর।

পাইক বরকন্দাজরা এক মিনিটে হাজির। লাঠি, বর্শা, বন্দুক। ভারী ভারী পাগুলো আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে। কাদের মিঞা ও ইদ্রিসের চোখে শঙ্কিত দৃষ্টি।

'এক কদম পা বাড়াইব কি মারবি গুলি।'

'হ হুজুর।' বিরাট গণ্ডারের মতো চেহারার জব্বর আলী হুজুরকে সান্ত্বনা দেয়।

ওরা আস্তে আস্তে খামার ঘরের উঠানে এসে দাঁড়ায়। চারদিক শান্ত সমাহিত।

কাদের মিঞা জানালা দিয়ে চোখ মেলে তাকিয়ে বলে, ডাকাইত বুইল্যাতো মনে হইতাছে না।'

ইদ্রিস গলা বাড়ায়। 'হ। তাইতো মনে হইতাছে।'

সারি সারি লিকলিকে ছায়াগুলিকে আবছা আবছা দেখে আন্দাজে বলে উঠে ইদ্রিস 'এ তো আমাগো পাড়ার লোক গুলাইন য্যান্।'

'হ।'

সাহসে ভর করে কাদের মিঞা চিৎকার ছাড়ে, 'এই, তোরা কে?

ছায়ার মিছিলে একটা গুনগুনানি শব্দ উঠে।

জলিল হঠাৎ উঁচু গলায়ঃ প্রত্যুত্তর দেয়, 'আমরা আপনাগো পরজা হুজুর।'

প্রজা! তাই এতো ভয়। ইদ্রিস কিন্তু আৎকে ওঠে। কাদের মিঞার কানে কানে বলে, 'হুজুর কুমতলব আছে।'

'আরে দূর তর কুমতলব! বন্দুকের গুঁতায় শেষ কইর‍্যা দিমু, গুলি ছাড়নতো পরের কথা।'

কাদের মিঞা বেরিয়ে আসে কাছারী ঘরের বারান্দায়।

'এত্তো রাইতে ক্যান্ আইছস্?'

মহসীন উঠোনের মাঝখানে এসে বুক ফুলিয়ে বলল, ইনসাফের লাইগ্যা।'

কাদের মিঞার ভ্রূকুটি, 'কিয়ের ইনসাফ?'

'আমিন চাচার মাইয়া সখিনার বেইজ্জতির ইনসাফ।'

ইদ্রিস কাদের মিঞার গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। চুপি চুপি বলে, 'দেখছেন হুজুর! অরা ডাকাইত থ্যাইক্যা কম না।

কাদের মিঞার ঠোঁটে শ্লেষাত্মক হাসি, 'ইনসাফ। হাঃ হাঃ হাঃ। ইনসাফ। আইচ্ছা, খুব জবরদস্ত ইনসাফ করুম আমি। কিন্তু তোরা ক্যান আইছস্? সখিনার বাপঙ আইলেতো চলত, অরে লইয়া একডা ইনসাফ করতাম আমি।

মহসীনের নির্ভিক জবাব, 'আমিন চাচাও আইছে।'

'আইছে? কিন্তু এত্তো রাইতে কি ইনসাফ করুম। কাইল্ ফজরে আইছ।

ছায়ার মিছিল থেকে জলিল চিৎকার ছাড়ে, কাইল্ না আইজ। ইনসাফ ন কইর‍্যা আমরা এহান থাইক্যা সরুম না।

কাদের মিঞার চোখ জ্বলে উঠল' কি বেয়াদব ছোকরা। এই কেডা তুই? কার পোলা? আয় এদিকে আয়।'

জলিল বেরিয়ে আসে ভিড় থেকে। তারপর বলে, 'আইছি হুজুর আপনের সামনেই আইছি। অত্তো ধমক দিয়া কথা কন ক্যান্?'

'চুপ বেয়াদব। গর্জে ওঠে কাদের মিঞা।

'চুপ করুম ক্যান্? অতো চোখ রাঙ্গানি দেখান্ কারে? মাসের মইধ্যে তিনবার আমি জেলে যাই, আমার নাম জইল্যা চোরা—আমার চৌদ্দ-গুষ্টি আছিল চোর আর ডাকাইত। অত্তো চোখ রাঙ্গানিতে আমি ঠাণ্ডা হমুনা। ডর দেখাইয়া দেখাইয়া আমাগো হক্কসডিই লুইট্যা নিছেন, আর চলব না ওইসব কেরামতি।

সবাই স্তম্ভিত। কাদের মিঞা রাগে গোঙাতে লাগল বিলিতি কুকুরের মতো।

'এই চুপ।'

'চুপ কইর‍্যা কইর‍্যাইতো আছিলাম এদ্দিন্। এহন আর চুপ করুম না। শহরডায় গিয়া হক্কলডিই বুইঝ্যা ফেলাইছি আমি। আইজ আমিন চাচার মাইডোর বেইজ্জতি করছেন, কাইলু ডজন ডজন মানুষ মাইরা ফেলাইবেন—এ য্যান মেডির পুতুল পাইছেন। উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে জলিল, মহসীন এসে বাধা দেয়।

'ছাইরা দাও মহসীন ভাই, আমারে কথা কইতে দাও।' তারপর কাদের মিঞার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, ক্যান বেইজ্জতি করবেন? এত্তোটুকাইন মাইয়া। আপনের মাইয়াতো অর লাহান হইছে। ক্যান্? ক্যান্?

কাদের মিঞা পোড়া ইস্পাতের মতো লাল হয়ে ওঠে।

'ছোডলোকের বাইচ্যা, 'টুটি চিপটা ধরুম।'

'হ, আমরা ছোডলোকের ব্যাইচ্যা আর আপনে পীরজাদার ছাওয়াল। লাথি খাইয়া খাইয়া আমাগো বুকডা কালা হইয়া গ্যাছে তাই আমরা ছোডলোক আর আপনে কচি একখান মাইয়ার বেইজ্জতি কইর‍্যা পীরজাদা বইন্যা গ্যাছেন।

ছায়ার মিছিল স্তম্ভিত। দিল্লু চোরার পোলা বলে কি? সবই সত্যি কথা। এতো কথা সে কোত্থেকে শিখল?

'চুপ হারামজাদা।' কাদের মিঞা ফোঁস করে ওঠে।

'ক্যান?'

'এই জব্বর আলী মার গুলি, মার।'

গুড়ুম করে গুলি গর্জে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যে একটা হৈ চৈ পড়ে যায়। ছায়ার মিছিল মৌচাকে ঢিল পড়ার মত এলোমেলো। কেউ দৌড়ে

পালায়, কেউ সামনে এগোয়। কাদের মিঞা কাছারীঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে, ইদ্রিস অনেক আগেই উধাও। পাইক ও বরকন্দাজরা লাঠি উচিয়ে নেমে পড়ে উঠানে। খুনের দরিয়ায় উঠোনটা ভিজে চপচপে হয়ে যায়।

ছায়ার মিছিল উধাও। জলিলকে কাঁধে নিয়ে মহসীন টলতে টলতে দৌলত মাঝির দাওয়ায় এসে হাজির। আমিনা ও সখিনা দৌড়ে আসে, হাতে তেলের ঢিবে।

'আয় বাপ এত্তো খুন !!' ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর।

জলিলের বুকটা সম্পূর্ণ থেৎলে গেছে, একটা গুলি ঢুকে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। কাৎরাচ্ছে। হয়ত কিছুক্ষণ পর প্রাণটা উড়ে যাবে।

আমিন, মিঞাজান দৌলতমাঝি কালু মিঞা, শেখ করিম—পাড়ার অন্যান্য চাষী মজুররা এসে ভিড় জমায়। যারা পালিয়েছিল, তারাও এসেছে। সমস্ত গাঁ উজাড় করে লোক আসতে লাগল ব্যাপারটা জানবার জন্যে। খামার ঘরের বন্দুকের আওয়াজটা ইতিমধ্যে সকলকে জাগিয়ে তুলেছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে আসল এদিকে। ছেলে বড়ো জোয়ান সবাই এল। রাত্রি তখন শেষ প্রহর।

জলিল যেন বিড়বিড় করে কি বলে যাচ্ছে, সবাই কান পেতে শুনল।

ছাড়বা না। হারামজাদা কত্তো আর গুলি ছাড়ব। আমরা হক্কলডি খেইপ্পা গেলে অর ফসফসানি একদিনেই খালাস। না হয় দুই একজন মরুম, কিন্তুক হাজার জন তো বাঁইচ্যা যাইব। চুপ কইর‍্যা থাকলে তোমাগো কুত্তা বানাইয়া ছাড়ব।'

ঢেকুর তুলে তুলে জলিল বলছিল কথাগুলি। আবার বলতে লাগল, 'আমি হইলাম চোরের পোলা চোর। তোমরা ভাবতাছ এই ব্যাডা কয় কি। কিন্তুক ওই ওই বিলের ওপারে ওই শহরডা আছে না।'

সবাই তাকাল মাঠের এপারের দিকে।

ওই হানডায় যাইয়া আমি দেইখ্যা আইছি ওই কাদের মিঞাগো মতন লোকগুলাইনের লগে আমাগো মতন লোকের কি লড়াই!'

সবাই অবাক হয়ে যায়।

'হ, হ, চাচা। আগে মনে করতাম খোদায় আমাগো দেবাইল্যা বানাইছে, কিন্তুক এহন হে ভুল ভাইংগ্যা গেছে। কাদের মিঞাগো মতন লোকগুলানই আমাগো দেবাইল্যা বানাইছে। বিশ্বাস যদি না করো ওই শহরডায় গিয়া

দেইখ্যা আসো। আমাগো মতন লিকলিক্যা শরীর লইয়া দিনকে দিন, রাইতকে রাইত বাঁচনের লাইগ্যা আওয়াজ তুলতাছে। কত্তো লোক মরতাছে, কত্তো লোক জেলে যাইতাছে। কিন্তুক একদিন দেখবা চাচা, ওই লোকগুলাইনই দুনিয়াডার মালিক হইব।'.........এই বলে আস্তে আস্তে জলিলের গলার স্বরটা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে গেল। নিঃশ্বাস গেল বন্ধ হয়ে। মহসীনের চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা জল।

সবাই কান পেতে শুনল। অবাক, বোবার মতো। চোরের ছেলে চোর। কিন্তু কি আশ্চর্য সব কথাগুলো বলে গেল, কেউ কোন দিন ভাবে নি। সবাই চেয়ে রইল মাঠের ওপারের দিকে। তাদের মতো কতকগুলো লোক নাকি ওপারে লড়ছে, মরছে, বাঁচার আওয়াজ তুলছে।'

রাত্রি তখন শেষ হয় হয়। সবাই আকাশের দিকে তাকায়। মনে হয় এপারের অনেকগুলো চোখ ভোরের সূর্য প্রতীক্ষায় মুহূর্ত গুনছে।

মাতৃহননের নান্দীপাঠ

আবদুল মান্নান সৈয়দ

(১৯৫৭-১৯৬০)

পৃথিবীতে মা আমাকে সবচেয়ে ভালোবাসেন, এবং আমি তাকে। যেখানেই আমি যাই দুটি নির্নিমেষ চোখ পিছনে ছুটছে, পিছনে পড়ছে না একবারো, সরে যাচ্ছে না, এমন কি পলক ফেলছে না কখনো, যেন মানুষের চোখ নয়। মানুষের অবশ্য, তবু মানবীয় নয়। দানবীয় এক যন্ত্রে পরিণত হয়েছে যেন, দিনেদিনে. মানুষের চোখ হ'লে তো ক্ষণে ক্ষণে পলক পড়তো। মানুষের চোখই ভীষণ এক যন্ত্রে পরিণত হয়েছে যে-যন্ত্র অবিরাম বেজে চলেছে ধ্বকধ্বক. আমার জন্মলগ্ন থেকে অন্তিম প্রহর অবধি কণ্ঠস্বর বিছিয়ে আছে, না বিছিয়ে নয়, ('বিছানো' শব্দটি তো শান্তির প্রতীকপ্রায়) আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে মৃত্যুর অভিমুখে, কবর পর্যন্ত আমাকে পৌঁছিয়ে না দিয়ে যেন শান্তি নেই তার। আমার হৃৎপিণ্ডের মতই আমার মৃত্যু অবধি যাত্রা তার না, হয়তো তারও পরে, আমার মৃত্যুর লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে, শুধু আমি তখন জানবোনা, যে আমার কবর অবধি হানা করে ; কেননা সে পরিণত হয়েছে যন্ত্রে (মানুষের মৃত্যু আছে, যন্ত্রের তো মৃত্যু নেই), যন্ত্রপিণ্ডে। হৃৎপিণ্ডে মমতা ও উত্তাপ থাকে ব'লেই, হৃৎপিণ্ড নশ্বর বলেই তার দ্যুতি হীরে-কাটা ছুরির মত , কিন্তু এমন যদি নিয়ম থাকতো, হৃৎপিণ্ডে মমতা ও উত্তাপ থাকতে হবেই কিংবা হৃৎপিণ্ডে মমতা ও উত্তাপ ছাড়া কিছুই থাকবেনা—না ঘৃণা না হিংসা না ক্রোধ না আক্রোশ , তাহলে হৃৎপিণ্ড তৎক্ষণাৎ পরিণত হ'ত যন্ত্রপিণ্ডে ;— যার মৃত্যু নেই, এবং যা মৃত, নির্জীব, গুটিকত নিয়মের ক্রীতদাস, লুটিয়ে থাকে, অকর্মণ্য। মা-র ভালোবাসা আমার পক্ষে অমনই, অমনই ভীষণ অমনি নিষ্প্রাণ যন্ত্র যার ভিতর ভ'রে দেয়া আছে স্তর স্তর মমতার বিরাট একটি পিণ্ড যা থেকে নিয়মিতভাবে এক নিঃসরণ চলেছে আমার দিকে যা আমাকে উন্মাদ ক'রে তুলেছে-- এই আমাকে, যে-আমি দর্শনের একজন দারুন

ছাত্র, বুদ্ধিজীবিদের মতোই যার মুখ লম্বাটে, চোখ স্বপ্নিল, যে চোখ অযুত গ্রন্থের চোরাবালি অতিক্রম ক'রে জ্ঞান নামক বিদেহী সমুদ্রে ভাসছে সারাক্ষণ। কৃশ দীর্ঘ শরীর (যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এমনকি আমিই সন্দিহান)। সেদিন কি-একটা ইংরেজী বইতে পড়ছিলাম ধরা পড়লে গুপ্তচরদের কিভাবে শাস্তি দেয়া হয়। নানা ধরনের বইতে নানা ধরণের শাস্তির ব্যবস্থা আছে, একটি এই মুহূর্তে মনে পড়ছে: খুব ছোটো একটি সেলের ভিতর তুমি বন্দী, সেলটি এতো ছোটো যে শুয়ে-ব'সে যেমন ভাবেই তুমি থাকোনা কেন তোমার মাথার উপরকার নলটির নিচ থেকে তুমি স'রে যেতে পারোনা, সেই সরু নল থেকে প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর পর-পর তিন ফোঁটা পানি এসে পড়ছে তোমার শরীরের—আর কিছু না, তোমার শাস্তি এটুকুই। এই পাঁচ মিনিট যে একই সঙ্গে সাত মাইলের মত দীর্ঘ এবং একমুহূর্তের মত দ্রুত হ'তে পারে, এবং সমস্ত চিন্তার হত্যাকারী, ফলত অসহ্য—অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই তা জানেন। কিন্তু এ আমার কী ভীষণ কথা মনে পড়লো হঠাৎ, আমার মা-র ভালোবাসা কি এমনি নিয়মিত একটি সময় অন্তর অন্তর চুঁইয়ে পড়ছে আমার মাথার উপর, যা থেকে আজীবন আমার নিষ্কৃতি নেই? কিন্তু হে ঈশ্বর, এ আমি কি ভীষণ কথা ভাবছি। 'এমন ভাবনা তোমার ত্যাগ করা উচিত, দরকার হ'লে চেষ্টা ক'রেও' ফিলজফির দারুণ ছাত্র আতিকুল্লাকে আমি আমার সম্মুখের চেয়ারে বসিয়ে বোঝাতে লাগলাম, 'কেননা তিনি তোমার জননী, কেননা তিনি তোমাকে স্নেহ করেন—এমন ধরনের স্নেহ যা অসীম এবং অনর্গল নিষ্কাশিত হয়, যার অভাবে দুনিয়ার অনেক মানুষ শান্তি পায় না, লালায়িত থাকে, যে একবিন্দু অমল ভালোবাসা পাবার জন্যে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ—মূর্খ কি মহামানুষ—উদগ্রীব, যে-স্নেহ তোমার দুঃখের দিনে অমিত প্রাণশক্তির মত কাজ করে। তোমার সমস্ত কাজের পিছনে তাঁর উপস্থিতি অনিবারণীয়: তুমি যখন জুতোর ডগা আয়নার মত পিছল আর চকচকে করতে ব্যস্ত তখনো যেমন, তেমনি তুমি যখন কোনো গ্রন্থের ভিতর ডুবে আছো তখনো অনুভব করতে পারো তোমার পিছনে উন্মুখ আছে তাঁর হাত, তাঁর চোখ, প্রার্থনাসমূহ। তোমার মা নাম্নী ভদ্রমহিলাটি একজন বিধবা ও ধনী মানুষ, তোমার জনক যখন অকালে পরলোকগমন করেন তখন তোমার মা-র বয়স ছিলো মাত্র আটাশ, তিনি অনায়াসে তখন বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারতেন; তাঁর শরীর ও মনের চাহিদা তখনো নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ

মেটেনি, দরকার ছিলো বয়স্ক একজন মানুষের, যিনি তাঁকে দিতে পারতেন উত্তাপ ও নির্ভরতার বাহু। কিন্তু তোমার মা কেন, কি ভেবে শেষ পর্যন্ত বিবাহ করেন নি তুমি তা জানোনা—নানা কারণ থাকতে পারে এর পিছনে, যে-সব "কারণে"র পাদপীঠ সম্বন্ধে তুমি ভাবতে চাও না, কারণ তা তোমাকে ক্লান্ত করে, বিরক্ত করে, উত্তেজিত করে। তবে তোমার মা-র শুষ্ক আলাপে ও আত্মীয়-স্বজনের কথাবার্তায় তুমি বুঝতে পেরেছো তোমার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ তাঁর দ্বিতীয়বার বিবাহ না করার অন্যতম একটি কারণ ; চতুষ্পার্শ্ব থেকে কেন জানি তিনি এই কথা বুঝে নিয়েছিলেন দ্বিতীয় বিবাহে তোমার শারীরিক ও মানসিক উন্নতি আঘাতপ্রাপ্ত হ'তে পারে—তুমি তা জানোনা, বুঝতে পারোনা। তাছাড়া মা-র পূর্ব জীবন সম্বন্ধে এইসব কথা ভাবতে তোমার কেমন যেন খারাপ লাগে, ইচ্ছে করে তুমি এই ভাবনাকে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করো, কোনো সময় সুস্পষ্টভাবে গুছিয়ে চিন্তা করোনা ; এই খারাপ লাগার নানাকারণ হিসেবে অনেকে বাংলা দেশকে উপাস্থত করেন বলেও তুমি জানো। যাই হোক, ফল হ'লো এই যে, মা-র ভালোবাসা একমাত্র তোমাকে কেন্দ্র ক'রে পাক খেয়েছে চারদিকে, তাই আজ জীবনের প্রায় অপরাহ্নকালে তিনি তোমাকে ছাড়া আর কিছু জানেন না।' এইখানেই তো আমার আপত্তি, কেন আমাকে ছাড়া আর কাউকে জানেন না। 'ভুলে যেয়োনা তুমি তাঁর একমাত্র সন্তান।' কেন আমি কিছুতেই বিস্মৃত হতে পারিনা তাঁর দুটি করুণ চোখের ভাষা। কোথায় যেন একটি ছবি দেখেছিলাম : এক মহিলার অনুচিত নিতম্বের সন্ধিস্থলের ভিতর দিয়ে উদভাসিত হ'য়ে উঠেছে সমুদ্র বেলাভূমি। আমারো কি প্রায় অনুরূপ দশা ঘটেনি ? ঈশ্বর আমার পিঠে দুটি চোখ এঁকে দিয়েছেন, যে-চোখ অন্য একজনের , যে-চোখ আমাকে কিছুতেই একাকী হ'তে দেয়না, যে-চোখ সারাক্ষণ আমাকে বিরক্ত-বিব্রত-বিপন্ন রাখে, এমন কি ঘুমের ভিতর তার শান্ত দৃষ্টির পাহারা থেকে নিষ্কৃতি নেই , যে-চোখ শান্ত এবং ভয়ানক শান্ত ব'লেই ভয়ানক। কোথায় যেন পড়েছিলাম—ভারতচন্দ্র কি গোপাল ভাঁড় সম্বন্ধে সেকথা মনে নেই, একটি গল্প : একদা সে পিঠের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখেছিলো এক রঙ্গময়ী সুরঙ্গমযীব সূচীমুখ উরোজেয় কলি ফুটে বেরিয়েছে কিনা ! বদলে ঈশ্বর আমার পিঠে এঁকে দিয়েছেন দুটি চোখ, বিশ শতকের অস্বভাবী ও স্বাভাবিক একজন ভাঁড়ের পরিচয়-চিহ্ন। আধুনিক কোনো শিল্পী আমার

শরীরকে রূপ দিলে পিঠের উপর নিশ্চয় বসিয়ে দেবে একজোড়া ভীষণ রকম শান্ত চোখ। ছেলে মেয়ে বড় হ'লে তাদের উপর নিজস্ব দায়িত্ব যে বতায় না সেকথা বোঝেনা, রহস্যময় অনেক দেশ কুয়াশার ভিতর থেকে ঝিলিক দিয়ে উঠতে থাকে নতুন চেতনার নবসূর্য নীলিমা-সংক্রান্তিকালে। আমার ফিরতে দেরি হয়, রাত্রি হয়, দেখি রাস্তার দিকে চেয়ে মা অপেক্ষায় আছে। অভিযোগ ক'রেছ কতোদিন, কিন্তু বুঝেও বুঝলো না মা। রাস্তাঘাটে বেরোবার আগে কতোবার যে সাবধান করবে তার ইয়ত্তা নেই। শেষ অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দেরী হ'য়ে গেলে বাড়ি ফেরায় মা-র অশান্ত মনে ক'রে আমি কিছুতেই স্থির থাকতে পারি না, কিন্তু নির্ধারিত সময় মত কিছুতেই আমি ফিরতে পারব না যেন নির্ধারিত সময় উতরে ফেরাই আমার উদ্দেশ্য হ'য়ে দাঁড়ালো! যেহেতু একদিকে মার ইচ্ছা আর একদিকে আমার চেষ্টা এবং এ দুটি আমার ভিতরেই সংঘটিত হচ্ছে, যেহেতু একই সঙ্গে এই সময়ে আমি যোদ্ধা ও দর্শক, আমার দুটি অংশের প্রতিরূপ, সুতরাং আমি ছিন্নভিন্ন হ'তে লাগলাম। অবিচ্ছিন্ন এই যন্ত্রণা আমার গা বেয়ে বেড়ে উঠলো চূড়ান্ত পর্যায়ে যখন দেখলাম আমার আর রিনার ভেজানো দরজায় আঁকা আছে দুটি ভয়াবহ রকম শান্ত চোখ। মুহূর্তে সেই সাবানের ফেনার স্তূপের মত বালিশ, গভীর নরম শয্যা, দেয়ালে বিজড়িত ছায়ায় আপন চিত্র, রিনার কৃশ সোনালী বন্ধুর শরীর, ঘন নিঃশ্বাসের স্পর্শনীয় শাস, তার মূলে পাখা শ্রোনীচক্র, নাভি থেকে উষ্ণ উজ্জ্বল অগুপ্ত আরণ্য ব-দ্বীপ অবধি চিক চিক রূপালি জলরেখা, মোহনার মোহ, এই সব এই সমস্তর বদলে পাগল ক'রে দিলে বন্ধ দরজার নিষ্পলক ভীষণ রকম শান্ত দুটি চোখ আর সেদিনই আমার প্রথম মনে হলো এমন হয় না যে ঐ শীতল মুখটার ভিতর থেকে লকলকে ছুরির মত বেরিয়ে পড়ে জিভ, মার্বেলের মত চোখের মণি দুটি ঠিকরে বেরিয়ে আসে। না, এতো রূঢ়ভাবে নয়, শুধু অপসারণ আমি চাই, ঐ দু'টি ভীষণ রকম স্তিমিত ও প্রোজ্জ্বল্ চোখের অভাব বেজে উঠুক আমার স্বভাবে। পেয়েছি। আমি "কারণ" পেয়ে গেছি। আমার আর কোনো ভয় নেই, আমি খুঁজে পেয়েছি সমন্বয়ের রাস্তা কিমাকার নৃত্যের ভিতর পুনরাবৃত্ত মুদ্রার মত। তাই আমার খুশী হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু ঘৃণা, বেদনা, আক্রোশ কেন আমাকে পরপর এসে শিকার ক'রে নিয়ে যাচ্ছে তরঙ্গের অন্ধকার অন্তরে তা আমি বুঝতে পারি না, কেন বারবার

ছিঁড়ে যাচ্ছে যুক্তিজাল, দৃষ্টি কুয়াশায় আচ্ছন্ন।

আমার সুখী হওয়া উচিত ছিলো, যে-ঘটনা আসন্ন হ'য়ে উঠেছে তাতে আমার সুখী হওয়াই উচিত ছিলো। প্রায় অপ্রত্যাশিত অবিশ্বাস্য ঘটনা। নিজে এই সব ইশারা চতুর্দিকে খেলে যেতে না দেখলে বিশ্বাসও করতাম না হয়তো। হঠাৎ একদিন ফিরে বাইরে থেকে এক ভদ্রলোককে দেখলাম ব'সে আছেন ঘরের ভিতর একটা ম্যাগাজিনের পাতা এমন অলসভাবে ওল্টাচ্ছেন, মনে হয় অনেকক্ষণ ধ'রে ব'সে থাকবেন। আমাকে দেখে একটু অপ্রস্তুত হ'লেন. মা আবক্তিব মুখে প্রথমে কিছু বলতে পারলেন না, পরে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, দূর সম্পর্কের একজন আত্মীয় ব'লে। আমি ভিতরে চ'লে এলাম, আমার কেন যেন খারাপ লাগছিলো। দু-একটি কথা ব'লেই আমি তাই স'রে এলাম। আমার তখন মনে পড়লো ঘরের ভিতর আমি এ কদিন আধপোড়া একটি সিগারেট দেখছিলাম, তখন এ সম্বন্ধে কিছুই ভাবিনি, মনে কারনি উল্লেখযোগ্য। আর তার মানে লোকটা কেবল আজ আসেনি, এর আগেও এসেছিলো। যে-কোনো কারণেই হোক মা আমাকে লোকটার কথা বলেনি, অবশ্য মা আমাকে অনেক কথাই বলেনা—হয়তো বলার কিছু ছিলোনা। স্বভাবত আমি একটু গম্ভীর প্রকৃতির, আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী যাওয়া-আসা করিনে, কচিৎ তাদের সঙ্গে দেখা হলেও বিশেষ কথা জোগায় না আমার মুখে, এ নিয়ে আত্মীয়-স্বজন তো বটেই মারও ক্ষোভ আছে, লোকটার কথা আমাকে না-বলার পিছনে এটা একটি কারণ হ'তে পারে। ক্রমশ লোকটা প্রায়ই [illegible] লাগলো, যে-কোনো সময় বাড়ি ফিরলে দেখতে পেতাম মা-র সঙ্গে ব'সে ব'সে গল্প করছে। কী এমন কথা থাকতে পারে যে রোজ এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব'লেও শেষ হয় না—মনে মনে আমি ভাবতাম। আমি, যে নাকি গম্ভীর প্রকৃতির ও ঘরকুনো, বাইরে থাকতেই ভালো লাগতে লা[illegible] আমার, সারাদিন প্রায় বাইরে-বাইরেই কাটছে। মা-ও দেখি আগের মত খোলাখুলি ভাবে অপেক্ষা করেন না আমার, আর সবচেয়ে খারাপ লাগে আমার মা-র সঙ্কোচ, সারাক্ষণ একটা সঙ্কোচ আর অপরাধ যেন তাকে ঘিরে থাকে—কিছুতেই আগের মত সহজ ও স্বাভাবিক হ'তে পারেন না আমার কাছে। আগে আমাকে 'তুই' ব'লে ডাকতেন, আজকাল দেখি 'তুমি' বলেন। আমার সম্বন্ধে মা-র সমস্ত রকম

উদ্বেগ, এতোদিন যার প্রকাশ ছিলো বিমগ্ন। এখন কেমন প্রচ্ছন্ন ঠেকে, ঠিক মুখ ফুটে তিনি জিজ্ঞেস করতে পারেন না। বাইরে থেকে দেরি ক'রে এলে দেখতে পাই একটি কষ্ট নীলচে হ'য়ে ছড়িয়ে আছে তার মুখে, কিন্তু স্পষ্ট করে আগের মত বলতে পারেন না কেন দেরি ক'রে এলাম, কেন তাকে কষ্ট দেয়া অকারণে। এটা আমার খারাপ লাগে: মনের কষ্টের এই নগ্ন অথচ প্রচ্ছন্ন প্রকাশ। আগে যদিও খারাপ লাগতো মা-র অপ্রকট সততা, স্নেহের নিবঙ্কুশ প্রকাশ, এখন মনে হয় সেও ভালো ছিলো। এই কিছু না-ব'লে অনেক বলায় আমার যন্ত্রণা বেড়ে উঠে গা বেয়ে। মা-র এই পরিবর্তন ঘৃণা, বেদনা ও আক্রোশের জন্ম দিতে থাকে আমার ভিতরে। 'তুমি ফ্রয়েড পাঠ করেছ অতএব তোমার বোঝা উচিত কেন তোমার মা এই বয়সে দ্বিধায় পড়েছেন।' নির্জন রেস্তোরাঁয় একা বসে ব'সে আতিকুল্লাহকে সম্মুখের চেয়ারে বসতে ব'লে খুটিয়ে খুটিয়ে আমি পবিস্থিতিব ব্যাখ্যা করি, 'তোমার পিতাব অকাল মৃত্যুর পব দীর্ঘ সতেরো বৎসর তোমার মা একাকী আছেন, একাকী মানে কেবল তোমাকে, তাঁব সন্তানকে নিয়ে। আব তাঁর পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে, জনমতে জীবনের সুস্বাদু মুহূর্তগুলি রূঢ় রৌদ্রের ভিতর ঝরিয়ে দিয়ে, উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে তাঁব বাসনা, এই পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে জীবনের তথাকথিত বিপজ্জনক প্রহর কাটিয়ে এসে ভেঙ্গে ছাবখার হ'লো সংযম তাঁর। বিবাহেব উপযুক্ত সন্তানেব সম্মুখে আজ তিনি নম্র, লজ্জিত, অসহায়।—ফেঁসে গেলো সমস্ত বন্ধন।—তোমার বোঝা উচিত, মা কেন এই দ্বিধায় জর্জরিত হচ্ছেন, সেই যন্ত্রণা তোমাব বোঝা উচিত, তুমি বুঝতেও পারো, তাঁর একদিকে প্রবৃত্তি আর একদিকে তুমি মূল ধ'বে টান দিয়েছো। কোনো পক্ষই যেহেতু এখনো বিজয় পতাকা ওড়াতে পারেনি, অতএব, তাঁর যন্ত্রণা তো স্পষ্ট। তুমি শিক্ষিত, মা-ব অবস্থা ভালোভাবেই বুঝতে পারো, তাই তোমাকে তাঁর প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হওয়া উচিত। কেন তুমি উল্টে ঘৃণা, বেদনা, আক্রোশের শিকার হও, বুঝতে পারিনে। তোমার তো খুশি হওয়াই উচিত ছিলো, তুমিই তো চেয়েছিলে মা-র ভালবাসা একা তোমাকেই আর যেন না বহন করতে হয়। একথা তুমিতো ভেবেছো অনেকবার, মা'র হৃদয়ের ভিতরে কোনো সঙ্গী থাকলে তাঁর ভালোবাসার ভার অসহ্য হ'য়ে উঠবে না তোমার কাছে। এই মধ্যবয়সী পরিচ্ছন্ন, ফিটফাট ভদ্রলোকটিকে মা যদি বিবাহ করেন আর তার আভাস তো পাওয়াই যাচ্ছে, তো তোমার সুখী হওয়া উচিৎ,

প্রথমত, মার হৃদয়ের একজন সঙ্গী জুটবে এই ভেবে—তুমি বড়ো হ'য়ে গেছো, মা আর তোমাকে নিজের মত ক'রে পান না, তা ছাড়া মা-র প্রতি তোমার বিরক্তি উক্ত বুদ্ধিমতী মহিলার কাছে প্রচ্ছন্ন নয় তা-ও জানো ; দ্বিতীয়ত, মা-র একজন সাথী জুটলে তাঁর ভালোবাসা তোমার পক্ষে সুসহ ও পুষ্টিদায়ক হ'য়ে উঠবে যা তুমি এতোকাল নীরবে অনুভব ও প্রার্থনা ক'রে এসেছো ; নিজেকে তিনি আর একলা মনে করবেন না, করবার মত কিছু কাজ তিনি পাবেন, তাঁর হৃদয়ের কিছু অংশ অন্য একজনের ভালো-মন্দে জড়িত থাকবে—হয়তো তিনি সুখীও হবেন। আর মা-র সুখেও তোমার খুশি হওয়া উচিত। অতএব অনর্থক ঘৃণা, বেদনা, আক্রোশে নিজেকে বিনষ্ট করবার তোমার কোনো মানে হয় না।' ঘৃণা—কেননা এতোবড়ো ছেলের সুমুখে মা আজ নগ্ন ; নগ্ন এবং পরাজিত। যদি সতেরো বৎসর আগে এই ঘটনা সংঘটিত হ'তো তাহ'লে নিশ্চয় মা-র জন্য আমাকে ঘৃণায় কুঞ্চিত হ'তে হ'তো না। মা-র নিজের যে-শক্তি নেই, সতেরো বৎসর ধ'রে সেই শক্তি ফলানোর সাধ যে তাঁকে কুরে-কুরে খেয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, মা-র এই বাহাদুরির লোভটাই ঘৃণার জন্ম দিয়েছে আমার ভিতর—সতেরো বৎসর ধ'রে মধুযামিনী মায়ের পায়ে মাথা খুঁড়েছে, যে সতেরো বৎসর মা আমাকে একেলা স্নেহ প্রে করার নির্মম নির্জন যন্ত্র। বেদনা—কেননা এখন যে সবাই বুড়ো আঙুল তুলে দুয়ো দেবে, এতোবড়ো ছেলের সুমুখে মা-র এই কাণ্ড আমার পক্ষে অসহ্য। (একটি সামান্য ঘটনা যে মানুষের সারা জীবনকে নতুনতর অর্থ দিতে পারে, পাল্টে ফেলতে পারে পূর্ববর্তী সমস্ত ঘটনার বাহ্যরূপ—হায়, তুমিও তা বিশ্বাস করো আতিকুল্লাহ। আর তাই আক্রোশ, মার উপর এবং মধ্যবয়সী ও পরিচ্ছন্ন, বদমাশ ভদ্রলোকটির উপর আক্রোশের নানা প্রজ্জ্বলন নক্ষত্র-বিন্দুর মত উদ্‌গত হ'তে থাকে চারদিকে থেকে····· অথাৎ তুমি মার সুখে শত্রুতা সাধছো।' রাস্তায় আমার পাশা পাশি হাঁটতে হাঁটতে আতিকুল্লাহ নানান আকারে তার ভাবনা আমার কানে কানে ব'লে যায়, অর্থাৎ 'তুমি কোনো সময় তোমার মাকে সুখে থাকতে দিতে চাও না : এতোকাল নিজে তুমি মনে মনে বিষ পিঁপড়ের মত জ্বলেছো তার উপর। এখন তিনি তাই বাধ্য হ'য়ে নতুন পন্থার আশ্রয় নেবার চেষ্টা করছেন দেখে খেপে উঠেছো তুমি। অথচ তোমার মা এমন দুর্বল প্রকৃতির লোক যাকে কারো উপর নির্ভর করতে হয় দুনিয়ায় চলতে গেলে ; এতোকাল ছিলে তুমি, এখন

অন্যজন আসবেন। আসলে তুমি এমন প্রকৃতির লোক যে মাকে কষ্ট দিয়ে চিরকাল আনন্দ পাবার চেষ্টা করে। কে তাহ'লে শয়তান? হয়তো তোমার মনোভাব আরো গর্হিত: মা-র মুখ্য মূলধন আবেগ নানা আকারে তোমার কাছেই পৌঁছে যেতে থাকে সারা জীবন—এই তোমার ইচ্ছা—অথচ বদলে তুমি দিয়ে যাবে শুধু উপেক্ষা। ভুলে যেয়োনা, পৃথিবীতে প্রতিটি জিনিসই বেঁচে থাকে পরস্পরের বিনিময়ে, এটাকেই লোকে ব'লে থাকে স্বার্থ। মা, এমন কি মা-ও স্বার্থবোধের বাইরের বাসিন্দা নন, সেখানেও আছে বিনিময় ব্যবস্থা। কিন্তু তুমি তোমার দিক থেকে কিছুই দিতে প্রস্তুত নও। ফলে এই হৃৎব্যবসা ('মা-র সম্বন্ধে এই কথা বলছো তুমি? ছিঃ, তোমার ভাবা সংযত করো, আতিকুল্লাহ!) অচল হ'বার উপক্রম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।' আমাকে যখন পাগল ক'রে তুললে এইসব ভাবনা, তখন হঠাৎ মনে পড়লো কিছুদিন আগেও তাঁর স্নেহের অত্যাচারে বিচলিত বিব্রত ক্রুদ্ধ আমি চেয়েছিলাম তাঁর অপসারণ, অবশ্য কি ধরনের হবে এই অপসারণ আমি তা স্পষ্ট ক'রে ভাবিনি, না, মিথ্যে বলবো না, চেতনার গভীরতর স্তরে একদিন তাঁকে বুঝি নিরুপায় হত্যা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারিনি। এ-বিষয়ে নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্তে আসার আগেই নতুন একটি ঘটনা উথালপাথাল ক'রে দিলে আমাকে, যদিও তলে-তলে প্রবৃত্তির সেই কলা ক্ষুধিত তরল ইস্পাতের নদী হ'য়ে এঁকে বেঁকে চলেছে—কষ্টদায়কভাবে আমি তা অনুভব ক'রে এসেছি। খুব ছোটবেলা থেকে আমি যে নিজেকে একজন অস্বাভাবিক প্রকৃতির মানুষ ভেবে এসেছি আসন্ন নাটকের প্রতিক্রিয়ায় তা ব্যর্থ হ'য়ে যেতে বসলো। নির্জন রাস্তায় পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে আতিকুল্লাহকে আমি বোঝাতে লাগলাম, 'ছাখো, ছোটবেলা থেকে নিজেকে তুমি অস্বাভাবিক ভেবে আসছো, নিজেকে তুমি কিছুতেই আর-দশজনের সঙ্গে মেলাতে পারোনা, কি ক'রে লোকে এতো সামান্য কারণে হাসতে পারে, ছোট বিষয় নিয়ে মেতে উঠে হিংসার প্রতিযোগিতায়—তুমি তা ভেবে পাওনা - এ নিয়ে মনে মনে হেসেছোও যেমন তেমনি দুঃখও আছে তোমার: কেন তুমি আর দশজনের মত হ'লেনা, বেলেল্লা হল্লায় মেতে থাকতে পারলেনা আজীবন। ফিলজফি পড়তে এসে প্রথম তুমি জানলে "স্বাভাবিক" কথাটি আদর্শ মাত্র, আসলে প্রত্যেকটি মানুষই অস্বাভাবিক—অন্তত নিজেকে প্রত্যেকে অস্বাভাবিক মনে করে। এই তথ্য

জানবার পর লাফিয়ে উঠলো তোমার হৃৎপিণ্ড ; তাহ'লে কেন আমি এত কষ্ট পেয়ে এসেছি এই দীর্ঘকাল ধ'রে— ভাবলে তুমি। কিন্তু ততোদিনে গ'ড়ে গিয়েছো তুমি, একরোখা হ'য়ে উঠেছে তোমার বয়স, তুমি আর বদলাবে না, লক্ষ্যের দিকে তীরের মত ছুটে যাবে—তাই এই সব তথ্য কিছু দিন পরই অবান্তর হয়ে গেলো , এই তথ্যের সততা সম্বন্ধে সন্দেহ তোমার থাকলোনা ঠিকই, কিন্তু নিজে তুমি লোকে যাকে বলে "স্বাভাবিক" তা আর হ'তে পারলে না, মিলিয়ে দিতে পারলে না আর দশজনের ছোট ছোট আনন্দ-বেদনার সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে এই অভিজ্ঞানও হ'লো : বুদ্ধির অনেক উপরে প্রবৃত্তি কাজ করে, বুদ্ধি শুষ্ক নিরুপায় আবেগহীন। ফলত ফিরে এলো তোমার প্রাক্তন দুরন্ত রাস্তা—দুঃখ এবং গর্ব—নিজেকে সবার থেকে আলাদা স্বতন্ত্র, অস্বাভাবিক ভাববার দুঃখ এবং গর্ব—যেহেতু তুমি আর দশজন সাধারণ মানুষের মত নও, এবং যার ভিতর "কিছু" আছে সে-ই অস্বাভাবিক হয় এই ধারণায়। তুমিও যে সাধারণ মানুষের লাইনেই দাঁড়াবার উপযুক্ত তোমার বর্তমান কিংবা সন্ত প্রাক্তন চিন্তাপ্রণালী কি তার সাক্ষ্য দেয় না? এই অবস্থায় আর সবাই যা করতো তুমিও তাই করলে অর্থাৎ বিদ্ধ হ'লে আক্রোশে, ঘৃণায়, বেদনায় -- শিক্ষা তোমাকে কি দিয়েছে তাহ'লে : --তুমি "কী" তার একটা অস্পষ্ট ধারণামাত্র—প্রবৃত্তির মোড় ফেরাবার ঘণ্টা বাজাবার সামান্যতম শক্তিও নেই তার। আসল কথা, মানুষের মৌল কয়েকটি বাঁধা আছে, একই "কারণ" একই রাস্তা দিয়ে তোমাকে ব'য়ে নিয়ে যাবে, যেখান থেকে মুক্তি নেই কারো —আসলে মানুষ উপরে-উপরে যদিও পাশা খেলার ছক নয় ভিতরে ভিতরে তবু সে এক গভীরতর অঙ্ক, যে অঙ্কের বঙ্কিম পদ্ধতি কেউ জানলো না, যে-নিয়ম মানলো না কোনো সিঁড়ি এই ভাবনা পাগল ক'রে দিলে আমাকে যখন দেখা গেলো আমি সাধারণ অতিসাধারণ মানুষমাত্র আর এই চিন্তার ভগ্নাংশ বিদ্যুতের মত জ্বলিয়ে দিলে স্ফুলিঙ্গ তরল সেই ইস্পাতের নদীর লকলকে ফলা। নিজেকে অন্য-সবাই থেকে আলাদা করবার ইচ্ছায়, যখন সেই ইচ্ছাকে আমি লালন করলাম প্রাণের গভীরে, গানের ধ্রুবপদের মত ফিরে-ফিরে আসতে লাগলো, নিজেকে আর-পাঁচজন থেকে আলাদা করবার অছিলায় এই ঘটনাকে নতুনভাবে ব্যবহার করলাম আমি। এখন আমার মনে হচ্ছে—পেয়েছি, মনে মনে আমি ছিলুম এই উল্লাসে, এই "কারণ", এই কারণ এখন আমার মুঠোর ভিতর এসে গেছে। বুদ্ধি দিয়ে যদিও বুঝতে

পারছি জনাব আতিকুল্লাহ যা ব'লে থাকেন, আমি, রক্তমাংসের আতিকুল্লাহ তা বিশ্বাস করিনা, আমার প্রবণতা বৈপরীত্যে অবিরলভাবে বেড়ে ওঠার দিকে। একজন উন্মোচন বিশ্লেষণ নিষ্কাশনে নিজেকে রাখতে চায় পরিশুদ্ধ; আর একজন জনাব আতিকুল্লাহর ইস্ত্রি-করা পরিষ্কার শার্টপ্যান্ট নিয়ে ধূলোর উপর ব'সে যায় কিছুই না ভেবে, বোকার মত। যেহেতু আমার বাইরের বাস্তব মানুষটি থাকে শহরে এবং বুদ্ধিজীবি তাই এতোকাল আমি নিঃশব্দ চিৎকারে "কারণ" খুঁজে বেড়িয়েছি। আসলে আমি তাঁকে কেন হত্যা করতে চাচ্ছি? স্নেহচ্যুতির আশঙ্কায়? না, স্নেহের আতিশয্যের জন্য, যার জন্যই একদা আমি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম এমন ভাবনায়? না, বৈরিতাঃ আমার আর রিনার ঘরের দরজায় যে-চোখ একদিন দেখেছিলাম ঠাণ্ডা ও ভয়াবহ, মা-র আর ঐ ভদ্রলোকটির নিজস্ব ঘরে সেই চোখেরই হিংস্রতম রূপ দেওয়ার স্পৃহা? অন্তরে-অন্তরে যেহেতু নিশ্চয় আমি জানি আমি একজন অস্বাভাবিক প্রকৃতির মানুষ—নির্জনতা সর্বনাশ করেছে আমাকে—আর-কেউ গুঢ়তর ব্যাপারটা যাতে না জানে, তাই স্বাভাবিক, বাস্তব, সাধারণ হবার জন্য ভিতরে-ভিতরে আমার কি করুণ দ্বন্দ্ববহুল প্রয়াস আমিই তা জানি। পাগলের মত আমি খুঁজে বেড়িয়েছি এমন একটি উপায় লোকে যাকে নিতান্ত বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখতে পারে আপনার মত ক'রে, এবং অবশেষে অকস্মাৎ যা স্বর্গের ফলের মত এসে গেলো আমার আবিষ্ট করতলে। সবচেয়ে দুঃখ এই যে আসন্ন নাটকে আমাকে, অস্বাভাবিকতা নিয়ে যার প্রচ্ছন্ন গর্ব ছিলো উত্তুঙ্গ, হাত পাততে হ'লো সেই স্বাভাবিকতার কাছে, লোকে যাকে 'বাস্তব' বলে থাকে—হায় গর্ব আমার টিকলোনা, আমার এই পরিণতি হ'লো। লোকে বলবে, 'অতো বড়ো ধাড়ি ছেলের সুমুখে মা প্রেম করতে গেছলো, ছেলেটার তা সহ্য হবে কেন? কতোদূর গড়িয়েছিলো ভেতরে ভেতরে কে জানে? নাকের ডগায় এইসব করতে দেখে ছেলেটা অসহ্য হ'য়ে শেষে এই কাণ্ড বাধিয়ে বসলো।' অবশ্য আড়ালে আবডালে বলবে লোকে, কেননা এই নাটকে আমাকে যে চরিত্রে অভিনয় করতে হবে, যথেষ্ট কুশলী সে। আমার চিন্তাপ্রণালী যখন এই পথ বেয়ে কুটিল চক্রান্তে আবর্তিত, তখন একদা এক সন্ধ্যায় জনাব আতিকুল্লাহ বন্ধুর মত আমার কাঁধে হাত রেখে আস্তে আস্তে বললে, দু কানে মোম ঢেলেও আমি যা শুনতে চাইনি, 'চারদিক থেকে তুমি অনেকগুলো "কারণ" পেয়ে গেছো, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, যার একটি সম্পূর্ণ বাস্তব

এবং যার অপেক্ষায় তুমি ছিলে, কেননা বাস্তব কারণ ছাড়া এমন একটি আসন্ন নাটকের প্রধান নায়কের চরিত্রে অংশগ্রহণ করতে তোমার বাধতো ; তুমি ভাবতে নিজের মনোবিকার থেকে তোমার এই ইচ্ছে উত্থিত হয়েছে এবং সত্যিকার না ঘটে এই ঘটনা তোমার মনোরাজ্যেই অনবরত বিভিন্ন ছন্দে ঘুরপাক খেতো, রিনরিন ক'রে অগোচর রক্তক্ষরণ হ'তো তোমার, বা তোমার জ্ঞান হওয়া অবধি হ'য়ে আসছে, আর এম্নিভাবে এই নাটক তোমার মানুষ-রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হ'য়ে কমাতো তোমার আয়ুর পরিসর। যতোদূর মনে হয়, আসন্ন নাটকে লোকে তোমাকে ভুল বুঝবে অর্থাৎ তোমার অভিনয় হবে সমৃদ্ধ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এবার অন্তত একদিক থেকে নিশ্চিত হ'য়ে তুমি হত্যাকাণ্ডে অগ্রসর হ'তে পারো।'

স্বগতমৃত্যুর পটভূমি

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

সূর্যের প্রখর অন্ধকার ও অজস্র মানুষের ভয়াবহ নির্জনতায় গোরস্থানের গৃহস্থ শবেরা আর্তনাদ করে উঠ্‌লো। এনসাইক্লোপিডিয়ার স্ফীতকায় অবয়ব এই আশ্চর্য সুযোগের সদ্ব্যবহারে আগ্রহশীল বলে অবচেতনতর সুড়ঙ্গে পথের প্রত্যাশী যেখানে এই শববর্গ সমুদ্রের সন্ধানী হবার জন্যে প্রাণপণ প্রয়াসে ব্যাপৃত।

সমুদ্রের সুসীমিত কিন্তু গভীর নীল অস্তিত্বের গৌরবে উতপ্ত। অস্তিত্বের গৌরবে মহান না সমস্তটাই সুপরিকল্পিত, সুচিন্তিত এবং সুমার্জিত একটা ভাণ-মস্ত বড়ো কোন প্রতারণা? বিশ্রামের ক্লান্তিকে নিম্নতম মর্যাদা দিয়ে সময়ের যে স্থূল অবয়ব প্রকাশিত হয় তাকেই কি মানবিক মূল্যবোধ বলে যার লৌকিক প্রতিশব্দ স্নেহ প্রেম, ভালোবাসা--বলাটাকে সুসম্পূর্ণ করতে গেলে—ক্রোধ, ঘৃণা হিংসা প্রভৃতি? সমুদ্রের এই নীল কি কোন স্থান যেখান থেকে শেষরাত্রির গাড়ী ধরা যায়? না সারারাত্রি কামড় খেতে খেতে ট্রেনের ঘণ্টার জন্যে নিশ্বাস গুনতে হয়?

মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে মানুষ গোনে। কবিতায় সন্ধ্যার পাখী গোনে; কিন্তু নিশ্বাস গোনে না।

সময় কাটাবার জন্যে কাউকেই তো নিশ্বাস গুনতে দেখিনি। এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় একশ' না ষাট পর্যন্ত গুনলে এক মিনিট। নাকের মাথা দুই আঙুল দিয়ে চেপে ধরে গুনতে থাকো, স্বর ঢোকার সাথে সাথে ছেড়ে দেবে, আমি এক মিনিট থাকতে পারি। আর সময় কাটাবার জন্যে মাঝে মাঝে নিজে নিজেই! পঞ্চাশের দিকে এসে সংখ্যাগুলো মৌন আবৃত্তিতে কেবলি পরস্পরকে চুমু খেত।

কিন্তু আমি আমার নিশ্বাস গুনি নি।

ভাগ্যিস আমি আমার নিশ্বাস গুনি নি।

তুমি তোমার গ্লাসের জলগুলোকে ফেলে দেব কেন? তুমি তোমার

গ্লাসের প্রত্যেকটি জলকেই না ভালোবাস। তুমি তোমার জলগুলোকে ফেলে দিও না।

(আমি আমার জলগুলোকে ভালোবাসি? আমার গ্লাসে কত টুকু জল অবশিষ্ট? আমি কিছু বুঝতে পারি না। আমার জানা নেই কিছু, যেহেতু আমি প্রায় সবই জানি। সত্যি আমি কিচ্ছু বুঝি না।

বড় আয়নার প্রতিবিম্বিত ছোট আয়নার আমি পুনরায় আশ্রয় নেই বড় আয়নায়। তখন কিছুতেই বলা যায় না এখানে ক'টা আমির মুখ উপস্থিত। কটা আমিকেই আমি দেখছি, অনুভব করছি।)

তুমি তোমার জলগুলোকে ফেলে দেবার প্রসঙ্গে কয়েকটি বাক্যই তো সাজিয়েছো এবং একটা প্রসারিত মধ্যভাগের পর নিপুণভাবে সঙ্কুচিত উপসংহারে পাখার বাতাস সেবন করলে। কিন্তু তিনটেমাত্র বাক্যের এই ক্ষুদ্র কিন্তু দৃঢ়বদ্ধ প্রবন্ধেও ফাঁকি কেন? তোমার শিক্ষিত, সংস্কৃত ও মার্জিত প্রবৃত্তিকে (মার্জিত প্রবৃত্তি?) হত্যা করে তোমার প্রবন্ধকে সুসম্পূর্ণ কর।

আমাব জলগুলো ভোরের শিশির জমানো সঞ্চয় নয়, রাস্তার বারোয়ারী কল থেকে নির্গত—আমার বন্ধু এই উক্তিই করেছে।

শিক্ষিত প্রবৃত্তির নিহত দেহের নোঙরা রক্ত আয়নাব অনেকগুলো আমিতে বিক্ষিপ্ত হ'ল যার ঝাঁঝে নাকে-চোখে জ্বালা। সেই সমব্যবসায়ী বন্ধুর উক্তি, এই ব্যবসাব জনৈক দালাল সহকর্মীর অবিরাম নীরব এবং শেষোক্তজনের কাছেই (হয়তো) অজ্ঞাত সাধনা আমাকে বিষণ্ণতার স্বর্গীয় বৃত্ত অতিক্রম করতে যথেষ্ট সাহায্য কবেছে।

ছাখো সেই দালাল বন্ধুব সহায়তা প্রসঙ্গেও তুমি একটি অতিরিক্ত শব্দ 'হয়তো' ব্যবহার করছো। যেহেতু তুমি এখনো সংশয়মুক্ত নও যে, সেই বন্ধুর সহায়তাও তার সচেতন প্রেরণার কাজ কি-না।

এই কদর্য কাজও করতে পারে না, আমার বন্ধু, আহ্সান আমার বন্ধু এবং আন্তরিক, ভাবতে গিয়েই তোমার পুনর্জীবিত মার্জিত বুদ্ধি এই সাহায্য ব্যাপারে তার অজ্ঞাত চেতনার কথা কল্পনা করতে তোমাকে বাধ্য করলো।

প্রথমতঃ বলা যেতে পারে যে, সন্দেহ করবার তীব্র বিষপূর্ণ বেদনাময়,—বেদনাময় না বলে যন্ত্রণাদায়ক বলা উচিত, অনুভূতি থেকে মুক্ত হবার একটি প্রায় সচেতন আকাঙ্খা এখানেও প্রবাহিত। দ্বিতীয়তঃ অনিষ্টকারীকে সকলেই নিজের ক্রোধ সৃষ্টির উপকরণ করতে ইচ্ছুক যা তার মার্জিত (?) প্রবৃত্তি বা

প্রবৃত্তির মার্জিত ক্ষেত্রে অস্বীকৃত, অপমানিত (?) ও ধিক্‌কৃত (?) হয়ে থাকে।

তৃতীয়তঃ সেই বন্ধুকে বন্ধু বলে ভাববার, তার চেয়েও বেশী নিজের কাছে প্রচার করবার একটি সচেতন প্রবণতা যার পিছনে এই দালালীতে তার বুৎপত্তি সম্পর্কে একটি ধারণা ক্রিয়াশীল।

জনৈক জ্ঞানী দালাল আমার বন্ধু, আমার বন্ধু, আমার বন্ধু।

(আরে রাখো হে, বিজনেসের তুমি জানো কি? একি তোমার সোনাভাঙার পাটের ক্ষেত? মান্ধাতর আমলের নিয়ম-টিয়ম তো ছাড়তে পার নি, প্রফিট করবে কি? আজকালকার বিজনেস হল গিয়ে তোমার বাইরের বোলচাল, বুঝলে! খোলতাটাই এখন সবাই দেখে!)

এ্যামবিশনের গন্তব্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত ও যথার্থ নৈরাশ্য ও স্বাভাবিক কামনার আশা হতাশা দ্বিতীয় পক্ষের মুখ থেকে নির্গত এই কথা সম্পর্কেও সমান প্রযোজ্য।

বিষন্নতার বৃত্ত থেকে আমার উত্তরণ ঘটেছে (ইচ্ছার প্রবল বিরুদ্ধে আমি বহিস্কৃত হয়েছি) যার জন্যে উপরোক্ত বন্ধুর কাছে আমার প্রচণ্ডভাবে কৃতজ্ঞ থাকা একান্তভাবে উচিত।

[তোমার নিজের মধ্যে একটা বিষন্নতা তৈরী করে নাও না। তাকেই তোমার জৈবিক প্রয়োজনসমূহের মর্যাদা দিয়ে বৃদ্ধি কর; সেই বিষন্নতা তোমাকে আর কিছু না দিক সঙ্গ দেবে, সব সময়ের জন্যেই সঙ্গ দেবে যা তৃপ্তিদায়ক না হলেও চরম তৃপ্তির আগের মুহূর্তে যৌন উত্তেজনারই সমান্তরাল। আহা! আমারও একদিন ছিল।]

আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ এবং তা একান্তভাবেই উচিত। যদিও এই বৃত্ত থেকে উত্তরণে আমার সম্পূর্ণই উপকার হয়নি যদিও বাল্‌বের আলোয় সিক্ত নীল, ধোঁয়ায় রূপান্তরিত এবং যদিও বা সর্বোপরি ঘষাকাঁচ পঙ্গু আলো প্রভৃতির প্রাধান্য।

[ছি! ছি! (এই ছি ছি কিন্তু কিছুতেই ছেলেবেলায় যার কাছে শোনা ছি ছি নয়, যার সঙ্গে লোকে কি বলবে, এত বড়ো ছেলে বুঝি ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদে প্রভৃতি সংযোজিত হত) তোমার মার্জিত প্রবৃত্তির রূপ এই? তুমি না সুশিক্ষিত কামনার অনুগত বাধ্য প্রজা। তুমি একটি প্রাক্তন ডোবা থেকে (ডোবা? ডোবা? ডোবা?) অপসারিত হয়ে এখনো অনভিজাত কোন জলকীটের মতন সেই বস্তুরই চিন্তা কর! শেষ বাক্যটা গঠনেই কি তোমার

আঁশযুক্ত ছাইস্পর্শিত পুচ্ছের ঝাপটানী অনুভব করা যায় না? কেবল কয়েক-বার 'যদিও' শব্দ ব্যবহার করে আসন্ন প্রতিষেধকের কতটা আশা তুমি করতে সক্ষম?]

আমি আমার বন্ধুর কাছে কৃতজ্ঞ যেহেতু সেই বিখ্যাত ও বহুজন কথিত বৃত্ত অতিক্রমের পর ব্যাপক গভীর অতএব শুকনো প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হয়েছি। বিশাল প্রান্তর যার শেষ নেই (কিন্তু সেখানে, আমি বলবো না, আমি বলতে চাই না, আমি বলবোই না, সকলেরই শেষ আছে! কিন্তু সে শেষেরও অস্পষ্টতা কি ভয়াবহ স্পষ্ট!)

গরু খুঁজতে খুঁজতে এদ্দুর এসে গরুও নেই, পথও নেই। গরু নেই কিন্তু গরুর দুধ জোগাড় নাকি হবেই। প্রান্তরের কোথাও সবুজ নেই, তাতে কি? প্যাক হয়ে টিন টিন পাউডার দুধ তো আসছেই, চিন্তা নেই। বহুবার উল্লিখিত বিষণ্ণতার বৃত্ত হল সেই আলো যেখান থেকে দুঃখের উৎস অর্থাৎ যেখান থেকে দুঃখিত হবার প্রেরণা প্রচারিত হয়ে থাকে।

আনন্দ-আশা প্রভৃতির মতন দুঃখ এসে আমাকে আঘাত করে। দুঃখ আমাকে সিক্ত করে, সহানুভূতি (আন্তরিক) সমবেদনার উত্তাপে আমি নিজেকে শীতল করি। আমি দুঃখকে অনুভব করি।

প্রেম করে বিয়ে হবার পর রোকেয়া চলে গেল কেন? বিয়ের ঠিক পরেই রোকেয়া চলে গেল। কামালের যৌথজীবন উপভোগ করবার আকাঙ্খা প্রত্যাহত হল।

আহা! কামাল একা একা রইলো।

রোকেয়াকে চলে যেতে হল কেন? রোকেয়াকে চলে যেতে হলো।

আহা হা! কামাল!

আহা হা! রোকেয়া!

আমার বন্ধুটার টাইফয়েড। বেচারা মেসে থাকে! বাবা-মা কোথায়?

আহা। কাইয়ুমের স্বর!

রীণারে! রীণা! তুই কোথায়?

ভাই, লক্ষীটি, বোন, তুই কোথায়!

(খুব পাতলা করে দ্রুত গতিতে চিনচিন ক'রে অল্প একটু চামড়া চিরে গেল আর একটু একটু রক্তের ছোট্ট ছোট্ট বিন্দু চেরা চামড়ায় সুন্দর করে জমে রইল।)

কাইয়ুম একদিন কি জিজ্ঞেস করেছিল। আর জিভের এতটুকু বের করে 'আপনার মাথা' বলেই দৌড়ে ভেতরে পালালো।

'তোর ছোট বোন, না রে?'

'হুঁ সবচে ছোটো আবার বড়ো আপার পর এইটেই একমাত্র বোন, তাই সকলেরি খুব আদুরে!'

এরপর যেহেতু পারিবারিক আলোচনা অসংস্কৃত, অতএব ক্লান্তিকর, তাই সিনেমার তরলিত আলোচনা।

এই বিষণ্ণতার বৃত্তে বাস করাকালে আমার মধ্যে একটা তরলিত উপলব্ধির অস্তিত্ব ছিলো যা কি না, আশ্চর্য, কখনও নিজের উপস্থিতিকেই সন্দেহ করেনি আমার বেদনাবোধগুলো অত্যন্ত ঋজু কিন্তু সজল বিস্তৃত বলিষ্ঠতায় গ্রন্থিবদ্ধ ছিল।

আমি আমার মৃত অনুজার অনুপস্থিতিতে আমার গত দুঃখের যে কাহিনী বিবৃত করলুম সেই দুঃখ একটি অনুভবেরই অবিচ্ছিন্ন অংশ যার জনক ওর অকাল মৃত্যু। ছোট বোনের স্মৃতিকে নিজের অংশে পরিণত করতে আমাকে যে অনুভব সাহায্য করলো তা অনেকখানিই তরলিত যা না হলে কোনমতেই পাতলা ও সরু করে চেরা সুন্দর চামড়ার উপর রক্তের ক্ষুদ্রাকার অজস্র শিশির-বিন্দু ভাবতে বা জানতে পারতুম না।

প্রথমে অভিজ্ঞতা, তারপর অনুভূতি এবং একেবারে শেষে উপলব্ধি।

ওপরে উল্লিখিত ঘটনাতে এমনি বিবর্তন উপস্থিত। ওর মৃত্যু প্রথম স্তরে আমার কাছে অত্যন্ত বাস্তব (অত্যন্ত বাস্তব বলেই আমাদের কাছে অবাস্তব, অতএব নৃশংস এবং আরো নৃশংস) একটি দুঃখজনক অভিজ্ঞতা, স্নেহ ভালোবাসা প্রেম প্রভৃতির সমন্বয়ে গঠিত প্রবৃত্তিতে আক্রমণ করে যার ফলে অনুভূতির জন্ম হয়ে থাকে।

সেই অনুভূতি, আমার পরিণত প্রবৃত্তি, (পরিণত কিন্তু এই প্রবৃত্তি অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির পর্যায়েও উপস্থিত ছিল) বাস্তবতা জ্ঞান প্রভৃতির সমবেত প্রচেষ্টায় উপলব্ধির স্তরে পৌঁছে দেয়। একটা পর্যায় সৃষ্টি হলো বটে, কিন্তু এর ফলে ব্যাবিলনের কোন নতুন উদ্যান সৃষ্টি হয় না, প্রত্যেক স্তরই এখানে পরস্পর সংযুক্ত। এই যোগাযোগের সূত্র হিসেবে সাধারণতঃ বিষাদই ব্যবহৃত হয়ে থাকে যার রঙ সবুজ আর যা তারুণ্যের প্রতীক। এই তারুণ্য বক্তৃতা বা উপদেশের বা ক্রীড়ামোদীদের তারুণ্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

[এনসাইক্লোপিডিয়ার সার্থকতা সম্বন্ধে এখানে প্রায় আশঙ্কামুক্ত (সুতরাং আশাহীন) হওয়া যায় যেখানে অনুজার প্রাক্তন মৃত্যুশোক অপারেশান থিয়েটারে গৃহিত রোগী।]

আমরা এখন পর্যন্ত বিষণ্ণতার স্বর্গীয় (স্বর্গীয় কথাটা সব সময়েই স্থির নিশ্চিত ও দৃঢ় নিরাপত্তার ইঙ্গিত দিয়ে থাকে যা কারও কাম্য নয় বলে এখানে সে অর্থকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে) বৃত্তের নাগরিক।

আমার উপলব্ধি ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাবে অন্য কোন নতুন ও বিষাদ অনুভবের মধ্যে কিছুদিন ধরেই যার রাজত্ব চলবে আবার।

কিন্তু এই বৃত্তেরই একটি আইন অনুসারে কিছুদিন আমি আমার সবরকম প্রবৃত্তিকেই যন্ত্র দিয়ে মাপা আরম্ভ করলুম। শেষের দিকে এসে দেখা গেল যে, যন্ত্রের আঁচে প্রবৃত্তিসমূহ একেকটি শবে রূপান্তরিত হয়েছে। অত্যন্ত উদ্বিগ্নতার মধ্যেও আমি আনন্দে অনুভব করলুম যে মাননীয় শববর্গ এখন আমার সম্পূর্ণ আয়ত্তে। কিন্তু অভিজ্ঞতা অনুভব ও উপলব্ধি প্রভৃতি কিছুতেই নিজেদের যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছে না, কোথাও কোন স্থৈর্য নেই, আমার গোটা অস্তিত্বটাতেই চূড়ান্ত উদ্বিগ্নতা।

চিয়ার আপ—হার্টি কনগ্রাচুলেশান্স। বিষণ্ণতার বৃত্ত থেকে গাড়ীটা হুইসল দিচ্ছে আর তুমি লাফিয়ে সেই গাডীতে উঠতে পারলে। তোমার সেই দালাল বন্ধুর কল্যাণেই তোমার যন্ত্র ব্যবহার শুরু হয় এবং সেই যন্ত্রই এই ডোবা অতিক্রম করবার প্রেরণা।

এর পরের ষ্টেশনে পৌঁছাতেই কেমন ধোঁয়া, চারদিক থেকে অজস্র ধোঁয়া। ধোঁয়া কিন্তু কোন চিমনি নেই ঘর নেই, এমন কি কোথায় দাঁড়িয়ে তা-ও জানা নেই। জানবার একমাত্র বিষয় হল ধোঁয়া, আপনাদের বায়বীয় অস্তিত্বকে বিস্তৃত-বিকৃত (ও বিনাশ) করতে চায় তার নাম ধোঁয়া।

এই সময় আমার ভেতরের শববর্গ আর্তনাদ করে ওঠে এবং সেই আর্তনাদের স্বর অত্যন্ত ধীরে হলেও আমাকে আঘাত করলো। শববর্গ আর্তনাদ করে, কিন্তু আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে সিগ্রেট টানি। আমি ভালো করেই জানি যে শববর্গ আমার দাস এবং শববর্গ আমার দাসই।

আমি মানুষটা এই সময় পয়গম্বর হবার যোগ্যতা অর্জন করি। আত্যন্তিক ক্ষমাশীলতা আমার শরীরের সঙ্গে মিশে থাকে (না সবগুলো প্রবৃত্তি বেরিয়ে গিয়ে যায় হয়ে তোমার শরীরের সঙ্গে সেঁটে থাকে ?)। আবার এ সময়

আমি এতটা ঈশ্বরত্ব লাভ করি যে, ক্ষমা না ক'রে হলেও কাউকে শাস্তি দান করি। এও অবশ্যি ক্ষমাশীলতারই একটি পরিণত রূপ।

আমি তখন আমার বিশেষ সম্মানীয় বৃত্তি সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হয়েও অনেকের সঙ্গে অত্যন্ত সাধারণ ও স্বাভাবিক আচরণের প্রতিভূ। অনেকের ধৃষ্টতাপূর্ণ ব্যবহারের উত্তরে আমি তাকে শাস্তি দান করি ঐ একই প্রক্রিয়ায় ক্ষমা করে বা ক্ষমা না করে।

'আনোয়ার তুমি মানসিক পরিণতির দিক থেকে অত্যন্ত শৈশবে বাস করছো। তোমার আর আমার বৃত্তি বাইরে থেকে একই মনে হয়, কিন্তু তুমি অত্যন্ত ছেলেমানুষ। তোমার পরিণতি অত্যন্ত খর্ব। এত খর্ব যে এ পরিণতি নিয়ে নির্মিত যে কোন মানুষকে অনায়াসে ক্ষমা করা যায়। সেই ক্ষমাও তার শৈশবকে অতিক্রম করেনি যার জন্যে তার রূপটাও তোমার কাছে স্পষ্ট হবে না এবং যা হলে তোমার অশান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেত, তোমার আচরণ ও ব্যবহার ভালোর দিকে ঝুঁকতো এবং এর সাহায্যেই তুমি আমাকে শব্দহীন ও প্রায় আকৃতিহীন কোন অপমান করতে সক্ষম হতে।

আমি পরাজিত হতে ভালোবাসি না। তাই কোন রকমেই ক্ষমার রূপটাকে আনোয়ারের কাছে স্পষ্ট হতে দিইনি। এই অস্পষ্টতাকে স্পষ্ট করবার জন্যে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই আমাকে বিভিন্ন প্রকার শবের মুখে কাপড় চাপা দিতে হয়।

আমার সেই বিখ্যাত দালাল বন্ধু যে এর মধ্যে ব্যবসার ভেতরেও নাক গলাতে শুরু করেছে, আমার অন্য একটি শিকারে পরিণত হয়েছে! এই বন্ধুই আমার একমাত্র বিলাসকে অপসারণ করেছে, আমার দাসবর্গের শবে পরিণত হওয়ায় যার ক্রিয়া যথেষ্ট, ব্যবসায়ে আমার নির্বুদ্ধিতার কথা বিজ্ঞাপিত হয়েছে এরই জন্যে। আমি মানুষটা মোটামুটি ভাল, সরল, গেঁয়ো; ব্যবসায় প্রতিভার দিক থেকে অত্যন্ত নিম্নস্তরের, এমনকি আমার সঙ্গে মেশবার বিশেষ করে ব্যবসাসংক্রান্ত কোন আলোচনা করার বাধা পর্যন্ত মাঝে মাঝে ওর মধ্যে প্রকট।

আমি আগেই এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি যেখানে আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি কি কি কারণে এই বন্ধুকে আমি কোন প্রকার খারাপ নরকের নাগরিকত্ব দেবার প্রবৃত্তিকে বারবার অবদমিত করেছি। এর ফলে বহুবার আমাকে বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু সে বিদ্রোহ সহজেই অন্ধকার

নীল শান্তিতে মিশে গেছে। এর জন্যে আমাকে কোনরকম শারীরিক (মন জিনিসটা, ছেলেবেলায় ইলা আপা বলতো, ঠিক বুকের মাঝখানে থাকে) সাহায্য প্রয়োগ করতে হয় নি, আমার সৌভাগ্য ; ওরা আমার দ্বন্দ্ব সরব পরিচয় সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিল।

আমি এখন দ্বন্দ্ব উপভোগ করি না। আমার দালাল বন্ধু সমগ্র মানব সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে এর জন্যে কৃতিত্ব লাভের অধিকারী।

তুমি একেবারে গবেট, আহসান, তুমি একটা গবেট। তোমার ভেতরে একজন ফাঁপা মানুষ প্রসাদ নির্মাণে ব্যস্ত, যার প্রধান পরিচয় হল সঙ্কীর্ণতা। সেই ফাঁপা মানুষটা তোমাকে সঙ্কীর্ণতর করে তুলতে ব্যস্ত। তুমি একজন জীবন্ত ফাঁপা মানুষ দিয়ে পরিচালিত হচ্ছ এবং এই জীবন্ত ফাঁপা মানুষের একমাত্র শূন্যহীনত: হলো সঙ্কীর্ণতা।

সুতরাং তোমাকে নিয়ে এদ্দিন মাথা ঘামানোটাই আমার অন্যায় হয়ে গেছে। অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে পর্যন্ত তোমার সঙ্কীর্ণতম সঙ্কীর্ণতা দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেছি। (এখন আর করি না।)

অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে তোমার সঙ্কীর্ণতা আমাকে মুক্তি দিয়েছে, আহসান।

অবশ্যি এই মুক্তিলাভের জন্যে আমার সাধনা সার্থকতা লাভ করলো; এই শুধু। আমার বন্ধুর মানসিক ব্যাপ্তিহীনতা এখানে একটা ঘটনামাত্র।

আমার শববর্গের মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে নিলেও এখন আর আশঙ্কা নেই।

আমি ওর জঘন্যতম ও হীন কোন দুর্ব্যবহারের পরিবর্তে অত্যন্ত অমায়িক হাসি প্রে করলুম। এখানে কিন্তু সেই ক্ষমা-শীলতার মনোভাব শূন্য! আসলে যা ক্রিয়াশীল তা ওকে পরাজিত করবার জন্যে নয় বরং আমার নিজের কাছেই ওর সঙ্কীর্ণতাকে স্পষ্ট করে তোলা।

'না না ও খুব গরীব।'

'ও খুব সঙ্কীর্ণ, আসলে গরীরের জন্যে নয়।'

'ও খুব হিংসুটে, না?'

'হুঁ!'

'তবুও তো তোমার বন্ধু!'

"তাতে কি? ও বেজায় হিংসুটে, কিন্তু হিংস্র নয়।'

'ভাগ্যিস ও হিংসুটেই, ভাগ্যিস্ ও হিংস্র নয়।'

'ভাগ্যিস !'

'আর ওর বুদ্ধি কিছু নেই। সব ব্যাপারেই ভাসা ভাসা জানে। এই ব্যবসায় সম্বন্ধেও ওর জ্ঞান অত্যন্ত হাল্‌কা !'

'ঠিক বলেছো, ও নিজে কিছু করতে পারে না !'

'ছি ছি পারলেই বা ক্ষতি কি ? কতটুকু ও পারবে ? ওকে যতই চিন্তা করবে ওর ইম্পর্ট্যান্স ততোই বাড়ানো। ওকে এবার বাদ দেয়া যাক। ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা যাক। আমি ওর জনৈক বন্ধু, ক্ষতি কি ?'

(এখানে যুক্তির সাহায্যে একটি তর্ক এবং তর্কই দেখানো হয়েছে, এ তর্ক থেকে কোনরকম দ্বন্দ্ব অনুমান করা ভুল হবে। এই তর্ক ভবিষ্যতে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পটভূমি বা প্রস্তুতিও নয়। গৃহীত সিদ্ধান্তের জন্য বেদনাকে স্মরণের সাহায্যে একটি বিশেষ পুরান চেতনাকে অনুভবের প্রয়াসমাত্র।)

আমার বর্তমান সিদ্ধান্তে পা দেবার জন্যে যে বিবর্তন তার ধাপগুলো অত্যন্ত ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। এই ধারাবাহিকতার গতিতে বাধা যতো না এসেছে তার চেয়ে বেশি অনুভূত হয়েছে অজস্র যন্ত্রণা, যন্ত্রণার উৎকট গন্ধ এর অনুকূলে প্রকটভাবে সহায়তা করেছে। উল্লিখিত যন্ত্রণায় কেবলমাত্র যন্ত্রণাই নেই, ভোঁতা ছুরির কর্কশ বন্ধুরতা আর অপরাধ প্রবণতার সূচীভেদ্য শূন্যতায় অজস্র নেপথ্য, কিন্তু বাঙময় কাঁটার কলঙ্কিত আয়োজন। এই কাঁটাগুলোই এক একটি শিবির। শিবিরগুলোতে মলিন শববর্গের করুণ বসবাস। করুণ বলেই এই আস্তানার জঘন্যতা ডাষ্টবিনের মতোন প্রায় দৃশ্যমান।

মাছের আমিষ, তরকারির খোসা, ইঁদুর ও বেড়ালের পচা শব প্রভৃতির সমবেত দুর্গন্ধে সমস্ত বাসাবাড়ী লেনটাই তন্দ্রাচ্ছন্ন। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের ক্ষমাহীন উদাসীনতাকে বারবার ঘৃণা করলেও এবং ঘৃণা করাকালেও দুর্গন্ধের প্রতিষেধক চেয়ে দুর্গন্ধের কারণবর্গকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভাবি। মাছের আমিষের উৎপত্তি মাছ থেকেই, মাছ আমাদের একটি খাদ্য বিশেষ। প্রাক্তন বেড়ালের গৃহপালিত শিষ্ট রূপ স্মরণ করলেও অবশ্যি ইঁদুরকে ক্ষমা করা দুঃসাধ্য। ইঁদুর আমাদের ক্ষমা করলো না। কিন্তু ইঁদুরবিদ্বেষী যে কোন ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বীকার করবেন যে, ফিনাইল বস্তুটার চেয়ে ইঁদুর আমাদের কাছে অপেক্ষাকৃত আপনার, যেহেতু ইঁদুরের (জ্যান্ত ইঁদুরের) জীবন আছে যে জিনিসটা আমাদের মধ্যেও থাকে এবং ফিনাইলে যার অভাব।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে শববৃন্দের শাকুনিক অস্তিত্বকে আমি নষ্ট করতে চাই, আর মৃত মিসরীয় সম্রাটের বিলুপ্ত নিশ্বাসে পিরামিড গড়ার করুণ আকাঙ্ক্ষার মতন তার বিস্তৃতি ততোই ব্যাপক, ভয়াবহ ভেবে আমি বারবার শঙ্কিত হই।

শববর্গের আর্তনাদ এখন আর নেই। কিম্বা করলেও তার সেই লজ্জিত, কুণ্ঠিত ও দুর্বল কণ্ঠস্বর আমার নিকট না-ও পৌঁছতে পারে। কিন্তু নিজেদের নীরবতা ও অচেতনার মধ্য দিয়েই তারা আমার বিস্মৃতির মধ্যে বিস্তৃতি ছড়ায়।

আমার সেই দালাল বন্ধু, আমার আরেকজন বন্ধু, আমার অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্মচারী, আমার বাড়ীওয়ালা, আমার মা-বাবা ভাই-বোন প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র দ্বীপ একটিমাত্র সত্তায় রূপান্তরিত হয়ে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত আরম্ভ ও সমাপ্তিহীন অথচ সঙ্কীর্ণ একটি কঠিন শীতল নিঃশ্বাসে জীবিত থাকে।

লাল আলোর পশ্চাতে উদ্ধত কৃত্রিম ছুঁচলো স্তন, কালো রেখায়িত নোংরা গাল আর মধ্যবয়স্কার ঘোলাটে চোখে যৌন আবেদন, কোন বালকের সঙ্গে মিথুন করবার অস্বাস্থ্যকর কল্পনা, এ্যারোপ্লেনের প্রতারক ধ্বনি, বেতারে সুকৌশলে সংবাদ পরিবেশন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সেই নিঃশ্বাস প্রসার লাভ করে, ক্ষিপ্র গতিতে তাদের সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে গৌণ করে দিয়ে কেবলমাত্র একটি অনুভবে পরিবর্তিত হয়। এই অনুভব হল সেই বস্ত্রখণ্ড—যা দিয়ে শববর্গের মুখ এখন অনায়াসে চাপা দেয়া যায়। চাপা দিতে এখন আর প্রয়োজন হয় না। তবে এই বস্ত্রখণ্ড নির্মাণে যন্ত্রের কত স্তর অতিক্রান্ত। তার স্পর্শের কোন লক্ষণই তো অস্থির শববর্গকে নির্বাক করে দিতে যথেষ্ট। এরা স্টেশনের প্রচণ্ড ধোঁয়ায় আবদ্ধ। সেই ধোঁয়া সংশয়বাদীর ঈশ্বরে অস্পষ্টতা, দৃশ্যহীনতা অথচ শ্বাসযন্ত্রণায় নির্মিত। এবং সেই ধোঁয়া নির্মিত। সেই নির্মীত ধোঁয়ায় শববর্গ আবদ্ধ, ধোঁয়াসমূহের দৃশ্যহীনতা ও শ্বাসযন্ত্রণায় শববর্গ কেন্দ্রীভূত।

আমার সেই দালালবন্ধুর সাথে অত্যন্ত মার্জিত অথচ প্রাণবান ও উৎফুল্ল হয়ে আলাপ করাকালে এমন কি তার স্ত্রীর দ্বারা আপ্যায়িত হবার জন্য স্থূল অনুরোধকে কৃতার্থ হয়ে গ্রহণ করতে করতেও পায়ের কাছে কোন পিঁপড়ের পঙ্‌ক্তিকে আমার অসহ্য মনে হয়।

রজনীগন্ধা ফুলের সরু, টুকরো টুকরো গন্ধময় তীক্ষ্ণ সৌন্দর্য আমার হাতের মধ্যে তার দেহকে নিষ্পেষিত হবার সুযোগ দেয়। হাতের তালুর আঙুলের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রাক্তন রজনীগন্ধার ধর্ষিত রূপ দেখতে দেখতে তার তেতো স্বাদ কল্পনা করে প্রথমে মুখের ভেতরে বিস্বাদ শীতলতা অনুভব করি। এই দ্রুত ও অতি বিস্বাদ শীতলতা কোন সংক্রামক রোগের মতন অতি দ্রুত সম্প্রসারিত হয়ে পড়ে সমস্ত শরীরে ও ঐ বস্তুরই একটা অংশবিশেষ মনের বিভিন্ন কেন্দ্রে। অতি প্রবলভাবে ছড়িয়ে পড়ে বলেই এই শীতলতার আয়ু সাধারণতঃ ষাট মিনিটের একটি ঘণ্টাকে অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয় এবং এর মৃত্যুর পর, কিছুক্ষণের জন্যে হলেও আমার মনে হয়, আমি স্বাভাবিক ও সুস্থ।

তুমি তোমার শিক্ষা, কালচার, মার্জিত বুদ্ধি ও সর্বোপরি এনালিসিস দিয়ে চারদিকের সঙ্কীর্ণতা, হীনমন্যতা ও আনন্দকে নিম্নতম গুরুত্ব দাও, তা হলেই রজনীগন্ধার নিষ্পেষণের মধ্য দিয়ে শববর্গ নীরব বিদ্রোহ করতে ব্যর্থ হবে।

কিন্তু বন্ধুদের সাথে রেষ্টুরেণ্টে বসে ও আমাদের একই পণ্যের ব্যবসায় বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অসাধুতা প্রসঙ্গে দালাল বন্ধুর একঘেয়ে আলোচনা শুনতে শুনতেও কোন জনবহুল শহরের নোঙরা বস্তীর জঘন্য ড্রেনের পাশে বসে মৃত কুকুরের পোকাধরা মাংস রেষ্টুরেণ্টের গেলাসের জলে খেতে বাধ্য হ'রে শববর্গের আর্তনাদ উপভোগ করি।

শববর্গের প্রকট বীভৎস আর্তনাদ মানসিক বিবর্তনের অজস্র স্তর অতিক্রমের পর ম্লান, বিকৃত গন্ধ ও দুর্বল হয়ে আমার রক্তে অতি ক্ষীণ একটি শব্দে প্রকাশিত হয়।

আমি অত্যন্ত ভীত হই। আমি ভয় পাই, ভয়াবহ, ধূসর, বোবা, এক চোখ কানা কিন্তু নিয়মিত জনৈক আতঙ্ক সমগ্র আমার প্রত্যেকটি অংশকে দুর্নিবাররূপে উপভোগ করতে করতে আমার প্রচণ্ড অনিচ্ছায় আমাকে ধর্ষণ করে। আমার পুরুষ, স্বামী, জনক প্রভৃতি পরিচয় এবং চেতনাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ক'রে তার ধারালো নখ দিয়ে আমার বিশাল স্তন চিরে ফেলে। আমার তেত্রিশ বছরের পুরুষের ভাঙ্গা ব্রণসঙ্কুল গাল যুবতীর মসৃণ, মাংসল গাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেখানে তার মুখের যথেচ্ছ ব্যবহার। তার নোঙরা, লবণাক্ত নিশ্বাস আমার অনুভূতির অবিচ্ছিন্নতা লাভ করতে সক্ষম হয়।

আমার শববর্গের যে প্রকট আর্তনাদ তার ম্লান বিকৃত গন্ধময়, দুর্বল ও ক্ষীণ শব্দ আমাকে আতঙ্ক করে।

আমি অতি দ্রুত আমার ব্যবসা সংক্রান্ত একটি জটিল দুরূহতম কোন হিসেবের দুরাধর্ষ শরীরের ওপর আতঙ্কের উল্লিখিত ভূমিকা নেবার জন্যে মদের সন্ধানে বের হই।

জীবনের গান

মাহবুব-উল-আলম

জিন্দান !

চারধারে উঁচু পাঁচিল। তারও উপর কাঁটা-তারের ঘেরা—ভিতরে একটা ভাপ্‌সা গরম—তার সাথে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতো একটা শোঁকা গন্ধ—নারী-বর্জিত পাষাণ চাপা পুরুষালীর ঘামের আর ক্লেদের।

ভিতরের ফটক খুলতেই আবেদ স্বগত: একবার হাস্‌লে। এই নৃত্যপুরীকে 'জিন্দান' নাম কে দিয়েছিল ? সে রসিক ছিল—সন্দেহ নেই। ওয়ার্ডারের ঠেলা খেয়ে সে ঢুকে পড়তেই বোট্‌কা গন্ধ পেল প্রস্রাবখানার। ওয়ার্ডার নাকে হাত দিলে। মুখখিস্তিও হয়ত করতো ; কিন্তু তার আগেই প্রস্রাবখানা থেকে বেরিয়ে এলো তিনটি বেঁটে মূর্তি। প্রত্যেকেরই একমুখ দাড়ি—তার কিছু সাদা, কিছু কটা, সামান্যই কালো। দেখ্‌লেই বোঝা যায়, এরা তিনটি ভাই এবং চিনতেও দেরী হয় না যে, এরাই তা'হলে পাইকপাড়ার সেই তিন ভাই বহু বৎসর আগে আল্‌গীর চরের দাঙ্গায় যাদের হাতে দশটি লোক খুন হয়েছিল এবং যারা সে যাবৎ এখনও 'যাবজ্জীবন' খাটছে।

ওয়ার্ডার জিজ্ঞেস করলে, 'প্রস্রাবখানা ধোয়া সারা হ'লো তোমাদের ?'

বড়জন বল্‌লে, 'হুঁ।'

সঙ্গে সঙ্গে আর দুইজন মাথা নেড়ে সায় জানালে বহু বৎসরের জেল-জীবন তাদেরকে এক কোষী জীবে পরিণত করেছে—ঐ গাছের ন্যায় যার একমাত্র মূল-শিকড় ছাড়া আর সব শিকড় গেছে কাটা, যার কাণ্ড ছাড়া আর সব ডাল গেছে ছাঁটা এবং তবুও যে দাঁড়িয়ে আছে জমাট বাঁধা অভিশাপের মতো—অথচ আকাশে মাটিতে সংসারে এমন কেউ নেই যে, তার এই অভিশাপের ভাগ নেবে।

তাদের পানে তাকিয়ে আবেদের স্মরণ হ'লো যে, তার হয়েছে মৃত্যুদণ্ড—ফাঁসির আদেশ এবং ফাঁসি দেবে বলেই তাকে এই জেলে আনা হয়েছে। সে চোখ বুঁজে ভাবতে চেষ্টা করলে—তার যদি অন্য রকম হ'তো, হ'তো যদি

যাবজ্জীবন'—উঃ কী ভয়ঙ্কর হ'তো এই তিলে তিলে ক্ষয়ে যাওয়া—সে তা'হলে অমনি দম বন্ধ হয়েই মারা যেতো। তার চেয়ে ঢের ভালো এই এক মুহূর্তে সব শেষ হয়ে যাওয়া। আবেদের ব্যক্তিগত আভিজাত্য-বোধ ছিল ছোট বেলা থেকেই টন্‌টনে। সে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পারলে। যাক্‌, আসামীদের মধ্যেও সে অভিজাত। ফাঁসির আসামীর চোখ দিয়ে সে গর্বিত দৃষ্টি হানলে 'যাবজ্জীবন' আসামীদের প্রতি।

ঠিক সেই মুহূর্তে দূরের কোন মসজিদ থেকে আজানের স্বর ভেসে আসছিল। আবেদ চমকিত হয়ে ঊর্ধ্বে আকাশের পানে তাকালে। পাঁচিল এত উঁচু—কোথাও একটিও গাছের চূড়া নজরে আসছিল না। আবেদ ভাবতে চাইলে, বড় বড় গাছের চূড়ায় সোনালী রোদ ফিকে হয়ে ক্রমে দেখাচ্ছে পেতলের মতো, তামার মতো—হঠাৎ যেন কোথা থেকে ভেসে এলো একটা গোঙানী আওয়াজ—একটা জলার পাশে এক ফালি সড়ক—তার উপর পড়ে গোঙাচ্ছে একটা লোক—ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটছে তার বুক থেকে—সে বুকে বিঁধে আছে প্রকাণ্ড এক ছোরা—এত রক্ত! জলার ওপারে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে কবেকার কতকগুলো প্রাচীন গাছ। তারা যেন মাথা ঝুঁকিয়ে এ দৃশ্য দেখছে আর নীরব ইশারায় দেখিয়ে দিচ্ছে, ঐ কোথায় সড়কের দূর প্রান্তে অপসৃয়মান ঘাতককে। এত রক্ত। আকাশ রাঙা হয়ে গেল সাঁঝের মেঘের বুকে তার ছোঁয়াচ লেগে। ঘাতকের দীর্ঘ ছায়া পড়েছে সেই রক্ত-সমুদ্রে—সে সাঁতার কেটে চলেছে—কিন্তু, সে সমুদ্রের কোথাও কূল নেই।

হঠাৎ সে সজাগ হ'লো, বড় বেঁটে তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। ওয়ার্ডার আবেদকে নিয়ে নির্জন এক কামরায় পুরলে। আবেদের হাতে-পায়ে বেড়ি, প্রতি পদক্ষেপে শিকল বেজে উঠ্‌ছে। তবুও তার চোখে-মুখে ওয়ার্ডারের প্রতি পরম তাচ্ছিল্য ও ঘৃণার ভাব ফুটে উঠ্‌ছে। সে ফাঁসির আসামী। কাল বাদে পরশু তার ফাঁসি হয়ে যাবে। কাকেই বা তার পরওয়া, কাকেই বা তার ভয়। ওয়ার্ডার তা'র মুখের দিকে তাকাতে সাহস করে না। ভয়ে চোখ নামিয়ে নেয়! আবেদ পরম কৌতুক বোধ করে। আচ্ছা, এরা যদি ওকে ফাঁসি না দিয়ে গুলী করে মারতো! ঠিক কপালে তাক্‌ করে একটা মাত্র গুলী—যেন খুলি শুদ্ধ মাথার উপরের অংশটা সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চলে যায়—তা'হলে বেশ হতো—কবন্ধ হয়ে এই ওয়ার্ডারগুলোকে ভয় দেখিয়ে মূর্ছা নেওয়ান যেতো।

তখন তার মনে পড়ল আদালত ঘরকে। জজ্ এজলাসে আসীন—মুখের ভাবটা এমন, যেন তিনি আছেন বলেই সংসারটা চল্ছে। সরকারী উকীল—প্রকাণ্ড তাঁর ভুঁড়ি আর ওষ্ঠ দু'টা ভয়ানক পুরু। আবেদ হাস্‌লে নিজের মনেই। বেটা আসলে চিনেজোঁক, শয়তানের ভায়রা-ভাই। মোকদ্দমাটা এমন পানির মতো সহজ করে বুঝিয়ে দিলে—যেন খুন করাটা পানের পেছনে জর্দা মুখে দেওয়ার মতোই স্বাভাবিক। তারপর জুরারের দল—সব কচি খোকা যেন—নাক টিপলেই দুধ গল্‌বে—ফোরম্যান যেন বাড়ীর সুবোধ ছেলেটি, হঠাৎ বাতি নিভে গিয়ে অন্ধকার পড়লেই যে জুজুর ভয়ে আঁৎকে উঠে! আবেদের মনে হলো এরা সবাই কৃপার পাত্র, সংসারের নেহাৎ সাধারণ মামুলী মানুষ। এবার সে নিজেকে অনুভব করলে সংসারের একা একজন রূপে—অতি অসাধারণ—যার মাথা উপরে উঠে গেছে আকাশ ভেদ করে আর সমস্ত পৃথিবী এবং ইহ-সংসার তার পায়ের তলায় পড়ে আছে। কিন্তু, বড় একা।

মুহূর্তে সে চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো। সে কামরার ভিতর পাইচারী শুরু করে দিলে। ডান হাত দিয়ে কপালে পড়া চুল উপর দিকে ফিরিয়ে দিলে, বাঁ হাত দিয়ে পেছনের চুল মুঠি করে টান মেরে দেখ্‌লে কতখানি লাগে। সে ভাব্‌তে চাইলে তার এ দু'খানি হাত নয়, এর দু'টো আলাদা জীবন। কিন্তু, কাজের শেষে দু'খানি হাত দুই কাঁধ থেকে ঝুলে থেকে বুঝিয়ে দিলে, এই দেহ-বিনে তাদের অন্য আশ্রয় নেই। সে তখন দু'হাত দিয়ে চারিদিকের দেয়াল ধরে ধরে দেখ্‌তে লাগলে। দেয়ালগুলো যেন চুপিসারে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ করছিল। তার ইচ্ছে হয় জান্‌তে, কি তাদের আলাপ। কিন্তু তার হাতের ছোঁয়া পেয়ে তারা গুটি মেরে স্তব্ধ হয়ে থাক্‌লে। এবার হঠাৎ আবেদ দু'হাতের দু'মুঠা দিয়ে তার নিজের গলা টিপে ধর্‌লে। তার দম বন্ধ হয়ে গেল। সে বুঝতে চাইলে দম বন্ধ হয়ে একটা মানুষের মৃত্যু ঘটতে কতক্ষণ লাগে। তার চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল। হঠাৎ সে গলা থেকে মুঠা শিথিল করে খুলে নিলে, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড অট্যহাস্য করে উঠ্‌লে। তার গমক কাঁপুনি লাগিয়ে দিলে সেই ছোট্ট কামরার কড়ি-বরগায়।

তার দরজায় দু'টো টোকা পড়লো। পরক্ষণেই খুট করে তালা খোলার শব্দ। এবার দরজা গেল খুলে। সে সবিস্ময়ে দেখলে ক্ষুদ্র টিপ-বাতি জেলে বড় বেঁটে তার সামনে দাঁড়িয়ে। তার মুখ চারধারের দেয়ালের মতোই ভাব

লেশহীন, কিন্তু চোখ-দু'টোতে বহু দূরের বাতি-ঘরের স্থায় জ্বলছে একটা অনির্বাণ-দীপ-শিখা। আবেদ তার শ্রেষ্ঠত্ব বোধ হারিয়ে ফেল্‌লে। সে কানে শুনতে পেলে নিজের বুকের ধুকধুকানি। তার মনে হলো অসহ্য গরমে যেন সে ঘেমে উঠেছে। সে হাত বাড়িয়ে দিলে। বেঁটে হাত বাড়িয়ে মুঠোর ভেতর সে হাত ধরে নিলে। আঃ, এত ঠাণ্ডা, এত প্রশান্তি!

আবার দুর্বিনীত কেউটের স্থায় তার আত্মাভিমান মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌লো। সে ফাঁসির আসামী, এ পৃথিবীর ভার থেকে মুক্ত হয়ে তার পা' দু'টি শূন্যে উঠে গেছে। কেন সে শান্তি খুঁজতে যাবে যাবজ্জীবন কয়েদীর নিকট যে মরেনি বটে, কিন্তু ভূত হয়ে পচে মরছে পৃথিবীর গহীন পাতালে! সে জোর করে তার হাত ছিনিয়ে নিলে। হঠাৎ সে বোধ করলে অসহ্য পিপাসা। সে ভাবতে চাইলে পিপাসা পেলে লোকে কি করে। জলা আর সড়কের মাঝখানে দিয়ে একটা ঝরনা বয়ে যাচ্ছিল—পানি? কি হবে পানি খেয়ে—মোটে একটি মাত্র দিন তো মাঝখানে! সে ভাবতে চাইলে শেষ আহার সে কবে করেছে, কোথায় এবং কী সে খেয়েছিল! কিছুই মনে করতে পারলে না।

বেঁটে এগিয়ে এসে আবেদের মাথার উপর হাত রাখ্‌লে। আবেদ দু'হাতে চেপে ধরলে সে হাত। সে কিছুতেই আর ছাড়বে না। সে হাতের ভেতর দিয়ে আবেদের মাথার উত্তাপ, মুখের উষ্ণতা, বুকের ধুকধুকানি সবই যেন পাম্প্‌ হয়ে যেতে লাগ্‌লো বেঁটের নিস্তরঙ্গ মনের মধ্যে।

বেঁটে আস্তে আস্তে উচ্চারণ করলে, 'তুমি মুনীম চৌধুরীর পুত্র নিশ্চয়ই।'

আবেদ অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে উত্তর করলে, 'হ্যাঁ।'

বেঁটে বলে চল্‌লো, 'শোন। আমাদের সময় খুব কম। আমি তোমার চেহারার ভিতর মুনীম চৌধুরীকে দেখতে পাচ্ছি। সে ছিল আমার বাল্যবন্ধু, কিন্তু বয়স হয়ে উঠ্‌তেই আমরা দু'জনেই ভালবাসলুম পাড়ার একই মেয়েকে—নাজির চৌধুরীর কন্যা গোল-চমনকে। গোল-চমনের মন আমি যেন পেয়েছিলুম। কিন্তু, নাজির চৌধুরী পছন্দ করলেন মুনীম চৌধুরীকে। সুতরাং তার সাথেই বিয়ে হয়ে গেল গোল-চমনের। নাজীর চৌধুরী গেলেন মারা। তারপর আল্‌গীর চরের সম্পত্তি নিয়ে লাগল শরিকানা বিবাদ। মুনীম চৌধুরীর অবস্থা হলো কাহিল, সবই যায় যায়। শেষ পর্যন্ত সবই নির্ভর হলো লাঠির ওপর। কিন্তু লাঠি কোথায়? মুনীম চৌধুরী ভাড়া করলে গদাইপুরের ইব্রাহিমের দলকে। কিন্তু, বেশী টাকার লোভ দেখিয়ে বিপক্ষেরা তাদেরে

দিলে ভাগিয়ে। একটি মাত্র রাত মাঝে। মুনীম চৌধুরী একদম ভেঙে পড়লেন। সে আশ্রয় করলে গৃহকোণ। কিন্তু সেখানে গোল-চমন সিংহীর মতো ঘাড় ফুলিয়ে দাঁড়ালে। বললে, 'কী! পুরুষ হয়ে তোমার এই অবস্থা? রোসো, আমি এর ব্যবস্থা কচ্ছি।' তারপর সে এসে দাঁড়াল আমার দোর গোড়ায়। তার কথা আমি শুনলুম, তার রূপের মহিমা দু'চোখ ভরে দেখলুম। আমার অন্তর ভিতর-বাহির বেজে উঠলো তার দেওয়া সুরে। পরের দিন লাঠি হাতে আমি যখন আলগীর চরে গিয়ে দাঁড়ালুম, তখন আমার নিজেকে মনে হচ্ছে একাই এক'শ। বিপক্ষকে আমি দেখছিলুম পেঁজা তুলার মতো। পেছনে যেন গোল-চমন দাঁড়িয়ে, তার নিঃশ্বাস আমি অনুভব করছি ঘাড়ের উপর, কানের ভিতর শুধুই শুনতে পাচ্ছি তার মারণমন্ত্র: 'লাঠি চালাও, খুন কর'। তারপর আমার কিছুই মনে নেই। হঠাৎ দেখি সামনে পুলিশ। আর অদূরে দাঁড়িয়ে মুনীম চৌধুরী—ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে আর ভাঙ্গা গলায় বলছে, 'আমি নই, আমার ঘরের লোকই—আমি মুহূর্তে লাঠি চালিয়ে তাকে চিরদিনের জন্য নিরস্ত করে দিলুম। অন্ততঃ তাকে হত্যার জন্যে আমার ফাঁসি হওয়া উচিত ছিল। আমি একরারও করলুম। কিন্তু, আমার ভাইরা সব ভেস্তে দিলে। আমাকে বাঁচাবার জন্যে তাঁদের প্রত্যেকেই স্বীকার করলে যে, সেই মেরেছে মুনীম চৌধুরীকে। ফলে ফাঁসি আর কারুর হলো না। সব তালগোল পাকিয়ে প্রত্যেকেরই হলো যাবজ্জীবন।'

আবেদ সোজা উঠে দাঁড়ালে। বেঁটের চোখে চোখ রেখে বল্লে, 'আমি মুনীম চৌধুরীর ছেলে বটে, কিন্তু গোল-চমনেরও ছেলে। মুনীম চৌধুরীর ভিরুতার কলঙ্ক আমি ধুয়ে মুছে নিয়েছি। মুনীম চৌধুরী মারা গেলেন বটে, কিন্তু আল্‌গীর চর এসে পড়ল গোল-চমনের হাতে। আমার জন্ম হলো। কিন্তু যৌবন বয়স, অসাধারণ রূপ আর আল্‌গীর চরের মতো প্রকাণ্ড সম্পত্তি নিয়ে গোল-চমন পড়লেন ভীষণ বিপদে। দেশ শুদ্ধ লোক—রামা-শ্যামা-যদু-ছমদ আলী, রহমত আল্লী দাঁড়িয়ে গেল তাকে উত্যক্ত করতে। মুসলমানেরা নিকার পয়গাম পাঠাতে লাগলে, হিন্দুরা পাঠাতে লাগলে, হিন্দুরা পাঠাতে লাগ্‌লে আলগীর চর কিনে নেওয়ার প্রস্তাব। মা আমাকে কোলে করে খুব শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন। বল্লেন, 'বিয়ে যদি না হয় হবে বিশ বৎসর পরে, আর আল্‌গীর চর আমি কখ্‌খনো বিক্রী করবো না।' লোকে এর অর্থ বুঝলে। পাইক-পাড়ার তিন তিন ভাইর যে যাবজ্জীবন জেল হয়েছে

বিশ বৎসর পরে তারা খালাস হয়ে বেরিয়ে আসবে। তখন গোল-চমন যা হয় করবেন! বছরের পর বছর ঘুরে যেতে লাগ্লো। আমিও বড় হয়ে উঠতে লাগলুম। মায়ের বুদ্ধির নিকট শত্রুদের কোন ফন্দিই দাঁড়াতে পারলে না। ক্রমে আমি জোয়ান হলুম। তদ্দিনে আমাদের বাড়ীতে আখুনজী সাহেবের বহুদিন চাকরি হয়ে গিয়েছে। মা তাঁকে খুবই বিশ্বাস করেন। হঠাৎ মায়ের কি রকম পেটের পীড়া হলো। তিনি গেলেন মারা। কিন্তু, অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা গেল আখুনজী সাহেবের মধ্যে। যেন তিনি প্রত্যেকেরই নজর বাঁচিয়ে চলতে চান, কেমন যেন সন্দেহ—একটা দ্বিধা প্রকাশ পেতে লাগলো তাঁর আচরণে। হঠাৎ তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন এবং দেখা গেল আল্‌গীর চরেরও যত কাগজ-পত্র সে সঙ্গে উধাও হয়ে গেছে। আখুনজীকে আর পাওয়া যায়নি। কিন্তু কাগজ-পত্রগুলিকে কাজে লাগাতে দেখা গেল আল্‌গীর চরের অপর দাবীদার শামসুদ্দীন চৌধুরীকে। আর আমি কিছু বুঝতে পারার পূর্বেই হঠাৎ একদিন বহু লাঠিয়াল লাগিয়ে শামসুদ্দীন চৌধুরী আল্‌গীর চর দখল করে নিলেন। প্রজারা সব তার পক্ষে যোগ দিলে। আমি আদালত করলুম। কিন্তু, এরা সকলে মিলে প্রমাণ করে দিলে আমি মুনীম চৌধুরীর ছেলেই নই। তারা বল্লে, 'মুনীম চৌধুরীর বিবি ছিল ভ্রষ্টা। বিয়ের আগে থেকেই পাইক-পাড়ার বেঁটে শামুর সঙ্গে তার আস্‌নাই ছিল। দাঙ্গার আগের রাতও সে তার বাড়ীতে গিয়ে তার সঙ্গে কাটিয়ে এসেছিল।' য়ুনিয়ন বোর্ডের কাগজ-পত্র বদ্‌লে দিয়ে তারা আমার জন্মের এমন তারিখ দেখিয়ে দিলে মুনীম চৌধুরীর মৃত্যু থেকে হিসাব করে যাতে আমার পক্ষে মুনীম চৌধুরীর ছেলে হওয়া সম্ভব হয় না। আর তারা রটিয়ে দিলে জেলে হাঙ্গামা করে ওয়াডারের গুলীতে বেঁটে শামু মারা পড়েছে। সুতরাং, আমার পক্ষে হাকিম কোনো যুক্তিই দেখ্‌তে পেলেন না। মোকদ্দমায় আমার হার হলো। আমি গোপনে কবর থেকে তুলে ডাক্তারকে দিয়ে আমার মায়ের লাশ পরীক্ষা করালুম। ডাক্তার বল্লেন, 'পাকস্থলীতে আর্সেনিক বিষ পাওয়া গেছে।' তারপর জলায় জাল ফেল্‌তে গিয়ে জেলেরা একদিন টেনে তুললে আখুনজী সাহেবের শব—গলায় পাথর বাঁধা—তবে মাছেরা এমন খেয়ে ফেলেছিল যে, সারা গায়ে মাংস বল্‌তে কিছু অবশিষ্ট ছিল না। শব সনাক্ত হলো না। কারণ, শামসুদ্দীন চৌধুরী চান না যে, সে শব সনাক্ত হোক। সুতরাং সনাক্ত করবে কে? কিন্তু পায়ের কড়ে-আঙুল কাটা দেখে আমি চিন্‌তে পারলুম। সেই

জল্লাকে সাক্ষী করে আমি প্রতিজ্ঞা করলুম শামসুদ্দীন চৌধুরীকে আমি তিন দিনের মধ্যে হত্যা করবো। সে প্রতিজ্ঞা আমি রক্ষা করেছি।

বেঁটে বল্‌লে, 'আমি মরিনি। তবে হাঙ্গামা করে আমার দণ্ড বেড়ে গেছে।' মনে মনে বল্‌লে, 'এই জেলই এখন আমার ঘর-বাড়ী। আমি এই ঘর-বাড়ী পছন্দ করি। এখানে কাম ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য এমন কোনো রিপু নেই যার পাল্লায় লোক পড়তে পারে। আর এমনই সব কায়দা ক'রে নিয়েছি, আমি যা চাই তাই যোগাড় করে নিতে পারি। কিন্তু তোমাকে ও-সব শোনান বৃথা। তুমি গোল-চমনের ছেলে তোমার বাহ্যিরটাই শুধু মুনীম চৌধুরীর, ভেতরটা সবটুকুই গোল-চমন। আর, তুমি ফাঁসির আসামী? লোকের সুখ-দুঃখ তোমাকে ছুঁতে পারবে কেন?'

কিছুক্ষণ থেমে আবেদকে শুনিয়ে বল্‌লে, 'তোমার মা আর আমি—আমরা পরস্পরকে আকাঙ্খা করেছি বটে, কিন্তু কখনও আমাদের দৈহিক মিলন হয়নি। তবুও আমার তোমার সম্পর্ক পিতা-মাতার সম্পর্ক থেকে কম হতে পারে না।'

এইবার বেঁটে এগিয়ে এসে আবেদকে অবলীলায় কোলে তুলে নিল। আবেদের মনে হলো বেঁটের গায়ে এত শক্তি—এক টুকরা সোলার চেয়ে সে আবেদের ওজন কিছু মাত্র অধিক বোধ করেনি। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আবেদ ঘুমিয়ে পড়লে।

কিন্তু ঘুমের মাঝেও সে কথা বলতে লাগল, 'এই জেল-খানার ফাঁসি-ঘরটাই সব চেয়ে উঁচু। জেলখানার বাইরে সড়কের ওধারে আছে যে-বাড়ীখানা তা'তে আছে এক কুমারী। সে ফুল ভালবাসে, আবেদ তাকে কতদিন ফুল কিনে দিয়েছে। যেদিন কারো ফাঁসি হতো কুমারী সেদিন ভারী ভড়কে যেতো। বাড়ির থেকে কিছুই দেখা যেতো না। তবুও খবরের কাগজে নির্দিষ্ট সময় জেনে কুমারী শুধুই জল-ভরা চোখে সেই ঘরের পানে চেয়ে থাকতো। আবেদ সেই সময়টি তার সঙ্গে কাটাতো। সেদিন বেশী করে ফুল আনতো আর দু'জনে ফুলের বিছানায় বসে সেই আসামীর আত্মার জন্য প্রার্থনা করতো। পরশুও কি সে এম্‌নি কাতর হবে? কে দেবে তাকে ফুল? কে করবে তার সাথে প্রার্থনা?'

বেঁটের চোখ বেয়ে গরম পানি পড়তে চাইলে। বেঁটে বাঁ হাতের পিঠ দিয়ে তাকে ঠেকালে। অতঃপর জাঙ্গিয়ার খুঁট থেকে কালো একটা কলাই-

দানার মতো ডেলা বের করে আবেদকে খাইয়ে দিলে।

পরের দিন আবেদকে দেখা গেল তার কামরায় অজগরের মতো ফুলে ফুলে শুধু ঘুমাচ্ছে।

ফাঁসির দিন সকালে আবেদ জেগে উঠ্‌লে। মুখে এত প্রশান্তি! পৃথিবীর গতি যেন সে শুনতে পাচ্ছে এবং তার কোথাও আবেদের সঙ্গে কোনো বিরোধ নেই। ফাঁসির মঞ্চে যখন তাঁকে নেয়া হচ্ছিল, তখন সে দু'ধারের সকলকে জানাচ্ছিল সম্ভাষণ। যেন সে নূতন মর্যাদা নিয়ে এসেছে জেলখানায়। দৃঢ়-পদক্ষেপে সে গিয়ে উঠলে মঞ্চের উপর। আলোর গায়ে সে যেন দিচ্ছিল চুমো আর হাওয়াকে জানাচ্ছিল সম্ভাষণ। মনের অতল গহ্বরে এই কথাগুলো যেন সে বলে চলেছিল, 'মুহূর্ত আসে জীবনে—যখন মানুষের রচা আইন-কানুন ব্যর্থ হয়ে যায়। তখন মানুষ বাধ্য হয় নিজের হাতেই আইন প্রয়োগ করতে। সাধারণ মানুষ ভয়ে বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে দেখে। কিন্তু, যারা পৃথিবীকে শিখিয়েছে নূতন গতি, জীবনের নবীন গান—তারা এদেরই দলে। কত অল্প পাওয়ার জন্য কত অধিককে তারা ত্যাগ করে, সাধারণ মানুষ কি কখনও তা, চিন্তা করে দেখেছে, আর এই আলোর মধ্যেই কি নেই মানব-জীবনের যা পরম ও চরম?'

নির্দিষ্ট ক্ষণে হঠাৎ কোত্থেকে ভেসে এলো কুমারী কণ্ঠের তীব্র আর্তনাদ। তখন ঘাতকরা তার মুখে-চোখে কালো মুখোস পরিয়ে দিয়েছে, তার দু'হাত পেছন দিকে নিয়ে জোড় করে বেঁধেছে, দুট হাঁটু এবং দুই পা' জোড় করে বেঁধেছে, গলায় ফাঁস পরিয়েছে। তখনও দু'সেকেণ্ড বাকী। আর্তনাদ কানে যেতেই আবেদ চঞ্চল হয়ে উঠলো। বল্লে, 'দেরী কেন! তাড়াতাড়ি।'

পরক্ষণেই সেই পাটাতন ছুটে এক পাশে সবে গেল আর আবেদের দেহ-ভারকে নিয়ে ফাঁসির দীর্ঘ রাশি নীচের গভীর খাদে ঝুলে পড়লো।

সিতারা

শাহেদ আলী

রাতদিন লিখেই চলে ডঃ সাবের। অদ্ভুত মানুষ ও। সারা জীবন ধরে কত কী জোগাড় করেছে সাবের ; এবার এসেছে তারই নির্যাস নিয়ে নতুন একটা কিছু দেয়ার পালা। দলিল ও প্রমাণপঞ্জীর স্তূপ থেকে ধীরে ধীরে আকাশ নিচ্ছে—এক উত্তেজনাময় নতুন কাহিনী। পাতায় পাতায় সাবের ছড়িয়ে যাচ্ছে তারই অপূর্ব রোমাঞ্চ।

ডঃ সাবের গবেষক। ডঃ সাবের জ্ঞানের রাজ্যে নতুনের সন্ধানী। নতুন সূর্যের আভায় পুরানো আকাশকে রঞ্জিত করতে চায় সে।

বছর দিন হলো ডঃ সাবের বাড়ী ফিরেছে। পঁচিশ বছর বয়সে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল। আজ তার বয়স পঞ্চাশ। চুলে পাক ধরেছে। জোয়ানীকালের চেহারার জৌলুস প্রৌঢ়ত্বে এসে তাকে নতুন মহিমা দিয়েছে। গম্ভীর উদাসীন প্রকৃতির মানুষ—আজও অবিবাহিত। দুনিয়ার নানা দেশে ঘুরে ঘুরে সে কাটিয়েছে জীবনের এতগুলো বছর।

শিশুকাল থেকে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল সাবেরের। বাপ-মা, শিক্ষক, আত্মীয়-স্বজনদের প্রশ্ন করে করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতো সাবের। ‘কেন’ আর ‘কী’র জবাব দিতে গিয়ে ওরা হয়রান হয়ে যেত। একটু বয়স হওয়ার পর থেকে সাবের এক নতুন প্রশ্নের সম্মুখীন হলো : দুনিয়া কি করে পয়দা হলো, আর মানুষ কী করে এলো পৃথিবীতে ? ভেবে কূল-কিনারা পেতো না সাবের। বাচ্চা বয়স থেকে কতজনকে প্রশ্ন করেছে, কারো জবাব তাকে খুশী করতে পারেনি। শিক্ষকদের জিজ্ঞেস করেছে, জবাবে কেউ বলেছে জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে ধর্মের কথা। কেউ এই রহস্যের মীমাংসা করতে চেয়েছে বৈজ্ঞানিক মতবাদের দ্বারা। কোনো ব্যাখ্যাই গ্রহণ করতে পারেনি ও। তার মনে হয়েছে, এর কোনোটাই সাচ্চা নয় ? খাঁটি সত্য আজও খুলতে পারেনি কেউ। নেকাবের অন্তরালের সেই আসল সত্যিকে উদ্ঘাটন করার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়েই সে বেরিয়ে পড়েছিল ঘর ছেড়ে।

পঁচিশ বছরের মতো সে ঘুরে বেড়িয়েছে দেশে-বিদেশে। দুনিয়ার সেরা বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সে আলাপ করেছে এই নিয়ে। দার্শনিক, ধর্মনেতা ও পীরদরবেশের সহবতে কাটিয়েছে সে বছরের পর বছর; হিমালয় ও তিব্বতের হিম-গুহায় সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মাসের পর মাস কাটিয়েছে। দুনিয়ার কোনো একটা মিউজিয়াম বাদ যায়নি।

প্রত্যেকটা ধর্মের কেতাবে কী আছে, তা জানার জন্যে সে ঐ সব কেতাবের আদি ভাষা শিখেছে; কঠোর সাধনায় অনেক মরা ভাষাকে আয়ত্ত করেছে। প্রোটোপ্লাজম থেকে দরিয়ার এক-কোটি প্রাণী—এবং প্রত্যেকটা স্তরের দলিল প্রমাণ সংগ্রহ করতে গিয়ে তাকে ছুটে যেতে হয়েছে পৃথিবীর এক দেশ থেকে আর এক দেশে—এক সমুদ্র থেকে আর এক সমুদ্রে। পাথর ভেঙে ভেঙে বার করতে হয়েছে লোপ-পেয়ে-যাওয়া নানা রকম লতাপাতা ও প্রাণীর ফসিল, জীব-জানোয়ার, এপ্‌ম্যান্ আর প্রাগৈতিহাসিক মানুষের কংকাল খুঁজে খুঁজে বেড়িয়েছে জার্মানী-ফ্রান্সের গুহায়-গহ্বরে। তারপর, অপেক্ষাকৃত হাল আমলের কথা—মিসর, চীন, ব্যাবিলন, মেক্সিকো, মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার বিত্তাবশেষের মধ্যে সে খুঁজে ফিরেছে মানুষের এগিয়ে চলার ইতিহাস।

পঁচিশ বছর ধরে সাবের এই সাধনাই করেছে। পৃথিবীর সব বিজ্ঞানী-দার্শনিক-ধর্মনেতা ও ফকির-সন্ন্যাসীর উত্তরাধিকার তার আয়ত্তের মধ্যে। নানা দুর্গম অঞ্চল তাকে পথ করে দিয়েছে, দুর্বোধ্য গ্রন্থ ও বোবা পাথর কথা কয়েছে তার সাথে। সংগ্রহ তার প্রচুর, দলিল-প্রমাণ তার অজস্র। সে সবের উপর ভিত্তি করেই সে লিখে চলেছে এক নয়া কাহিনী—পৃথিবীর নতুন ইতিহাস। পৃথিবীতে জীব-মানব আবির্ভাবের নতুন বিবরণ, তারপর মানব-সভ্যতার অগ্রগতির এক রোমাঞ্চকর কেচ্ছা।

সাবেরের চোখের উপর থেকে রহস্যের যবনিকা সরে গেছে। সে আবিষ্কার করেছে, জীব-জানোয়ার ও দুনিয়ার পয়দায়েশ সম্বন্ধে ধর্মের যে ব্যাখ্যা এতদিন চলে এসেছে, এ নিছক উপকথা মাত্র। এর পেছনে কোন সত্যি নেই, আছে অন্ধ মানুষের স্বাপ্নিকতা। তেমনি ধরনের আর এক উপকথা ডারউইন, ওয়ালেস ও লেমার্ক গোষ্ঠীর মতবাদ, এর বুনিয়াদও সত্যের উপর নয়। বিজ্ঞানের নামে এক নতুন অলীক কাহিনীর দ্বারা ওরা আচ্ছন্ন করতে চায় মানুষকে। সাবের দলিল-প্রমাণ দিয়ে দেখাবে—এ দু'দলই মিথ্যার

পিছনে ঘুরেছে। নেহাত কল্পনাকেই সত্য বলে দুনিয়ার মানুষকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছে ওরা, সত্যের ঘোমটা খুলে ফেলে সে আজ দেখাবে তার স্বরূপ। মানুষের এতদিনকার চিন্তার ও আকিদার বুনিয়াদকে সে পাল্‌টে দেবে আজ। খ্যাতির তার সীমা নেই। মৌলিকতায় তার জগৎ চমৎকৃত। ইউরোপ, আমেরিকার সবগুলো সেরা কাগজ তার লেখা লুফে নিয়েছে, অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় তাকে দিয়েছে ডক্টরেট খেতাব। মূল থিসিসটি ছাপা হলে হয়তো একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়ে যাবে চিন্তা-জগতে। আসন্ন সাফল্যের ভরসায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে ডঃ সাবের।

নীরব নির্জন ঘর। বই-কেতাব, দলিল-পত্তর, নোট, খাতা ও মানচিত্রে স্তূপীকৃত। ও ঘরে কারো প্রবেশাধিকার নেই। বাইরের সংসার থেকে নিজেকে তুলে নিয়ে এসে নিমজ্জিত করেছে এই ঘরের ক্ষুদ্র পরিবেশের মধ্যে। সিগারেটের পর সিগারেট টানে আর একটানা কলম চালিয়ে যায়। দুই ভল্যুমের খসড়া খতম হয়েছে, তেসরাটিও খতম হওয়ার পথে। এই ভুল্যমে তার বক্তব্য শেষ হবে।

লিখতে লিখতে হাত যখন শ্রান্ত হয়ে আসে, মাথা তুলে সে তাকায় জানালার ফাঁক দিয়ে। দিন-রাত্রির বিচিত্র পৃথিবী তার চোখের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলে। পাখীর কোলাহল, আকাশের চাঁদ ও নক্ষত্র তাকে আকর্ষণ করে না—এমনকি, তরুণীর সৌন্দর্য—তাও তার কাছে অর্থহীন। মাঝে মাঝে তার চোখে পড়ে, পাশের বাড়ীর দোতলার জানালায় দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে তন্ময় হয়ে চেয়ে আছে তার দিকে। সাবেরের মন মুহূর্তে পাণ্ডুলিপিতে ফিরে আসে।

তবুও পুরুষের মন। সাবেরের মনে পড়ে, মেয়েটি এমনি কোরে রোজই তার দিকে চেয়ে থাকে। মেয়েটি নাকি বিদুষী, পড়াশোনা অজস্র। কয়েকবারই মেয়েটি দেখা করতে চেয়েছে তার সঙ্গে। সাবেরের গবেষণার বিষয় নিয়ে আলাপ করতে চায়। কিন্তু ডঃ সাবের মুখ টিপে হেসেছে। সাহস কম নয়, সারা দুনিয়া তার থিসিসের জন্য উৎসুক হয়ে আছে। পৃথিবীর পণ্ডিত সমাজ পর্যন্ত তার লেখা পড়ে বুঝে উঠতে পারছে না। আর একটা সামান্য মেয়ে, তার সাথে আলাপ করার সময় কোথায় তার! কোনো পাত্তাই দেয়নি সাবের।

তেসরা ভল্যুম শেষ করার পর একটা অপূর্ব আনন্দের উত্তেজনা তাকে

চঞ্চল করে তোলে—সৃষ্টির আনন্দ, সে আনন্দ আর বুকে চেপে রাখতে পারছে না ডঃ সাবের। কাউকে খুলে বলা চাই, কাউকে সে খুশীর শরীক করা চাই, নইলে যেন নিস্তার নেই ওর। তার মনটা বড় লালায়িত হয়ে ওঠে—এমন একজনকে যদি পেতো, যে তার মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে শুনে যাবে, আর ডক্টর সাবের একের পর এক উলটিয়ে যাবে না-পড়া ইতিহাসের পাতা।

এক সন্ধ্যার অন্ধকার। পাণ্ডুলিপির উপর চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে সাবের। হঠাৎ তার সামনে একটা মেয়েকে দাঁড়ানো দেখে বিস্ময়ে সে অবাক হয়ে যায়। অপূর্ব সুন্দর একটি মেয়ে।

ডাঃ সাবেরের জিজ্ঞাসু চোখের দিকে চেয়ে মেয়েটি স্মিত হেসে বলে,—সালাম, আমি সিতারা বেগম, আপনার প্রতিবেশী।

এবার চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে যায় ডঃ সাবের। আশ্চর্য! সাবের নিজের বিস্ময় লুকাতে পারে না,—তশ্‌রিফ রাখুন।

—ইণ্টারভিউর কার্ড কিন্তু পাইনি। রসিকতায় মধুর হয়ে ওঠে সিতারা, মেয়ে মানুষ, জানান না দিয়েই এসেছি। কী কেলেংকারী ভেবে দেখুন।—একটু হেসে আবার বলতে শুরু করে, আরো দু'বার আলাপ করতে চেয়েছিলাম, তখন কিন্তু পারমিশন দেননি। এবার আর অনুমতির তোয়াক্কা রাখিনি—হাসতে হাসতে মেয়েটি নিজের বইটি টেবিলের উপর রেখে দিয়ে চেয়ারে বসে পড়ে।

—আমি লজ্জিত।—সাবের বিনয় প্রকাশে দেরী করে না। লেখাটা তো শেষ হলো মাত্র দু'দিন। অবসরই ছিল না আমার।

মেয়েটি কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে থাকে ডঃ সাবেরের গম্ভীর সলজ্জ মুখের দিকে। একবার বলে, আপনার লেখা অনেক পড়েছি, সব নামকরা জারনালেই তো বেরুচ্ছে। দুনিয়া জোড়া কত আপনার নাম! সত্যি আপনার সঙ্গে কথা বলতেও ভয় পাই।

—না, না। এ আপনার ভুল ধারণা।—ডঃ সাবের বাধা দেয়, আমিও মানুষ, সংকোচের কোন কারণ নেই।

—দেখুন, বই ছাপা হলে তো সকলেই পড়ে। মেয়েটি আড়চোখে ডঃ সাবেরের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে, ছাপা বই সাধারণের সম্পত্তি। ছাপা হওয়ার আগে পাণ্ডুলিপি পড়ার অধিকার কে পায় জানেন? লেখকের

সবচাইতে আপনজন। আমি তো আর সে দাবী করতে পারি না—তবে, আপনার পাণ্ডুলিপিটাই একবার চোখ বুলাতে আমার ভীষণ ইচ্ছে যায়। আমিও চিন্তা করি কি না এই নিয়ে।

—চিন্তা করেন এই নিয়ে? তাহলে তো অধিকারও আপনার নিশ্চয় আছে। —উৎসাহে শিশুর মত চঞ্চল হয়ে ওঠে ডঃ সাবের, তা ছাড়া এতো হচ্ছে আমাদের জাত-স্বভাব, কোন কিছু লিখেছি কি কাউকে না পড়িয়ে, না শুনিয়ে সোয়াস্তি নেই।—একটু থেমে গভীর আত্ম-তৃপ্তির সঙ্গে শুরু করে সাবের—জানেন, জীব-জানোয়ার আর পৃথিবী সৃষ্টি সম্বন্ধে আমরা যা শুনে এসেছি সবই গাঁজাখুরী গল্প। ধর্ম বলুন আর ডারউইন গোষ্ঠীর বিজ্ঞান বলুন, এই ব্যাপারে সকলেই অন্ধ। ওদের গাঁজাখুরী গল্প থেকে আমি মুক্তি দিতে চাই মানুষকে। সৃষ্টি-রহস্যের ফয়সালা আমি করেছি, নূতন করে লিখেছি তাদের ইতিহাস। সে ইতিহাস সকলের আগে আপনিই পড়বেন, এতো খুশীর কথা, আনন্দের কথা!

ভল্যুম তিনটা সিতারা বেগমের দিকে এগিয়ে দিল সাবের। সিতারা পয়লা ভল্যুম নিয়ে পাতা উল্টাতে শুরু করে। সাবের এবার চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসে। উৎসুক চোখের দৃষ্টি তার সিতারার মুখের উপর। জগদ্বিখ্যাত মনীষী ডঃ সাবের; তার সারা জীবনের সাধনার ফল লিপিবদ্ধ হয়েছে পাণ্ডুলিপিতে; সেই পাণ্ডুলিপি পড়ার সৌভাগ্য পেয়েছে একটি অখ্যাত মেয়ে; তারই অহংকারে যেন ফুলে ফুলে উঠছে মেয়েটি। এমন খোস-নসীব আর ক'টি মেয়ের কপালেই বা ঘটে! ধন্যি হয়ে গেছে সিতারা!

সিতারা পাতার পর পাতা উল্টিয়ে যাচ্ছে। বিস্ময়ের সংগে লক্ষ্য করে ডাঃ সাবের, সিতারার মুখের হাবভাব, কখনও কুঁচকে যাচ্ছে সিতারার কপাল, কখনও দুর্বোধ্য হাসিতে নেচে উঠছে তার ঠোঁট দুটো।

গম্ভীর হয়ে ওঠে ডঃ সাবের। পয়লা ভল্যুম খতম হয়ে গেছে এরই মধ্যে। সিতারা দোসরা ভল্যুম পড়ছে। আজব মেয়ে বটে সিতারা। মুহূর্তে মুহূর্তে রং বদল হচ্ছে তার চেহারার। ঢেউ খেলানো ভুরু, বাঁকানো ঠোঁট, ফিক করে হাসি,—সাবেরের ইচ্ছা হয় কারণ জিজ্ঞেস করে তার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে চুপ করেই থাকে। যাই হোক, মেয়ে মানুষ তো, বিদ্যাবুদ্ধি আর কতই বা। হয়তো দুরূহ যুক্তিজাল আর গভীর তত্ত্বের মধ্যে ঢুকতেই পারছে না মেয়েটি। এবার সিতারার উপর ওর কেমন যেন মায়া হয়। ওরা বড় ভাসা ভাসা, বড়

অগভীর—দৌড় তো এদের উপন্যাস আর কবিতা পর্যন্ত। চিন্তার জটিল ক্ষেত্রে পা বাড়াবে কি ? সে সামর্থ্য ওদের নেই।

দ্রুত পড়ে চলেছে সিতারা। প্রহরের পর প্রহর গড়িয়ে যাচ্ছে। তেসরা ভল্যুমও প্রায় শেষ। ডঃ সাবের তেমনি চেয়ে আছে তার মুখের দিকে—বার বার তেমনি বদলাচ্ছে সিতারার মুখের রং।

বইটি শেষ করে টেবিলের উপর এবার রাখলো সিতারা। তারপর একটু ঘুরে সে তাকায় ডঃ সাবেরের মুখের দিকে। রাত নেই বেশী। সূর্যোদয়ের আগেই ফিরতে হবে সিতারাকে। ডঃ সাবের সিগারেটের ধুঁয়া ছাড়তে ছাড়তে প্রশ্ন করে, পড়লেন ?

—জী।—এক চিল্‌কা হেসে জবাব দেয় সিতারা। ডঃ সাবেরের মুখে আত্মতৃপ্তির ভাব ফুটে ওঠে।

—আপনি কিন্তু ভারী চমৎকার লিখেন। —সিতারা যেন হঠাৎ প্রশংসায় দরাজ দিল হয়ে ওঠে—এত আমোদ পেয়েছি পড়ে!

—ধন্যবাদ। আপনারা আছেন, তাই তো আমাদের লেখা সুন্দর হয়। রসিকতায় ডঃ সাবের হাল্‌কা হয়ে ওঠে,—পরশমণির নাম শুনেছেন ? পরশমণি, এর ছোঁয়ায় লোহা সোনা হয়ে যায়। আমাদের লেখায় যা কিছু সোনা ফলে সে তো আপনাদেরই ছোঁয়ায়।

—ওমা, আপনি তো দেখছি স্তুতিবাদেও কম যান না! শরমে যেন একটুখানি রাঙা হয়ে ওঠে সিতারা। সত্যি, আপনার বইটি এতো ভালো লাগলো, মনে হলো যেন উপন্যাস পড়ছি।

—দেখুন, জীবনে সাধনা চাই, সাধনা।—ডঃ সাবের উঠে সোজা হয়ে বসে গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সংগে বল্লে, সারা জীবন তো সাধনাই করলাম, তারই ফল এ আবিষ্কার। সত্যকে সহজে পাওয়া যায় না।

সিতারার চাহনী এবার তীর্যক এবং ধারালো হয়ে ওঠে। চোখ দুটোতে দুষ্টামী ভরা হাসির ঝিলিক, অদ্ভুত আপনাদের শক্তি। কল্পনাকে সত্য বলে প্রমাণ করার জন্য যখন দুনিয়ার সব যুক্তি এনে সমাবেশ করেন, ভারী আমোদ লাগে কিন্তু।

—মানে ? —চোখের উপর কপালটায় ঢেউ খেলিয়ে প্রশ্ন করে ডঃ সাবের। সংগে সংগে নিজের অধীরতা সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে ওঠে। এবার একটা মোলায়েম হাসি আর প্রশ্রয়ের উদারতা ছড়িয়ে পড়ে তার মুখে। আসলে

মেয়ে জাতটাই বড়ো হাল্কা। নিজের সীমাবদ্ধ জ্ঞান দিয়ে সে বিচার করছে বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ডঃ সাবেরের লেখার। কেমন যেন তার করুণা হয় সিতারার প্রতি। জবাবের অপেক্ষা না করে আপন মনে আবার বলে—আপনি বুঝতে পারেননি।

সিতারা হেসে ফেলে। পাণ্ডিত্যের হিমাচল নড়ে উঠেছে সামান্য ধাক্কায়। পঁচিশ বছরের সাধনার নিশ্চিন্ত ভিত্তি থর থর কেঁপে উঠেছে।

—ডক্টর সাহেব; সাবেরের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে হঠাৎ নির্মমতার পরিচয় দেয় সিতারা—আপনারা কল্পনা রোমাঞ্চকর, ভাষা প্রাঞ্জল, যুক্তি মজবুত তবে—তবে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে ডক্টর সাহেব, সত্যের সংগে এর কোন মিল নেই। আপনিও আর একটা নতুন কাহিনী সৃষ্টি করছেন। অবশ্য এই নতুনত্বের জন্য ইতিহাসে স্থান পাবেন আপনি, যেমন পেয়েছেন ডারউইন, ল্যামার্ক ও ওয়ালেসের দল। তবে এ-ও অলীক।

ডক্টর সাবের একেবারে থ' বনে যায়। তামাম দুনিয়া ওকে নিয়ে মাতামাতি করছে, জার্নেল তার কয়েকটি লেখা পড়েই সারা দুনিয়া তারিফে শতমুখ; সারা জীবনের সাধনায় আঁধার অতীতের ওপর থেকে সে সকল আবরণ তুলে ধরেছে। আর, একটি সামান্য মেয়ে কিনা সব কিছু নস্যাৎ করে দিতে চায় এক কথায়! ভিতরে ভিতরে অধীর হয়ে ওঠে ডক্টর সাবের; তবু গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলে—দেখুন অধিকারভেদ বলে একটা কথা আছে। আপনার কথার কোন দাম দিতে আমি অক্ষম।

—অধিকার? অধিকারও আমার একটা আছে বৈকি।—সিতারা মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকে। এবার এক বলিষ্ঠ আওয়াজ ধ্বনিত হয়ে ওঠে তার কণ্ঠে—অনুমানই আপনার কাছে সত্য। অনুমানের কথাই তো লিখেছেন ডক্টর সাহেব! আর আমি—আমি নিজের চোখে সব দেখেছি। সব কিছুই ঘটেছে আমার চোখের নীচে! কিন্তু কই, আপনার লেখায় তো তার কিছুই নেই, কিছুই পেলাম না ডক্টর সাহেব।

ডক্টর সাবের এবার স্থিরনিশ্চিত হয়—সিতারা পাগল। পাগলের পক্ষেই এমন কথা মানায়। একটা আমোদের হাসি খেলা করতে থাকে ডক্টর সাবেরের মুখে।

সিতারা বুঝতে পারে। স্নিগ্ধ হেসে নিজের বইটি হাতে নিয়ে বলে—আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না? আমি কিন্তু বিশ্বাস করাতেও পারি। হঠাৎ তার

চোখের দৃষ্টি ডক্টর সাবেরের চোখের ওপর রেখে কলকলিয়ে ওঠে সিতারা—আচ্ছা, ডক্টর সাহেব, আপনি চোখে চোখে তাকান তো!

ডক্টর সাবের অবাক হয়।

—হ্যাঁ, তাকান।—সিতারা এবার প্রায় আক্রমণাত্মকভাবে বলতে থাকে—যে ইতিহাস উদ্ধার করতে পারেন নি, তার সব ঘটনার জীবন্ত মিছিল দেখতে চান তো তাকান আপনি, তাকান না;—মুখখানা ডক্টর সাবেরের মুখের কাছে এনে জোর দিয়ে উচ্চারণ করে সিতারা।

ডক্টর সাবের চোখ ফিরিয়ে নেয়। কী অদ্ভুত অসহ্য উজ্জ্বলতা মেয়েটির চোখে।

সিতারা হেসে ফেলে। রাত শেষ হয়ে এসেছে।—এল্‌বামটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে যায় সিতারা—আপনার সংগে কথা বলার সুযোগ দিলেন, এজন্যে শুকরিয়া। অনেক সময় নষ্ট করলাম, মাফ করবেন, সালাম জানিয়ে সিতারা পা বাড়ায় বাইরের দিকে।

ডক্টর সাবের দাঁড়িয়ে যায়—হাসলেন আপনি; প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব মত থাকা উচিত।—সিতারা ঘুরে দাঁড়ায় ওর দিকে, ওর হাতের বইটি দেখে হঠাৎ অত্যন্ত উৎসুক হয়ে ওঠে ডক্টর সাবের. আপনার হাতে এটি কি বই?

—এটি? ডান হাতে বইটি তুলে ধরে স্মিত হাসিতে মনোরম হয়ে ওঠে সিতারা—আমার একটা পাগলামি। আপনাকে বলিনি, ফটো তোলা আমার একটা বাতিক। কতো ফটো যে তুলেছি। অসীম শূন্যে পৃথিবীর আবির্ভাব মুহূর্তটি—কল্পনা করতে পারেন ডক্টর সাহেব? তাও আমি ধরে রেখেছি ফিল্মে। তারপর জীব মানবের আবির্ভাব—কোন দৃশ্যই দৃষ্টি এড়ায়নি আমার, সব কিছুই ক্যামেরায় ধরে রেখেছি। এটি তারই এল্‌বাম। মেয়ে মানুষ—কোন কাজ কম তো নেই; বসে বসে যত সব দুষ্টুমি করেছি আর কি!

একটা অবিশ্বাসের হাসি ফুটে ওঠে ডঃ সাবেরের ঠোঁটে। কথায় কথায় কেবল হেঁয়ালী মেয়েটির। তবু এল্‌বামটা দেখার জন্য তার একটা অদম্য আকাংখা জাগে। না জানি কি রয়েছে এল্‌বামটিতে! একটু মেহেরবানী করুন, আপনার এল্‌বামটা একটু দেখতে পারি?

সিতারার মুখে একটু ক্ষীণ হাসি খেলা করতে থাকে; বইটা দু'হাতে বুকের উপর চেপে ধরে বলে—না, এ আমি কারো হাতে দিই নে। গলার স্বর গম্ভীর হয়ে ওঠে সিতারার—এর শিল্পী আমি, দর্শকও আমি।

—কেন? দেখতে দেবেন না কেন? —ডক্টর সাবেরের কণ্ঠে অধৈর্য প্রকাশ পায়—এ আপনার সংকীর্ণতা।

—বারে।—সিতারার মুখখানা এক দুর্বোধ্য রহস্যে মনোরম হয়ে ওঠে, আমরা সংকীর্ণ বলেই তো আপনারা কবি, আপনারা বিজ্ঞানী, আপনারা দার্শনিক। যে নারী নিজেকে ঢাকে না, তার দিকে তাকায় কে, বলুন। নিজেকে ঢেকে রাখি বলেই তো এত আকর্ষণ। নইলে, এই এল্‌বামে চোখ বুলানোর মানে জানেন? কল্পনার অবসান, ডক্টর সাহেব, চিরদিনের জন্য কল্পনার অবসান। তখন কোথায় পাবো আপনার শক্তির পরিচয়? অমন রোমাঞ্চকর কল্পনা? মিথ্যেকে সাচ্চার চাইতের সুন্দর করার ক্ষমতা? থাক আপনার অনুরোধ রাখতে পারলাম না বলে কিছু মনে করবেন না—সিতারা পা বাড়ায় দরজার দিকে।

—না, না। আপনাকে যেতে দেব না এল্‌বাম নিয়ে। —প্রায় চিৎকার করে ওঠে ডক্টর সাবের—এ এল্‌বাম আমি দেব না। ইয়ারকি পেয়েছেন? দাঁড়ান, আপনার গাঁজাখুরীর একটা হেস্ত নেস্ত না করে ছাড়ছি নে—সিতারার পেছনে পাগলের মত ছুটতে গিয়ে হঠাৎ একটা হোচট খায় ডক্টর সাবের······ আশ্চর্য। সে শুয়ে আছে তার নিজের বিছানায়। বইয়ের পাণ্ডুলিপি তিনটি পড়ে আছে টেবিলের নীচে। বিল্লির কাজ নিশ্চয়। জানালার ফাঁক দিয়ে সে বাইরের দিকে তাকায়। ভোরের সিতারাটি চেয়ে আছে তার দিকে, আর মুচকি মুচকি হেসে যেন বলছে: সব দেখেছি ডক্টর, সব দেখেছি, কিন্তু তোমাকে কিছুই বলবো না।

না কান্দে বুবু

সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ্

সোনাকান্দি হতে মাঝের হাট দূর নয়। কিন্তু বর্ষায় নৌকা ছাড়া গতি নেই। তখন এ-পথটা অতিক্রম করতে গোটা একদিন লেগে যায়। এ-নদী সে নদী; এ-খাল সে নালা। স্যাঁৎ-সেঁতে গন্ধ পানির আর মাছের, কচুরী পানার আর ধানের; নৌকায় ভরাট গন্ধ ভেজা কাঠের, ডহরের পানির আর খাম্বুরী তামাকের। আকাশের বর্ষাশেষের শ্রান্ত মেঘ নিস্তেজভাবে ঘেরে। হাওয়া নেই। পালশূন্য শ্লথগতি পানসী-খাসী-গয়না ও ডিঙ্গির, আর তেজের গরম নাই। এত পানি আর দিগন্ত-প্রসারী খোলামেলা প্রসারতার মধ্যেও দমবন্ধ করা ভাব। হঠাৎ কখনো-কখনো একটু হাওয়া যদি আসে চুড়ির মতো মিহিন ঢেউ তুলে পানিতে, বড় ভালো লাগে। দেহ শীতল হয়।

নৌকা আর নদী আর প্রসারতা আর মেঘ কেউ দেখে না। পথটা বাড়ীর: এ-বাড়ীর পথ বদলায় না। এ-বাড়ীর পথ জীবন। কেবল কখনো শ্লথগতি, হাওয়া নেই বলে পাল ওড়ে না; আবার কখনো ঢেউ ভাঙ্গানো তেজময় গতি, পাল ফুলে থাকে হাওয়া আছে বলে। কখনো ঘুম পায়। কখনো খড়ের বিছানায় শুয়ে ছই-এর ভেতরে ঢুলতে থাকা থলে হুকার পানে তাকিয়েই থাকতে হয়। মাঝি ভাবে না, মাঝির ছেলেটা ভাবে না। যে-মেঘ নিস্তেজ, সে-মেঘ দেখে না; যে-পানিতে সে-নিস্তেজ মেঘের ছায়া সে-পানি দেখে না। কখনো-সখনো নড়ে বসে কেবল খাম্বুরী তামাক খায় আর তার কড়া গন্ধ ভেসে আসে ছইৎএর ভেতর।

এ-পথ বাড়ীর।

আফতাব ভাবে, চার বছর। চার বছর পরে বাড়ী যাচ্ছে। কলাপাতা ঘেরা আম-জাম গাছের ধারে, খাল-বিল নালা-ডোবার পাশে শত-সহস্র ঘন

বসতির মধ্যে বসবাস করা লোকেদের জন্য চার বছর পরে বাড়ী যাওয়াটা বড় কথা। সে-কথা পুঁথির কাহিনীর মত দেশময় ছড়িয়ে পড়ার মত অসাধারণ, নাড়ী ছেঁড়ার মতো গায়র-মামুলী।

—আফতাব মিয়া দ্যাশে থাকে না, দ্যাশে আসে না। আফতাব মিয়া চাইর বছর দ্যাশে থাকে না, দ্যাশে আসে না। শহরে থাকে। হেই বড় শহর। আফতাব মিয়া গাড়ী-ঘোড়ায় চলে। আফতাব মিয়া সিদ্ধ ভাত খায়, বরফের মাছ খায়। আফতাব মিয়া রঙে আছে।

—খেদু মিয়া দাঁতের মাজন বিক্রী করে ঢঙ করে বক্তৃতা দিয়ে, হাত সাফাই-এর ম্যাজিক দেখিয়ে। খেদু মিয়া সে-শহরের খবর রাখে। আফতাব মিয়া সেই শহরে থাকে। চার বচ্ছর আফতাব মিয়া দ্যাশে থাকে না, দ্যাশে আসে না।

—শহরে থাইকা আফতাব মিয়া বাড়ীৎ কেবল টাকা পাঠায়। বাড়ীৎ আছে নুনা মিয়া, তার বুড়া বাপ। বুড়া জমিজমা দ্যাখে, আর বাতের ব্যথায় কঁকায়। চোখে ছানি পড়ছে; কিন্তুক বুড়া মানে না সে-কথা, স্বীকার করে না সে-কথা। মায়ের কবর পুকুরের পাড়ে গাব গাছটার তলে।

—অফতাব মিয়া শহরে থাকে; কিন্তু নুনা মিয়া দ্যাশে থাকে। পোষ্ট কার্ডে চিঠি ল্যাখে ছেলের কাছে আর ছেলের গল্প করে। আর নুনা মিয়া আফসোস করে। ছেলেডা আসে-আসে বলে, কিন্তু আসে না।

—আফতাব মিয়া কিন্তু কাবেল ছেলে। চাকরী করে আর বই বাঁধানোর দোকান চালায়। তাই আফতাব মিয়া দ্যাশে আসে না। আফতাব মিয়ার সময় নাই, ছুটি নাই। আফতাব মিয়া চাকরীও করে ব্যবসাও করে।

দেশের বাড়ীতে আর আছে বুবু। মানুষের জীবনে কী হয় বোঝা যায় না। বুবুর বিয়ে হলো, বুবু নাইওর এলো, বুবু শ্বশুর বাড়ী গেলো। বুবু ঘোমটা খুললো, বুবু সংসার গড়লো আরেক মানুষের ঘরে, বুবুর ছেলে-মেয়ে হলো। বুবু মাছ ছাড়লে পুকুরে, আম গাছে আম গুণলো। সন্ধ্যার পরেও বুবু কুপি হাতে খড়ম পরে গোয়ালে গরু দেখলো; মুরগীর খোয়াড়ে ঝাপ আছে কিনা দেখলো। তারপর বুবুর দাড়িওয়ালা স্বামীটা মারা গেলো।

—জোত-জমি আছিল। সেয়ানা লোকডা। ধড়াস্ কইরা মারা গ্যাল।

মস্ত বড় মন্দ মানুষ, হেই জোয়ন। কাৎলার মতো মুখ হা কইরা ধড়াস করি মারা গ্যাল চক্ষের সামনে।

বুবু আর মাছ ছাড়ায় না, আম গাছে আম গোণে না।

—মুনা মিয়ার মাইয়া সাদা শাড়ী পরে হিন্দুগো মতো। চোখে ছানি পড়া বুড়া বাপের সংসারডা ছাখে। মুনা মিয়ার মাইয়ার নাকফুলের গর্তে বাঁশের ছিলার টিপি। মুনা মিয়ার মাইয়ার চলনে-বলনে আর জান নাই। ছয়ডা পোলা-মাইয়া রাইখা তার স্বামীডা ধড়াস কইরা মারা গ্যাল চক্ষের সামনে।

দুই-এর তালে কলকি দোলে হুকা দোলে আর খোঁপা দোলে।

আফতাব ভাবে, অনেকদিন সে বুবুকে দেখেনি। বরাবর বুবু তাকে দেখে কাঁদে। ভাবে, চার বছর পরে তাকে দেখে বুবু এবারও কাঁদবে কী।

বুবু কাঁদে। বুবু দুঃখেও কাঁদে, সুখেও কাঁদে। বুকভরা স্নেহ-মমতা যেন, একটু কিছুতে পানি হয়ে উথলে ওঠে। ছেলেবেলায় বুবুকে সে ভয় পেতো। যে-মানুষ সুখেও কাঁদে দুঃখেও কাঁদে সে-মানুষকে ভয় পায় বৈ কী। এবারও কী বুবু কাঁদবে তাকে দেখে।

—আফতাব মিয়া থাকে রঙে, আফতাব মিয়া থাকে শহরে। গাড়ী-ঘোড়ায় চড়ে, সিদ্ধ ভাত খায়। ছাশে থাকে বুড়া বাপ মুনা মিয়া আর থাকে বেওয়া বইন অছিমন। মুনা মিয়া পটল তুললে কেডা গো ছাখবে তারে, কেডা ছাখবে তার চাওয়াল-পাওয়াল।

—গাব গাছের তলে তার মায়ের কবর: গাব গাছেরই তলে বুড়ার হইবো দাফন।

বুবু বিলাপ করে কাঁদে। দরদরিয়ে চোখের পানি পড়ে, গাল-চোয়াল ভেসে যায়। মুখ দিয়ে ব্যথার কথা আর শোকের কথা বেরোয়। যখন শোক-বিলাপ থামে তখন নিঃশ্বাস পড়ে বড় বড়। যেন বাঁশবনে দমকা হাওয়া ওঠে থেকে-থেকে।

বুবু কাঁদবে এবার, আরো কাঁদবে। ছেলে মেয়ে নিয়ে বিধবা বুবুর মনে দুঃখ-বেদনার অন্ত নেই। দেশছাড়া ভাইকে পেয়ে বুবু কাঁদবে।

—ভাই গো আমার, কী খাইবার সখ তোমার, কী বানামু তোমার জন্য?

বুবু কাঁদে শুধু, বুবু জানে না। নদীর বাঁকের পরে কী আছে বুবু জানে

না। বুবু মুরগীর খোয়াড়ে ঝাঁপ দিতে জানে, গরুর পেটের ব্যথায় দাওয়াই জানে, কিন্তু বুবু জানে না শহরের সোনা ভাই-এর মনের কথা। বুকের মধ্যে বুবুর দুঃখের দরিয়া, বুবু জানে না নদী কতদূর যায়। বাপ বলে ছানি নাই চোখে। বুবু বলে নাই, ছানি নাই চোখে।

বুবু পিঠা তৈরী করবে।

—আমার ভাই ছাশে ফিরছে। আমার কলিজার ভাইটা গো ছাশে ফিরছে। বুবু কাঁদবে, তারপর হাসবে। স্বামীর দুঃখ ভুলবে, পুকুরের মাছের দুঃখ আর আমের দুঃখ ভুলবে।

বুবু পিঠা তৈরী করবে নানান্ রকমের। শহরে-থাকা ভাইটার কী খেতে সখ করে? চিতল পিঠা? কেড়া পিঠা, হাতাই পিঠা?

নদী পথ শেষ হয় না যেন। এ-নদী সে-নদী। এ-খাল সে-নালা। কিন্তু থুৎনিটা হাঁটুতে চেপে উবু হয়ে বসে নেই আফতাব। শহরের আফতাব খড়ের বিছানা ঠেলে শুয়ে আছে, আর শুয়ে শুয়ে টোপার দিকে চেয়ে সিগারেট ফুঁকছে। আলস্যভরে প্রশ্ন করে.

—কি নদী?

—ধ্যামড়া নদী, তারপর কলতা। নদী-খাল-নালা বদলায় না, বাড়ীর পথ বদলায় না।

যদি বুবু না কাঁদে?

শ্যামল পুরে একছিল বাদশা যার ছিল এক ছেলে এক মেয়ে। ছোট ছেলে, বড় মেয়ে। মেয়ে কাঁদে, মেয়ে ধনী লোকের মেয়ে। মেয়ে আদুরে, ঘি-মাছ-দুধ সরে পোষা মেয়ে। কেঁদে-কেটে মেয়ে পালঙ্গে গিয়ে শোয়, ঝালর-ওয়ালা দুধের মতো সাদা পালঙ্গে কেঁদে-কেটে তুলতুলে নরম বিছানায় গা ঢেলে শোয় আর তারপর আর কাঁদে না। আগে কাঁদে আদুরে বলে, বিছানায় গা ঢেলে শুয়ে আর কাঁদে না ঘি-মাছ-দুধ-সরে পোষা বলে। হাওয়ার জন্য চামর দোলায় ঝি, যে ঝি বাদশার পা টেপে।

বুবু শুধু কাঁদে, বুবু বোঝে না।

—আল্লাহু-আকবর আল্লাহু-আকবর আল্লাহু-আকবর। ভাই সকল তোমরা

সবে করহ শ্রবণ, নতুবা কারো নাহি পরিত্রাণ। হের শুন চারিদিকে, দোয়া মাঙ্গ পীর থেকে। শোন ভাই উটের কীর্তির যশ, শুনে দিলে হোক সাহস। খোদার কেরামতির কথা ভাই, তোমাদের বলি তাই শুন ভাই, শুন ভাই মন দিয়ে শুন ভাই। প্রস্রাব করিলে নিতে হবে ঢেলা, না হলে হাশরের মাঠে বুঝিবে ঠেলা। ফেলি রাখি অন্য কাজ, পাঁচ ওক্ত পড়িবে নামাজ। আর কী বলিব ভাই, মনে করে রেখো তাই। আল্লাহু-আকবর।

ঘরের মেয়ের পটলচেরা চোখও ছাপিয়ে আসে অশ্রুতে।

—গুরুজনে মানিবে সদা, সম্মুখে না কহিবে কথা। আর প্রস্রাব করিয়া ভাই লইবে ঢেলা। আল্লাহু-আকবর।

বাদশার মেয়ে পালঙ্কে শোয়, না শোনে কথা। সে-ঝি বাদশার পা টেপে, সে-ঝি চামর নাড়ে।

আফতাব মিয়ার পেটে জোর নেই সিদ্ধ ভাত খেয়ে। একটু নুন, একটু মরিচ, একটু মাছ। গাড়ী-ঘোড়ায় চড়ে না। সে রঙে নাই। রনকদার শহরে রঙে নাই।

—ভাই সকল কাতারে দাঁড়াইয়া যান। ভাই সকল, লাইন বাঁধেন, খোদার সামনে কাতার হইয়া দাঁড়াইয়া যান। আসুক হাতি, অসুক বাঘ, আসুক শয়তান। শোন ভাই বন্ধুভাই মন দিয়ে শোন, হেনতেন মুখে যা করিবে না কোনো। আর গুরুজনে মানিবে সদা, সম্মুখে না কহিবে কথা। দেখিলাম কী দেখিলাম শুনিলাম কী শুনিলাম। দেখিলাম শুনিলাম আর পাইলাম খাইলাম। মানিলাম কীর্তি-কুদরত তোমার, লহ লক্ষ কোটি ছালাম শোকর। আর-গুরুজনে মানিবে সদা, তাতে যেন না হয় অন্যথা।

হঠাৎ একটু হাওয়া আসে পানিতে চুড়ির মত মিহি ঢেউ তুলে।

বুবু স্বামীর মৃত্যুর পর বিলাপ করেনি। কেঁদেছে নীরবে। ফিরতি পথে নদী দেখে নাই, তীর দেখে নাই, মেঘ দেখে নাই। কোনদিন দেখে নাই, সেদিনও দেখে নাই। কাদের মুনশীর তিন ছেলের এক ছেলে সিতার জন্ম নিলো, বড় হলো সেয়ান-জোয়ান। হলো তার চওড়া ছাতি, হলো তার দীর্ঘ দাড়ি, দিলো জন্ম সন্তান-সন্ততির। দিয়ে একজন হলো লোক, অতিশয় তেজবান। তারপর একদিন অত বড় জোয়ান-মর্দ ধড়াস করে পড়ে

মারা গেলো। ডাক শুনে দাঁড়াক লোক হাজারে-হাজার লাখে-লাখে কাতারে কাতারে, আর নাই লোক। কিলবিল করা অসংখ্য অগুণতি লোকের মাঝে আর একটিও লোক নাই।

—কী নদী এটা?

—কলতা। ধামড়ার কলতা, কলতার পর খাল।

আফতাব আবার সিগারেট ফোঁকে। লাট-বেলাটের মতো শুয়ে আছে। শহরে লোক ছ্যাশে যায়, সঙ্গে তার টিনের স্যুটকেশ আর একগাছি মর্তমান কলা। হাড়িতে মিষ্টি। স্যুটকেসে বুবুর জন্য কালো পাড়ের দু-খানা শাড়ী, বাপের জন্য লুঙ্গি-কোর্তা, ছেলেমেয়েদের জন্য জামা-পেনসিল বিস্কুট। শুয়ে শুয়ে জিজ্ঞাসা করে,

—কী নদী এটা?

—কলতা।

আফতাব কলতা নদী দেখে না, চোখ তার ছই-এর দিকে। লাট বেলাটের মতো শুয়ে সে সিগারেট ফোঁকে।

বুবু কাঁদলে সে কি করবে? সে বলবে,

—বুবু তোমার জন্য শাড়ি আনছি, দ্যাখবা না?

বুবু তখন আরো কাঁদবে। কাঁদবে তো কাঁদবে, সে কি করবে। বলার কিছু নাই। করার কিছু নাই।

—গুরুজনে মানিবে সদা, সম্মুখে না কহিবে কথা।

বুবু কাঁদে শুধু, বুবু বোঝে না।

—বুবু তোমার জন্য শাড়ী আনছি। দেখবা না?

—মনে আছে বুবু, একদিন তুমি কাঁদছিলা ভয়ে? তুমি দুঃখে কাঁদ বুবু, কিন্তু ভয়ে ঐ একদিনই কাঁদছিলা। ভূতের ভয়ে না, বাঘের ভয়ে না। মনে আছে! বেলতলায় গেছিলা। হঠাৎ একটা বেল পড়ল। খোদার রহমত। পড়লো মাথায় না, শরীরে না। পড়লে পায়ের কাছে। যে বেল শরীরে না পইড়া পায়ের কাছে পড়ল, যে বেল তোমার কোনই ক্ষতি করে নাই, সেই বেলের ভয়ে তুমি কাইন্দা দিছিলা। কাঁইপ্‌তে কাঁইপ্‌তে কাঁদলা তুমি গো বুবু। সে কি কান্দন তোমার।

ছই থেকে টোপা দোলে, থলে হুকা দোলে। বেলের কথা মনে হয়।

হোক অর্থহীন কথা। লোকে দেহে আঘাত পেয়ে কাঁদে মৃত্যুতে কাঁদে, সুখে কাঁদে, সহবাসে কাঁদে, উটের কীর্তি দেখেও কাঁদে। শাক-ভাত খাই, উট দেখি না। উটের কীর্তির কথা শুনে কাঁদি। দেখিলাম শুনিলাম আর পাইলাম খাইলাম। মানিলাম কীর্তি-কুদরত তোমার, লহ লক্ষ কোটি ছালাম শোকর। আল্লাহু আকবর।

বেশুমার লোক। কিন্তু আর লোক নাই।

বুবু কাঁদলে তার বলার কিছুই নাই।

—আফতাব মিয়া গ্যাশে থাকে না, গ্যাশে আসে না। শহরে থাইকা আফতাব মিয়া চাকরী করে, ব্যবসা করে। আফতাব মিয়া পয়সা করে, গাড়ী ঘোড়ায় চলে আর রনকদার শহরে বও করে। বাপ সুনা মিয়া গ্যাশে সুনা হইয়া থাকে। চোখে ছানি, সারা গতরে মরণ ব্যাথা। গাব গাছের তলে বুড়ি কেবল শান্তিতে ঘুমায়। বুড়া গো বুড়া, তোমার মধ্যে আর গাব গাছের মধ্যে ফারাকডা কত?

—টেকা পাঠায়। মানিঅর্ডার কইরা টেকা পাঠায়।

—আরো টাকা চাই। জমি বন্ধক হলো, মান-সম্মান গেল। ও টাকায় হবে না, আরো চাই। ও টাকায় কি হবে? কত হাতি গেল তল। কাবেল ছেলের শহরে ধুম ব্যবসা। এত পয়সা যে হিসেব নেই। রঙ করেও কত পয়সা থাকে। ছেলে বলে, দোয়া ছালাম পর আরজ এই যে, ব্যবসা চলিতেছে না, বাকী দেনা অনেক। বন্ধকী জমি ছাড়াইবার মত টাকা হাতে নাই। কুশলে আছি। ছেলে আসে না। আসে-আসে করে, কিন্তু আসে না। বলে, দোয়া সালাম পর আরজ এই যে, আপিসের ছুটির সময় বই বান্ধানীর কারবার দেখিতে হইবে, নচেৎ বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে।

অছিমনকে কে খাওয়ায়? অছিমনের ছেলেমেয়েদের কে খাওয়ায়? সুনা মিয়া বোঝে না। সুনা মিয়া ছেলের উপর রাগ করে, কিন্তু বোঝে না।

কেঁদে-কেটে যে-বাদশাহজাদী ঝালর দেয়া পালঙ্গে গিয়ে শুয়ে আর কাঁদে না। ঘি-মাছ-দুধ-সরে পোষা শরীর। আল্লাহু আকবর।

—কে আছে আপনার গ্যাশে?

—বুড়া বাপ আছে। আর বিধবা বইন আছে। আপনার কে আছে?

—ভাই বোন একগণ্ডা। বাপজান দ্বিতীয় বিয়ে করেছে। সে-ঘরে পাঁচটা ছেলে মেয়ে। চাচা অসুখের ভান করে রাতদিন শুয়ে থাকে। কারো

কিছু নাই। আমি পারি না। আমারও তো ছেলেমেছে আছে, বউ আছে। কিন্তু খোদার হুকুম' আল্লাহু-আকবর। তারপর হঠাৎ তার চোখ চকচক করে।

—বিধবা বোনকে আবার বিয়ে দেন না কেন?

—বড় বোন। ছটি ছেলে-মেয়ে আছে।

বুবু তোমার নিকট হতে পুকুরের পাড়ে গাব গাছটা অনেক দূর।

—দোয়া সালাম পর আরজ এই যে, আগামী জুম্মা-বাদ আমি দেশে পৌঁছাইব আপনার কদমবুছি করিতে।

আজ তাই এ-নদী সে-নদী এ-খাল সে-খাল দিয়ে খড়ের বিছানায় শুয়ে আফতাব মিয়া বাড়ী যায়। মাঝি কথা কয় না, তার ছেলে কথা কয় না। আকাশে-নদীতে হওয়া নাই।

—বুবু তোমার মনে কতই বা দুঃখ? এক হাঁটু পানি, বুক উঁচু পানি, বিল ভরা পানির মত? টিনের স্যুটকেসের বুবুর একজোড়া শাড়ী আছে। মিহিন জমির, সুন্দর কালো পাড। বিধবা মানুষ, রঙদার পাড তোমাকে মানাবে না। কিন্তু আবার পাড়হীন শাড়ী পরাও ঠিক না। মুসলমান বিধবারা পাড়হীন শাড়ী পরে না।

তোমার জন্য বুবু মিলের লেবেল-সমেত দু'খান শাড়ী এনেছি। পেয়ে তুমি খুশী হবে। তখন যদি আরো কাঁদ, সে-কান্না হবে সুখের। তখন কেঁদে দিল ঠাণ্ডা হবে। উত্তপ্ত গ্রীষ্মে যেমন শীতল পানি খেয়ে দিল ঠাণ্ডা হয়। ও কিছু না। শাড়ী জোড়াটা দেখে তোমার আনন্দ হবে। তুমি স্বামীর শোক ভুলবে। তোমার মনে হবে খোদার স্নেহ-মমতা সিঞ্চিত দুনিয়ায় সত্যি কোন দুঃখ নেই, কোন ভাবনা নেই। জমি বন্ধক পড়ুক, স্বামী মারা যাক তোমাকে ফেলে আর দু'টি সন্তান-সন্ততি রেখে, বুড়ো বাপ যাক শুতে গাব গাছের তলে।

—দেখিলাম শুনিলাম পাইলাম খাইলাম, মানিলাম কীর্তি-কুদরত তোমার, লহ লক্ষ কেটি সেলাম শোকর।

বুবু তুমি এত কাঁদ কেন? তোমার দাড়িওয়ালা যোয়ান-মর্দ স্বামীটা তোমারে আদর করতো?

সন্ধ্যা হয় হয়। খাল দিয়ে নৌকা চলে। খাট কোথায়? মাঝির ছেলে লগি ঠেলে। কূল ভেসে গেছে, কূলের গাছগুলো পানিতে দাঁড়িয়ে আছে।

এ-বার গলা বাড়িয়ে আফতাব দেখে।

পানিতে সামান্য স্রোতের ধার। কচুরীপানা, শক্ত-সতেজ কচুরীপানা ভেসে যায়।

এই যে কচুরীপানা বুবু, এই কচুরীপানার কথা ভাবো। এই কচুরীপানার মূল নাই, শিকড় নাই জমিতে। এই কচুরীপানা ভেসে যায় আপন মনে। তার দুঃখ নাই, ভাবনা নাই। কত নদী, কত খাল, কত নালা আর কত কচুরীপানা। তুমি জান বুবু গরুর কথা। গরুকে কচুরীপানা খেতে দিতে নাই। বন্যার সময় গরু ঘাস-বিচালী খেতে না পেয়ে পানিতে দাঁড়িয়ে পেটের দায়ে কচুরীপানা খায়। জানে না কচুরীপানা খাওয়া তার নিষেধ। কিন্তু কচুরীপানা নির্ভাবনায় ভেসে চলে। তার ভাবনা নাই, চিন্তা নাই। দেখ দেখ, কচুরীপানা দেখ।

কত তোমার দুঃখ বুবু?

মি থাকবে বুবু, বুড়া বাপ যাবে গাব গাছের তলে। তুমি থাকবে সন্তান-সন্ততি নিয়ে। তারা লায়েক হবে। তোমার স্বামীর মত ছেলেগুলো যোয়ান-মর্দ হবে। কি ভাবনা তোমার?

--আমার সোনা মাণিক ভাইটা গো দ্যাশে ফিরছে, আমার কলিজার ভাইটা গো দ্যাশে আসছে। আমার জানের ভাইটা সহি সালামতে ফিরছে। ফকির খাওয়াও দান খয়রাত কর। আমার আবার দুঃখ কী? সোনা মাণিক ভাইটা শহরে চাকরি করে, ব্যবসা করে। টাকার অভাব কী? খোদা পরম দয়াময়, রহমানুর-রহিম।

—সালাম আদাব হাজার হাজার খেদমতে পৌছে, পর আরজ এই যে, কারবার করি বলিয়া যে কারবার সম্পূর্ণ আমার নহে। ইহাতে আমার মূলগত দাবী মাত্র এক তৃতীয়াংশ। আর বিশেষ হয় না। কারবার একবার দাঁড়াইয়া গেলে মুনাফার সম্ভাবনা আছে। বিশেষ আর কি। কুশলে আছি। আরজ ইতি। ফিদবদী শেখ আফতাবউদ্দিন

বুবু, তোমার সোনামাণিক ভাইটি তোমার জন্য এক জোড়া কালো পাড়ের শাড়ী এনেছে। তারপর তুমি বুক ভরে কাঁদো বুবু, বুক ভাসিয়ে কাঁদ। কোনো ওজর-আপত্তি থাকবে না।

তা ছাড়া তোমার তো আর ভয় নাই বুবু। জীবনে একবারই ভয় পেয়েছিলে। গেল তলায় যেল যখন তোমার পায়ের কাছে পড়েছিল। আর

কিছুতেই তুমি ভয় পাবে না। ভয় হলো সব কিছুর গোড়া। বাঘ কিছু করে না ; কিন্তু বাঘের ভয়েই মানুষ মরে।

—এক কাতারে দাঁড়াইয়া যান, ভাই সকল, আসুক হাতী, আসুক বাঘ, আসুখ শয়তান। আল্লাহু-আকবর।

শ্যামলপুরের বাদশার ছেলের কী হলো আর কীই বা হলো তার মেয়ের যে দুধের মতো সাদা ঝালরওয়ালা পালঙ্কে শুয়ে আর কাঁদতো না ?

ছেলেটা মণি-মাণিক্য খচিত অত্যাশ্চর্য লেবাস পরে শাদি করলো, রাজত্ব করলো, তারপর মরে গেল। গুম্বজওয়ালা সুদৃশ্য একটি ইমারত উঠলো তার কবরের ওপর। আর মৃত্যুর দিনে এক সহস্র কবুতর ছাড়া হলো। শাহজাদিরও শাদি হলো আর স্বামীর ঘরে গোসা-ঘর পেল। শোয়ার ঘরে আর গোসা-ঘরে দিন কাটিয়ে সেও মরলো। সে দিন এক সহস্র লোক দিনমোহর পেল।

বুড়া বাপ হুনা মিয়া বোঝে না, বুবুও বোঝে না। একজন রাগে, আরেক জন কাঁদে।

রেগো না, তোমার জন্য লুঙ্গি আর কোর্তা এনেছি। কেঁদো না, তোমার জন্য একজোড়া কালো পেড়ে শাড়ী এনেছি।

মারহাবা, মারহাবা, মারহাবা।

ঐ যে ঘাট, ঐ যে বট, ঐ যে সিঁড়ি।

স্যাঁৎ স্যাঁৎ করে পাতাপড়া পানির গন্ধ।

একটি দীর্ঘলোক লণ্ঠন হাতে এগিয়ে আসে। ছানি পড়া চোখ চকচক করে।

যাও, কদমবুছি করো, মাথা হেঁট করে থাক। কোথায় গাব গাছ ? গাব গাছ নাই, নাই পুকুর, নাই কিছু। চোখ চকচক করে। লণ্ঠনের আলোতে চোখ চকচক করে। অতিশয় চকচক করে। রেগো না।

—ঘাশে ফিরছে গো ঘাশে ফিরছে ; রাজ্য জয় কইরা হুনা মিয়ার কাবেল ছেলে আফতাব মিয়া ঘাশে ফিরছে।

টাকা আনিনি। টাকা নেই। কারবারে পয়সা নেই, শুধু খাটনি। থাক জমি বন্ধক পড়ে। একদিন সুবিধে হবে, একদিন সুযোগ হবে, সুদিন হবে। তখন বন্ধকী জমি ছাড়া পাবে। রেগো না ; লুঙ্গি আর কোর্তা এনেছি

তোমার জন্য। একটু পরে দেখাব। এসেই তো সুটকেশ খোলা যায় না। থাক না ফুল তোলা সুটকেসটা অন্ধকারে পড়ে। আমি মাথা নত করে শুনি, কথা কই। তুমি প্রশ্ন করো, আমি প্রশ্ন করি। তুমি জবাব দেও, আমি জবাব দেই। পেটের ছেলে আর কত করতে পারে? ছেলের জন্ম দিয়ে বাপ আর কত করতে পারে?

চোখ কিন্তু চকচক করে।

হঠাৎ সুনা মিয়া কেমন করে বলে,

—তোমার কাছে কইতে আমার লজ্জা নাই। আমার চোখে যেমুন ছানি পড়ছে। দ্যাখনে পাইনা ভালো।

—সুনা মিয়ারে আল্লাহ-ত্বালা দ্যাশে ফিরাইছে চার বছর পরে কিন্তুক বুড়া দ্যাখতে না পায় তার ছাওয়ালরে।

চোখ চকচক করে।

সুনা মিয়া বোঝে না কিছু। বুঝতে পারে না।

সুনা মিয়ার চোখ চকচক করে। সুনা মিয়া কাঁদে।

-ছাওয়ালরে দেইখ্যা সুনা মিয়া কাঁদে রে, সুনা মিয়া কাঁদে

—আর সুনা মিয়ার মাইয়া আছিমনের চলনে-বলনে আর তেজ নাই।

আফতাবের কেমন সঙ্কোচ হয়। বুবুর পানে তাকায় একটু, কিন্তু আবার চোখ ফিরিয়ে নেয়। ঘরের মধ্যে ছাতের খুঁটি ধরে বুবু দাঁড়িয়ে থাকে নিঃশব্দে।

সোনা ভাইরে পাইয়া আছিমন আর কী করে, খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। মাথায় ঘোমটা, চক্ষে নাই পানি।

বুবু কাঁদে না। বুবু গোয়াল ঘরে কাঁদে না, চুলার আগুনের পাশে কাঁদে না, ঘাটে কাঁদে না, ঘরে কাঁদে না। তেজ নাই চলনে-বলনে, বুবু কাঁদেও না। সোনা ভাইটা দেশে দেশে ফিরেছে। বুবু কাঁদে না। বুবু নীরবে শাড়ীর জমিন দেখে হাত নীচে রেখে, বুবু কাঁদে না।

যে বুবু কাঁদতো, দুঃখে কাঁদতো সুখেও কাঁদতো, সে-বুবু কাঁদে না।

নীলকান্ত মণি

মবিনবউদ্-দীন আহ্‌মদ

ফাল্গুন শেষের বিশুষ্কপ্রায় চন্দনা নদীতে ঝিনুক কুড়োতে গিয়ে একটা নীল বস্তু কুড়িয়ে পেলো জমীর শেখ। অল্প পানির তলায় বালুর উপর চকচক করছিল।

: কি পেলে হে ওটা?

হাত দুই দূর থেকে প্রশ্ন করলে মোহর আলী। চিবুক পর্যন্ত পানির তলায় ডুবিয়ে ঝিনুকের খোঁজে অন্ধের মতো বালু হাতড়াচ্ছিল সে-ও।

জমীর বল্লে: নীল একটা কি যেন। বোধহয় কাচের টুকরো। কারো আংটিতে লাগান ছিল - খসে পড়ে গেছে বেখেয়ালে।

এগিয়ে আসে মোহর আলী: দেখি তো জিনিসটা। দাও দেখি আমার হাতে।

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দেখে মোহর আলী বল্লে: এটা বোধহয় কাচ নয়।

: কি তবে?

: মনে হচ্ছে যেন পাথর। আমি তো চিনি না সঠিক। যদি পাথর হয় এবং সাচ্চা হয়, দামী মাল হবে তা'হলে। বেশ ওজনদারও বটে। নিদেনপক্ষে আট-দশ রতি। যতন ক'রে রেখো যেন। বর্ষার সময় জহুরীরা সব যখন গাঁয়ে আসবে, দেখিও ওদেরকে। কে জানে, ফিরেও যেতে পারে কপাল তোমার।

শুষ্কপ্রায় চন্দনা নদীটির মতোই শুকনো হাসি হেসে জমীর বল্লে: যে এক জগদ্দল পাথর চেপে রয়েছে কপালের উপর, পুচকে একটা আট-দশ রতি পাথর কি আর সেটাকে নড়াতে পারবে, মোহর ভাই?

: সাচ্চা হ'লে পারবে বৈকি। নীলা কি সোজা বস্তু ভেবেছ তুমি?

: নীলা! সে আবার কি?

যাকে বলে নীলকান্তমণি। এক রকম হীরা। বহুৎ দাম এক-একটার।

হাজার হাজার টাকা। কিন্তু বড় ভয়ানক চিজ। সহ্য না হলে, রাজাকেও পথের ভিক্ষুক করে দিতে পারে এ মণি। সহ্য হলে আবার ফকিরকে বাদশা……।

: এটা কি সেই নীলা নাকি?

: আমি তো আর তেমন ভালো বুঝি না, তবে মনে হচ্ছে যেন নীলাই হবে।

কথাটা শুনবার সাথে সাথেই জমীরের বুকের ভেতরটা তোলপাড় ক'রে ওঠে সহসা। মোহর আলীর হাত থেকে ছোঁ মেরে পাথরটা কেড়ে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে থাকে। একখণ্ড হীরার মতোই চক্‌চক করে জমীর শেখের চোখের দৃষ্টি।

॥ ২ ॥

মুক্তোগাছা গাঁয়ের অনেকেই ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ঝিনুক কুড়োয় নদী থেকে। গরীবদের এ একটা পেশা। ঝিনুকের পেট চিরে মুক্তো অন্বেষণ করে। ঝিনুকের বোতাম তৈরী করবার ছোট ছোট কারখানা আছে পাশের গঞ্জে—সেখান থেকে লোক এসে কিনে নেয় সব ঝিনুক।

বর্ষাকালে নৌকা চেপে শহর থেকে জহুরীরাও আসে মুক্তোর খোঁজে। দু দশটা মুক্তো অনেকেই বিক্রি ক'রে প্রতি বছর। কিন্তু নদীর তলায় হীরে কুড়িয়ে পাওয়া অভাবনীয় ব্যাপার। কথাটা খুব সহজেই ছড়িয়ে পড়ে গাঁয়ের মধ্যে।

॥ ৩ ॥

দলে দলে লোক আসে জমীর শেখের বাড়ী। সবার মুখে একই কথা।

: বহুৎ কিস্মতদার আর দামী একটা মণি পেয়েছ শুনলাম…। দেখাও দেখি এবার জিনিসটা। এক নজর দেখে চোখ দু'টি সার্থক করি …।

মুখ ভার ক'রে জমীর শেখ বলে: হীরা, না কাচ, কে জানে? কাচই হবে……।

: হীরাও তো হতে পারে। আরে, নারাজ করো না জিনিসটা। অত ভয়াও কেন? আমরা তো শুধু চোখের দোহাই দেখবো। কেড়ে তো আর

নেবো না।

বিরাম নেই লোক আসা-যাওয়ার। মনে মনে রীতিমতো বিরক্ত হয় জমীর। তবু সবাইকে দেখাতে হয়।

॥ ৪ ॥

কোন বস্তুই সযত্নে লুকিয়ে রাখবার মতো বাক্স-পেটরা নেই জমীরের কুঁড়ে ঘরে। ভেবেই পায় না বেচারা কোথায় রাখবে তার এই মহামূল্য কুড়ানো মাণিক।

রাতের বেলায় খেজুর পাতায় বুনান একটা পাটি মেঝের উপর পেতে, তেল চিটচিটে বালিশের তলায় পাথরটা রেখে শুয়ে পড়ে জমীর। কিন্তু ঘুম আসে না চোখে।

একটা বিচিত্র অনুভূতি, কেমন যেন একটা অস্বস্তি সারা দেহ-মনে ক্রমাগত সঞ্চরণ ক'রে ফিরে।

বারে বারে তন্দ্রা নামে চোখের কোণে, বারে বারেই ছুটে যায়। কিছুক্ষণ পরে পরেই হাত দিয়ে অনুভব ক'রে দেখে, পাথরটা আছে কি-না।

কুপি জেলে, আলোর সামনে, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে নীল বস্তুটার দিকে। কোন পাথরই সে চেনে না, কিছুই বুঝে না পাথরের, তবু দেখে। দেখে দেখে আশা যেন আর মিটে না।

শুয়ে শুয়ে ভাবে, কত দাম হবে মণিটার? মোহর ভাই বলেছে, হাজার হাজার টাকা দাম হয় এক একটা নীলার। কত টাকায় হাজার টাকা হয়—ক' কুড়ি টাকায়?

এতদিন পরে কি তা'হলে দয়া হলো খোদার। সব দুঃখ-কষ্ট কি এবার তিনি সত্যি সত্যি ঘুচিয়ে দেবেন?

কিন্তু যদি সাচ্চা না হয় পাথরটা? যদি কাচই হয় এক টুকরো? কানা-কড়ির মূল্যও তো তা'হলে নেই ওটার।

না না না……। তা হতে পারে না……। মোহর ভাই যখন বলেছে ওটা পাথর, তখন বোধ হয় পাথরই হবে। মোহর ভাই তো শুধু আমাদের মতো ঝিনুকই কুড়োয় না, সে যে একটু আধটু মণি মুক্তোও চেনে—প্রায় জহুরী লোক। ভুল হবে না তার। হতে পারে না। নিশ্চয়ই এটা নীলা!

নীলকান্তমণি! সহ্য হলে ফকিরকে বাদশা করে দেয়……।

কিন্তু যদি না সয়? আমার আর কি হবে? আমি তো প্রায় ফকিরেরই সামিল। দোরে দোরে ভিক্ষে করি না ঠিকই, তবে দিন-আনি দিন-খাই গোছের অবস্থা তো বটে। আমার তো আর নতুন ক'রে ফকির হবার সম্ভাবনা নেই। বরং বাদশার মতো ধন-দৌলত……।

॥ ৫ ॥

আধ-ঘুম আধ-জাগরণের মধ্যে এক সময় মনে হলো জমীরের, কে যেন তার বালিশের তলায় হাত দিয়ে তক্ষুণি আবার টেনে নিল হাতটা।

ধড়মড় ক'রে বিছানায় উঠে বসে জমীর। চোখে পড়ে একটা লোক বেরিয়ে যাচ্ছে খোলা দরজা দিয়ে। চোখে পড়ে ঘরের এক কোণে বিরাট একটা সিঁদ খাঁ খাঁ করছে।

এক মুহূর্ত বিহ্বল হয়ে থেকে বালিশটা সরিয়ে দেখে, পাথর নেই। সর্বনাশ। ঘরের কোণে কাটা সিঁদটার মতো জমীরের বুকের ভিতরটাও অমনি খাঁ খাঁ করে ওঠে অকস্মাৎ।

বুক-ফাটা একটা আর্তনাদ ক'রে বেড়ার গায়ে গোঁজা দা'খানা টেনে নিয়ে বাঘের মত লাফ দিয়ে চোরের পিছনে ছুটে জমীর।

॥ ৬ ॥

হৈ-চৈ চীৎকারে গাঁয়ের মানুষ সব আলো হাতে দৌড়ে এসে দেখে, একটা এঁদো পুকুরের ধারে ছমীর শেখের বুকের উপর চেপে বসে জমীর তাকে দা দিয়ে পাগলের মতো কুপিয়ে চলেছে। ফিনকি ছুটেছে রক্তের।

চার-পাঁচজন লোক ছুটে গিয়ে ধরে ফেলে জমীরকে।

ছমীর জমীরের বড় ভাই।

॥ ৭ ॥

এত কোপ খেয়েও কিন্তু মরেনি ছমীর। প্রবল উত্তেজনার বশে জমীর খেয়ালই করেনি যে, দা-এর উল্টো ধার দিয়ে সে কুপিয়ে গেছে সামনে।

তবু ছমীরের গায়ের সব কটা জখমই মারাত্মক। উপরের ঠোঁটের

খানিকটা অংশ চার পাঁচটা দাঁত সমেত বেমালুম উড়ে গেছে। একখানি হাতের হাড় ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। সারা গায়ে অসংখ্য থেৎলানো জখম।

নীলাটাও ছিটকে পড়ে হারিয়ে গেছে কোথায় কে জানে!

॥ ৮ ॥

ছমীর শেখ এখন ভিক্ষে ক'রে খায়। ওর একখানি হাত কেটে ফেলে দিয়েছে হাসপাতালের ডাক্তাররা। বীভৎস হয়ে গেছে মুখের চেহারা। দেখলে ভয় করে।

আর জমীর আজও পাগলা গারদে রয়েছে; বদ্ধ উন্মাদ।

বৃষ্টি

আলাউদ্দিন আল আজাদ

বৃষ্টি নামবে। ঈষৎ শিশির-ছোঁয়া বসন্ত রাত্রে দক্ষিণ থেকে বইবে যে হাওয়া, তাতে থাকবে সমুদ্রের আর্দ্রতা. ফাটল-ধরা শুকনো-মাঠ আর পাতাঝরা গাছের শাখায় শিহরণ জাগিয়ে দিয়ে সেই অতি-দূরে পাহাড়ের চূড়ায় ঘনীভূত হবে, এর পর গর্জনে বজ্রে বিদ্যুতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে সারাটা আশমান, মঙ্গলসুধার মতো অজস্রধারায় নামবে বৃষ্টি। গাছের শুকিয়ে যাওয়া ডালপালাগুলি কচি পাতায় ভরে উঠবে, সারা খামার ছেয়ে যাবে সবুজে সবুজে। দুপুরের রোদে পাটখেতের চারা বাছতে গিয়ে শরীর থেকে হয়তো দরদর করে ঘাম ঝরবে, কিন্তু তাতে আসবে না এতটুকু ক্লান্তি, কেননা, নতুন ফসলের খোয়াব প্লাবনের মতো মিশে থাকবে রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে।

কিন্তু সে বছর এসব কিছুই হল না। ফাল্গুন চলে গেল, উত্তর দিকটা কিঞ্চিৎ কালোও হল না; চৈত্র শেষ হতে চললো, আকাশে দু'একদিন গুরু গুরু আওয়াজ হল, গুমোট হয়ে রইল সারাটা প্রকৃতি; কিন্তু এর বেশি কিছু নয়।

এর পর এলো বৈশাখ। আর এখনও সূর্য আগুনের ফুলকি উড়িয়ে তীব্র তেজে জ্বলতেই লাগল, মাটির বুক চিরে মাথা উঁচিয়ে-ওঠা পাটের চারাগুলি আস্তে আস্তে কুঁকড়ে গেল। ওপরে খা-খা শূন্য, নীচে আদিগন্ত মুক্ত সুদূর, তারও নীচে বাঘবন্দী নক্শার মতো জমিগুলি রোদে-পোড়া, বিবর্ণ। দুপুর বেলা খেতের আলের ওপর গিয়ে দাঁড়ালে কলজেটা সহসা ছ্যাঁৎ করে ওঠে, ঝলসানো তামাটে জিহ্বা বার করে সারা মাঠটা ডাইনীর মতো হাঁ করে আছে। জ্বলন্ত ক্ষুধা নিয়ে সে নিজে বুকের শিশু-শস্যকে গ্রাস করেছে, আগামী বছর যে গজব নেমে আসবে তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু কেন? এর পিছনে নিশ্চয় কোনো গুরুতর কারণ আছে। সেদিন জুম্মা নামাজের পর আলোচনা উঠল। মিম্বরের কাছে দাঁড়িয়ে মৌলানা মহীউদ্দিন বলতে লাগলেন,—বেরাদরানে-ইস্‌লাম! আমি অধম বান্দা,

আপনাদের খেদমতে কি বয়ান করব, আপনারা সব বিষয়েই ওয়াকিফহাল। কিভাবে আছে খোদার গজব নামে তখনি, যখন দুনিয়া গুণাগারিতে ভরে যায়। আমরা এখন কি দেখছি? না, ছেলে বাপের কথা শোনে না, জেনানা বে-পর্দা, চুরিডাকাতি বদমায়েসিতে দুনিয়া পূর্ণ হয়েছে। এদিকে নামাজ নেই, রোজ নেই, হজ-জাকাত নেই। আজ চলুন, আমরা তাঁর দরবারে জার-জর হয়ে কাঁদি, মাঠে গিয়ে সবাই হাত তুলে মোনাজাত করি, তিনি রাহমানুর রহিম, ইচ্ছা করলে একটু দয়া করতেও পারেন।

মৌলানা সাহেবের কণ্ঠস্বরের গুরু গম্ভীর ধ্বনি-তরঙ্গে পাকা মসজিদের ভিতরটা গমগম করতে লাগল। মুসল্লিদের মধ্য থেকে উঠে দাঁড়ালেন হাজি কলিমুল্লা। থুতনিতে একগুচ্ছ সাদা দাড়ি, মাথায় কিস্তি টুপি, নামাজ পড়তে পড়তে কপালের মাঝখানটায় দাগ পড়েছে। তিনি প্রথমে গলা খাকরানি দিলেন, পরে আবেগকম্পিত গলায় বলতে লাগলেন, মৌলানা সায়েব যা বললেন, তা অবশ্যই আমরা পালন করব। কিন্তু এই সঙ্গে একটি কথা সকলের মনে রাখতে হবে, কু-কর্মের বিচার চাই। এই অনাবৃষ্টি কেন হল, আপনারা ভেবেছেন কি? খোলাখুলি বলতে গেলে, নিশ্চয় কোনো মেয়ে অবৈধভাবে গর্ভবতী হয়েছে, তৌবা, আস্তাক ফরেল্লা। এই অঞ্চলে, আশেপাশের কোনো গ্রামে অথবা আমাদের গ্রামেও হতে পারে। এদের তালাস করে বার করতেই হবে, নইলে এই আজাবের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া যাবে না। এদের দুর্‌রা মেরে ঠাণ্ডা করতে হবে।

ডান হাতের আঙুলগুলো দাড়িতে একবার চালিয়ে গরমে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন হাজি কলিমুল্লা, তাঁর মগজের কোষে কোষে সত্যিকারের অপরাধীকে খুঁজে পাওয়ার ভাবনা।

দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে ফুটবল খেলার ময়দানে যেদিন 'মেঘের নামাজ' হওয়ার কথা, তার একদিন আগেই অসুখে পড়লেন সুফী মৌলানা মহীউদ্দিন।

জামাতে ইমামতি করবার জন্য হাজি সাহেবকে গাঁয়ের তরফ থেকে অনুরোধ করা হল। প্রথমে বিনয় করলেও, সকলের খেদমতে পরে রাজি হলেন।

সেদিন নামাজ শেষ হওয়ার পর পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়ালেন হাজি কলিমুল্ল, বহুদূর চাউনি বুলিয়ে দেখলেন, দুনিয়াটা এখনো জিন্দেগীর অযোগ্য হয়ে উঠেনি, এখনো ডাক দিলে আলেমুল গায়েবের দরবারে হাজিরা দিতে

হাজার লোককে পাওয়া যায়। তিনি চেয়ে রইলেন, আর দেখলেন অগুনতি টুপির শোভা, হোকনা সেগুলি তেল চিটচিটে অথবা ছেঁড়াখোঁড়া। খোলা প্রান্তরে গালভাঙা তামাটে মানুষগুলি বসে আছে অসহায়ের মতো, সবারই মনে একটুখানি রহমের প্রার্থনা। হাজি কলিমুল্লা দু'হাত তুলে দরাজ গলায় উচ্চারণ করতে লাগলেন, ইয়া আল্লাহ্, ইয়া বারে খোদা, তুই চোখ তুলে চা, একটু দয়া কর তোর বান্দাদের। তুই আসমান-জমিন, চান-সুরুজের মালিক, তোর অঙ্গুলি হেলনে সাগর দোলে, হাওয়া ছুটে চলে, নহর বয়, তোর একটুখানি ইচ্ছায় এই দুনিয়া ফুলে-ফসলে ভরে উঠতে পারে। মেঘ দে, পানি দে, ছায়া, দে, শান্তি দে তুই।'

'আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন' সারা জামাত জোড়া একই কাতর আওয়াজ। হাজি কলিমুল্লার সাদা দাড়ি চোখের পানিতে ভিজে গেল। কেঁদে জার-জার হয়ে তিনি দোয়া খতম করলেন, 'সোবহানাকা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতে আম্মাইয়াসেফুন, আস্সালামু আলাল মুরসালিন, আলহামদু লিল্লাহে রাব্বিল্ আলামিন!'

এইভাবে একদিন, দুদিন, তিনদিন ময়দানে গিয়ে জামাতে শামিল হল ছেলেবুড়ো-জোয়ানেরা, তাদের এক চোখ আকাশের দিকে আরেক চোখ ফসল কুঁকড়ে যাওয়া খামারের দিকে। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা, এক মায়ের এক পুত্রের গায়ে চুন কালি মাখিয়ে, তার মাথার কুলোয় কোলা ব্যাঙ আর বিষকাঁটালির গাছ রেখে রাতের পর রাত মেঘখেলা খেলল, নদীর ধারে সিন্নি রেঁধে কলাপাতায় ফাকর-ফকরাকে খাওয়াল। তাদের ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেল ওপরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে; কিন্তু সেই রোদ চুয়ানো কাক-চক্ষু নীল, একখণ্ড মেঘের আভাসও দেখা গেল না।

মগরেবের নামাজের পর পাটিতে বসে তসবিহ জপতে জপতে এসব কথাই ভাবছিলেন হাজি কলিমুল্লা, তাঁর চোখের পুতুলিতে অবসাদের ছায়া। গভীর ভাবনার কারণ আছে বৈকি! সুতোর চোরাকারবার থেকে যে কয়েক হাজার টাকা পেয়েছিলেন, তার অর্ধেক দিয়ে একটা গুদাম কিনেছেন মেঘনার বন্দরে, বাকি অর্ধেক দিয়ে কিনেছেন দুন দেড়েক জমি। নিজে পাট কিনে মজুদ করতে না পারলে গুদাম কেনার ফায়দা নেই। মাসিক দেড়শো টাকা ভাড়ায় আর কী হয়: অথচ এ বছরও গুদামটাকে নিজে ব্যবহার করতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে না। এদিকে সবগুলি জমি নিজে চাষ করেছেন।

এখানটায়ই হয়েছে চরম বোকামি। যদি পত্তনি দিতেন, তাহলে হাজার দেড়েক টাকা নগদ পাওয়া যেত ; কিন্তু মুনি-মজুর ও জমির তদারক করতে জান বেরিয়ে যাচ্ছে। বীজ বোনা থেকে এক-নিড়ি পর্যন্ত পয়সা-কড়ি কম খরচ হয় নি, ভবিষ্যতে আরও হবে, অথচ এদিকে আকাশের যা হাল, তাতে ফসল পাওয়ার বিশেষ আশা নেই।

সুতোর কারবার ছেড়ে দিয়েও ভালো কাজ করেন নি। গত বছর হাওয়া-গাড়িতে চড়ে গিয়ে হজ করে এসেছেন, ভেবেছিলেন, অতঃপর সংসারের ঝামেলাতে নিজেকে এতটা জড়াবেন না, গুদামটা ছেলেদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজে জমি-জমা নিয়েই থাকবেন। কিন্তু টাকার অভাবে সব ভেস্তে গেল। আসলে ব্যবসা ব্যবসাই, এতে সৎ-অসৎএর প্রশ্ন নেই, নিয়ৎ ভালো থাকলে, দান-খয়রাত করলেই হল।

জানালার বাইরে থেকে আমের বোলের তীব্র গন্ধ ভেসে আসছিল, বাঁশঝাড়ে শালিকের কিচির-মিচির অনেকটা মন্দীভূত। তসবিহর গুটিগুলি চঞ্চল হয়ে ঘুরছে হাজি কলিমুল্লার আঙুলে আঙুলে, এই সঙ্গে তাঁর মনটা ক্রমেই আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে।

জৈগুন ঘরে বাতি দিতে এসে যেন চমকে উঠল। বলল,—'মিয়াসা'ব এখানে? মসজিদে যান নি?'

'না, শরীরটা খুব ভালো নয়।' হাজি সাহেব ওর মুখের দিকে চেয়ে বললেন,—'তা ছাড়া তোর গিন্নিমা বোধ হয় একখুনি এসে পড়বেন।'

দিন পনেরো হল নতুন গিন্নি বাপের বাড়ি গিয়েছিল নাইওর করতে, আজকে তাকে আনবার তারিখ। হাজি নিজে যেতে পারেন নি, প্রথম তরফের তৃতীয় ছেলে খালেদকে পাঠিয়েছিলেন সকাল বেলায়। আসলে বৌকে বাপের বাড়িতে বেশিদিন থাকতে দিতে তিনি সব সময়ই নারাজ। প্রথম স্ত্রীকে দশদিন থাকতে দিয়েছিলেন, তাও একেবারে নতুন অবস্থায়। দ্বিতীয় স্ত্রীর বেলায় দিনের সংখ্যা আরো কিছুটা বেড়েছিল। তবে এখন পড়তি বয়েস, সব ব্যাপারে কড়াকড়ি চলে না। দু'বছর আগে দ্বিতীয় স্ত্রী মারা যাওয়ার পর সংসার থেকে তাঁর মন একেবারে উঠেই গিয়েছিল। কিন্তু খোদার কুদরত, কার সাধ্য তার কিনারা করে? তিনি কপালে যা লিখে রেখেছেন, তা একদিন ফলবেই। গতবার যখন হজে যাচ্ছিলেন, তার মাসখানেক আগে সবাই ধরে বসলো, এমন সোনার সংসার, একজন গৃহিণী

না থাকলে কোনো কিছুই ঠিক থাকবে না।

কিন্তু পাত্রী? বয়েস ষাট পুরো হতে চলল, এখন হাতে ধরে কে নিজের মেয়ে দিতে যাবে?

'হাসালেন হাজি সায়েব, হাসালেন। আপনার কিনা পাত্রীর অভাব?' মজু প্রধান দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন,—'আপনি ক'ন যে বিয়ে করবেন, আমি পাত্রী ঠিক করে দিচ্ছি! তাও যেমন তেমন নয়, এমন কন্যা দেব, চোখে পলক পড়বে না।'

হাজি কলিমুল্লার চোখের তারা দুটো খুশিতে চক্‌চক্‌ করে উঠল। একটা অজানা অনুভূতিতে তাঁর হৃৎপিণ্ডটা ধুক্‌ধুক্‌ করছিল; কিন্তু বাইরে আগাগোড়া ম্লান হয়েই রইলেন, আগেকার সহধর্মিণীদের স্মৃতি এতো শীগগির ভুলে যাওয়া উচিত নয়। তিনি একটা ঢোক গিলে বললেন,—'দেখুন, তিনকাল গিয়ে এককালে পড়েছি, এখন আমোদ-আহ্লাদ করার সময় নয়। ঘরের তদারক আর—আর আমার ফাইফরমাশটা করতে পারলেই হল।'

'তাতো বুঝলাম।' মজু প্রধান যুক্তি দেখালেন,—'ভাঙানাওয়েও কাজ চলে, আবার নতুন নাওয়েও চলে; কিন্তু কোন্‌টা আমরা চাই! কোন্‌টা দিয়ে গাঙ পাড়ি দিতে সুখ?'

এরপর সাতকানি জমি সাফকাওলা করে দিয়ে যে পাত্রী ঠিক হয়েছিল, সে মজু প্রধানেরই মেয়ে-ঘরের নাতনী। বয়েস একুশ-বাইশ বছর হবে। এ দেশের মেয়েরা কুড়িতেই বুড়ি হয়, সে হিসেবে হাজি সাহেবের সঙ্গে সম্বন্ধটা মোটেই বে-মানান হয়নি!

রান্নাঘরের হাঁড়ি-পাতিল গুছিয়ে জৈগুন এল। অর্থপূর্ণ গাম্ভীর্যের সঙ্গে একটা পিঁড়ি টেনে নিয়ে বসলো। হাজি সাহেবের ওজিফা তখনো শেষ হয়নি। মুখের বিড়বিড় খানিকক্ষণের জন্য থামিয়ে তিনি জিগগেস করলেন,— 'কিরে, কিছু খবর আছে?'

জৈগুন বলল,—'আছে।'

'কি শুনি!' তসবিহ্‌র মালায় আঙুল থেমে গেল হাজি কলিমুল্লার, তিনি উৎসুক দৃষ্টিতে চাইলেন। কাজ-কর্মের ফাঁকে ফাঁকে গোপন খবর সংগ্রহের

জন্য তিনি জৈগুনকে নিযুক্ত করেছিলেন, আর সেজন্যই এই আগ্রহ।

'আমি আজ গিয়েছিলাম বাতাসীর কাছে। গিয়ে দেখি, সে তার খাসিটার জন্য আমপাতা পাড়ছে। আমাকে দেখেই সে নানান কথা বলতে লাগল, কিন্তু আমি চেয়ে রইলাম ওর শরিলের দিকে।' দরজায় একবার চেয়ে নিয়ে জৈগুন বলল,—'ওর তলপেটটা বেশ ফোলা মনে হল।'

হাজি চিন্তিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন,—'ওর জামাই না কবে মারা গেছে?'

'তা সাত-আট মাস তো হবেই!' জৈগুন হিসেব করে বলল, 'কিন্তু ওর পেট মনে হল চার-পাঁচ মা'সর।'

'তাই নাকি? তাহলে তো বেশ অনেক দিনের ফাঁক?' হাজি কলিমুল্লা যেন সত্যদর্শন করেছেন, তাঁর চোখে আশার আলো ফুলে উঠল। নিচু গলায় জিগগেস করলেন,—'আচ্ছা, বাতাসীর ঘরে যে লোকটা থাকে, তাকে দেখলি?'

'হ্যাঁ, দেখলাম। অসুখ এখনো সারে নি, তবে আগের চেয়ে একটু ভালো। আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখি, সে ঘরের ভিতরে বিছানায় শুয়ে আছে।'

'তা হোক, তা হোক।' হাজি অসহিষ্ণুর মতো বললেন,—'শুয়ে থাকলে কি হবে? শুয়ে থাকলে কি আর এসব কাজ করা যায় না? নিশ্চয় যায়। তুই কি বলিস?'

'হাঁ, আপনি ঠিকই কইছেন। তা ছাড়া বাতাসীর চলাফেরা আমার ভালো মনে হয় না। রজবালি বেঁচে থাকতেই এর সম্বন্ধে কত লোক কত কথা বলেছে। নামা-পাড়ার ছমু যে ওর দরজা খুলেছিল, তা কি কেউ শোনে নি? রজবালি টের পেয়েছিল বলেই না দোষটা ছমুর ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। না-হলে মেয়েমানুষের চোখঠারানি ছাড়া কি অমন কাজ কেউ করতে সাহস পায়?'

'যদি এই ঠিক হয়, তাহলে তো আর কোন কথাই নাই। আমার বিশ্বাস, বাতাসীই এ- কাম করেছে! না হলে বৃষ্টি হবে না কেন?' হাজি আবার তস্‌বিহ জপতে লাগলেন, খানিকক্ষণ চুপ থাকার পর বললেন,—'তবু রাখ, আমি নিজে একটু পরখ করে নিই, এরপর একটা কিছু করা যাবে।'

জৈগুন চলে গেলে আবার গভীর চিন্তামগ্ন হলেন হাজি কলিমুল্লা। তাঁর কপালের বলি-রেখা আরো কুঁচকে গেলো। তস্‌বিহর গুটিতে ঘন ঘন আঙুল চলতে লাগল। বাতাসী, বাতাসী, বাতাসী। বাতাসী ছাড়া এ-কাজ আর কারো নয়। অল্প বয়েসে স্বামী মারা যাওয়ার এই দোষ! কেননা, স্বামীসঙ্গ

একবার যে পেয়েছে, সে সেই স্বাদ কি সহজে ভুলতে পারে? এ হচ্ছে আফিমের মতো' ভাত ছাড়া যায়, তবু ছাড়া যায় না এর নেশা। তা ছাড়া ওর এখন পুরো জোয়ানী। যেমন তেমন দু' একজন পুরুষ ওর কাছে কিছু নয়, এক চোখের বাঁকা চাউনিতেই কাত করে ফেলতে পারবে। অথচ কথা বলার কি কায়দা। মামাতো ভাই, দিন মজুরি করত, কালাজ্বরের কবলে পড়ে বিপদ হয়েছে, কেউ নেই, না দেখলে চলে না। এসব কথা দিয়ে আর চিঁড়ে ভিজবে না। আসলে লোকটাকে এনেছে এক বিছানায় রাত কাটাবার জন্য—এ বুঝতে বাকি নেই।

কিন্তু এর শাস্তি হবে কী? কিতাবের হুকুম মানলে, গলা-ইস্তক মাটিতে পুঁতে এর মাথায় পাথর মারতে হবে যতক্ষণ না প্রাণটা বেরিয়ে যায়। কিন্তু এ যুগে কি তা সম্ভব? থানা আর পুলিশ রয়েছে যে। তাহলে উপায়? জুতো মারা? একঘরে করে রাখা? গ্রাম থেকে বের করে দেওয়া?

হাজি কলিমুল্লা যখন এসব ভাবনায় তন্ময় হয়ে ছিলেন, তখন খালেদ তার নতুন মাকে নিয়ে মরা-গাঙের পানির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

পূর্ণিমা-চাঁদ দেখা গিয়েছিল বাড়ি থেকে রওয়ানা দেয়ার অনেক আগেই, এইবার তা বাঁশ ঝাড়ের মাথা ছাড়িয়ে ঝলমল করছে। চারদিক নিঝঝুম, গাছপালায় বাতাসের নড়াচড়ার গরজ নেই।

মরা-গাঙে এখন হাঁটু পানি। দুই পাশে কাদা ঠেলে ডাঙার সঙ্গে যে সরু পথটার মিল হয়েছে, তার পরিষ্কার বালুর ওপর দিয়ে ঝিরঝির করে কেটে চলেছে ফোয়ারার স্রোত। পানির ভিতর থেকে গজিয়ে ওঠা বোরো খেতগুলিতে কচি ধান পাতার জড়াজড়ি।

নীচু হয়ে জুতো-জোড়াটা ডানহাত দিয়ে খুলে ফেলল জোহরা। তার কাঁধে ছোট ছেলেটা। তার অসুবিধা হচ্ছে দেখে পিছন থেকে খালেদ পাশে এসে বলল,—'সাজুকে আমার কাছে দিন।'

ওরা দুজনে প্রায় সমবয়সী। প্রথম প্রথম 'আপনি' বলতে লজ্জা করত খালেদের, কিন্তু এখন আর সে-ভাবটা নেই।

জোছনায় আলোকিত বড়ো ছেলের মুখের দিকে চাইল জোহরা, টানা ভুরুর নীচে ওর সুন্দর চোখ দুটো আরো সুন্দর মনে হল তার, একটা অব্যক্ত অনুভূতির ছলছলানিতে বনের অন্ধকারে শিহরিত নদীর মতো দুলে উঠল বুকের ভিতরটা। আচ্ছন্ন স্বরে জিজ্ঞেস করল,—'তোমার কষ্ট হবে না তো?'

খালেদ হাসলো! বলল,—'না, এ আবার কষ্ট কি?'

সাজুকে পাঁচ বছরের রেখে ওর আম্মা এন্তেকাল করেছেন দু'বছর আগে, আদর যত্ন না পাওয়ায় ওকে কান্নারোগে ধরেছিল। কিন্তু বর্তমানে তা নেই। নতুন মাকে তার এমনি ভালো লেগেছে যে, সে এক মুহূর্তের জন্যও তার কাছ-ছাড়া হয় না। জোহরা যখন নাইওর করতে যায়, তখন ও তার কোলে উঠে চলে গিয়েছিল।

অন্য কাঁধের ওপর থেকে অঘোরে ঘুমিয়ে থাকা ছোট ভাইটিকে নিজের কাঁধে নিতে গিয়ে খালেদের মনে হল, কপোতের বুকের মতো উষ্ণ, প্রবালের মতো কোমল কিসের মধ্যে যেন তার বাঁ হাতের আঙুলগুলি ক্ষণিকের জন্য হঠাৎ-হাওয়ায় চাঁপার কলির মতো কাঁপুনি খেয়ে গেল। নিমেষে তার সমস্ত শরীরটা শির্ শির্ করে উঠল ভরামেঘে বিদ্যুৎ সঞ্চারের মতো। পলকের জন্য তার চোখে পড়ল, সহসা কেমন রাঙা হয়ে উঠল মেয়েটির মুখ, তার সারা চেহারায় রক্তের প্রবাহ বহ্নির মতো ছড়িয়ে গেল। খালেদ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, আরেক জন্মের কোনো নিবিড় স্মৃতি অস্পষ্ট মনে পড়ার মতো কী এক অজানা বেদনায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঝিরঝিরে পানির উপর দিয়ে সম্মুখে হাটতে লাগল।

কিন্তু জোহরা দাঁড়িয়েই রইল। কাপড়টা ঠিক করে নিয়ে চাঁদের দিকে মুখ উঁচিয়ে চাইল একবার, আবার চাইল সামনে চলমান মূর্তিটার দিকে। এরপর সে চঞ্চল হয়ে উঠল। সেই রূপালি বালুর ওপরে ফোয়ারার স্রোতে বয়ে চলা রাস্তাটায় ত্রস্ত হরিণীর মতো পা ফেলে হাঁটু পানির কাছে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে পিছন থেকে শাড়িটা কুঁচকে এনে ডান হাতে হাঁটুর কাছে ধরা, জোছনা-উছল কালো পানির দিকে মুখ নিচু করে জোহরা দেখল, তার মূর্তিটা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে, এই সঙ্গে ছোট ছোট ঢেউয়ে ভেঙে যাচ্ছে চাঁদের চেহারাটাও। হঠাৎ মুখ তুলে সে ডাকল,—'খালেদ!'

'কি!' কিছুদূর থেকে খালেদ সাড়া দিল।

'আমাকে ফেলেই চলে যাচ্ছ।'—স্বপ্নের স্বরে যেন জোহরা বলল,—'আমি চলতে পারছি না। দেখ, দেখ! পানিটা কী সুন্দর!'

খালেদ ফিরে এল। বলল,—'আপনার কি হয়েছে বলুন তো, চলুন তাড়াতাড়ি। অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে।'

'ও তাইতো। অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে!' পানি ঠেলে কিছুদূর এগিয়ে আবার থম্‌'ক দাঁড়াল জোহরা। ঝিলিমিলি ঢেউয়ের দিকে চেয়ে বলল,—'দেখছ, কি সুন্দর পানি! এমন পানিতে মরতেও সুখ।'

কোনো জবাব দিল না খালেদ, মুখ নীচু করে চুপচাপ এগুতে লাগল।

ওপারে কোথায় একটা পাখি ডেকে যাচ্ছে—'বৌ কথা কও।'

নদী পেরিয়ে এসে চপ্‌চপ্‌ পানি থেকে পা দুটো ঝাড়া দিয়ে নতুন জুতো জোড়াটা পরার সময় জোহরার মনে হল তার বুকের ভিতরে কিছু নেই, বিবাগী হাওয়ার মতো কিসের এক রিক্ত হাহাকার গুমরে গুমরে মরছে। নিজের কথা ভাবতেই সে আঁতকে উঠল, তার শরীরটা ঝিম ধরে অবশ হয়ে এল।

খালেদ আস্তে আস্তে হাঁটছিল। পিছন থেকে সে একটা কাতর-স্বর শুনতে পেল,—'একটু দাঁড়াও!'

'আবার কি হল আপনার?'

'কি জানি কিছু বুঝতে পারছি না। আমার চোখ দিয়ে এমন পানি পড়ছে কেন?' জোহরা ব্যাকুলভাবে এগিয়ে গিয়ে খালেদের চোখের সামনে নিজের দুটো চোখ বিস্ফারিত করে দাঁড়াল, চাঁদের আলোয় দেখা গেল, তার টলটলে দুটো চোখ দিয়ে মুক্তোর মতো অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ছে।

খালেদ আবার উচ্চারণ করল,—'কি হল আপনার?'

'তুমি কিচ্ছু জান না, কিচ্ছু বুঝ না!' কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ দুটো মুছে জোহরা অপ্রকৃতিস্থের মতো বলল,—'সাজুকে দাও আমার কাছে। চল শীগগির। লোকজন নেই, আমার বড্ড ভয় করছে।'

ওরা যখন মুখোমুখি হয়েছিল, তার কিছু আগে থেকেই কিঞ্চিৎ হাওয়া বইতে শুরু করেছিল, আর যখন চুপচাপ চলতে শুরু করল, তখন এক খণ্ড ঈষৎ কালো মেঘ দক্ষিণ থেকে ধীরে ধীরে ভেসে আসতে লাগল। খড়ম পায়ে উঠোনে পায়চারি করছিলেন হাজি কলিমুল্লা, আকাশের দিকে চেয়ে তিনি চমকে উঠলেন। তাহলে তাঁর আন্দাজই ঠিক?

জৈগুন! ও জৈগুন!' তিনি থমকে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন,—'দেখে যা, আমরা যা ভাবছি তাই ঠিক। আসমানে সাজ দেখা দিয়েছে।'

জৈগুন চৌকাটের কাছে এসে মুখ বাড়িয়ে বললে,—'তবু তো আপনি বলছেন আরো পরখ করতে। আমার মনে কোনো সুবা-সন্দে নাই। বাতাসী

খা ছিনাল।'

আকাশে চলমান মেঘটার দিকে চেয়ে আবার পায়চারি করতে লাগলেন হাজি কলিমুল্লা, এর বিচারটা কি হবে তিনি তার কিনারা করতে পারছেন না।

আধ ঘণ্টা পরে জোহরা যখন এল, শুয়ে শুয়ে তার সঙ্গে আলাপ করতেও বার বার তাল কেটে যেতে লাগল, অনেক রাত পর্যন্ত চোখে ঘুম এল না!

মনস্থির করে পরদিন সকালে তিনি গিয়ে উঠলেন বাতাসীর বাড়িতে, পূব পাড়ার আম বাগানের ওধারে। বাঁশের চালার নীচটায় পাকালের ধারে বসে ও খুদের জাউ রাঁধছিল, হাজি সাহেবের সাড়া পেয়ে একটা চৌকি হাতে উঠানে এল। এমন গণ্যমান্য লোক, সাত জন্মে একবার এসেছেন ওর এখানে, কি দিয়ে মেহমানদারি করবে, সে ঠাহর করতে পারল না।

মাথায় কাপড় টেনে ও কি বলছিল সেদিকে হাজির মোটেই নজর ছিল না, তিনি গোপনে আড়চোখে হরিদ্রাভ লাবণ্য-স্নিগ্ধ ওর দেহটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন।

এদিকে বাড়ির নাশতা-পর্বের তদারক শেষ হওয়ার পর জোহরা গুম হয়ে বসেছিল তার শোবার ঘরে চৌকির কিনারায়।

বিয়ে হওয়ার পর থেকে কিসের যেন এক আশ্চর্য মায়ায় বিনা কাজের সময়টুকু সে এখানটায় বসেই কাটিয়ে দেয়। এ কিসের জাদু? কিসের মন্ত্রণা? জোহরা তা বুঝতে পারে না। বাড়ির চেহারা বোধ হয় অনেক দিক থেকেই অদল-বদল হয়েছে, কিন্তু এ কামরাটায় কোন পরিবর্তন নেই, দিনে দিনে নতুন জিনিস যোগ হয়েছে মাত্র। আগেকার গিন্নিদের হাতের ছাপ অনেক কিছুতেই এখনও টাটকা হয়েই আছে, অন্ধকারে বসে থাকলে তাদের ঠোঁটের ফিস্‌ফিস্ আলাপ যেন সে শুনতে পায়। তখুনি ওর মনে হয়, এঘরে ঢোকবার কোনো অধিকার তার নেই, এখানকার সব দখল করে সে ডাকাতের কাজ করল।

কিন্তু, আমার কি দোষ? আমি তো রাজি হতে চাইনি? নানা বলল, বোন, কাঁদিসনে, দু'একটা বছর সবুর কর, বুড়োটা মরল বলে। তখন বেশ জোয়ান দেখে একটা বর জুটিয়ে দেব। এখন সম্পত্তিটা হাত করে নে।'

জোহরা আপন মনে আওড়াল,—'ছাই সম্পত্তি !'

দগদগে ঘা'র ওপর দিয়ে গরম বাতাস বইতে থাকলে যেমন করে জ্বলে, ওর বুকের ভিতরটা তেমনি করে জ্বলতে লাগল। দম যেন ক্রমেই বন্ধ হয়ে আসছে। এক সময় সে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। ওর চোখের দুটো তারায় জ্বলজ্বল করতে লাগল একটা দুর্বিনীত বন্যতা।

মগজটা গিস্‌গিস্ করছিল, এলোচুলে ঝাঁকড়া মাথাটা একবার ঝাড়া দিয়ে জোহরা বাইরে চলে এল। চোখ তুলে চাইতেই ওর দৃষ্টি পড়ল কুয়োর ধারে মেহেদি গাছটার দিকে, ভিজে মাটির রসে তাতে ঘন হয়ে কচিপাতা দেখা দিয়েছে।

ক'দিন সংকল্প করেও সে মেহেদি গাছটা কাটতে পারে নি। কিন্তু আজকে ডান হাতটা শিব্‌ শিব্‌ করতে লাগল। ত্রস্ত পায়ে সে চলে গেল বান্নাঘরের ভিতরে। সেখান থেকে ধারাল বঁটিটা এনে একেক্ কোপে একেকটি ডাল কেটে ফেলতে লাগল।

'আহা হা, করেন কি গিন্নিমা'—জৈগুন দৌড়ে এল। বলল,—'গাছটা অনেক দিনের, মানুষের কতো কাজে লাগে। কর্তা শুনলে ভীষণ রাগ করবেন।

'তুই এখান থেকে যা তো। কে রাগ করবেন না করবেন, তোর চাইতে আমি ভালো বুঝি। আমার ইচ্ছা হয়েছে, আমি কাটবোই।'

'আমি কাম করে খাই, আমার কি ? আপনার ভালোর জন্যই বলছিলাম।

'আশ্চর্য !' জোহরা মুখ তুলে চাইল। বলল,—আমার ভালো মন্দের চিন্তা তোকে করতে হবে ? দুনিয়াতে আর লোক নেই !'

কর্তার প্রিয় গিন্নিকে ঘাঁটাতে সাহস করল না জৈগুন, মুখ কালো করে সে নিজের কাজে চলে গেল।

কেমন করে দুপুর হল, কেমন করে এল বিকেল, আর কেমন করেই বা রাত্রি এসে পৃথিবীর মুখ ঢেকে দিল, জোহরা কিছুই বলতে পারবে না। তার হৃদয়ের একটা অংশ কে যেন ঝকঝকে ধারাল ছুরি দিয়ে কেটে নিয়ে গেছে, প্রতিদিনের উচ্ছল ঢেউ সেখানে লাগে না, সেখানে তুষের আগুনের মতো শুধু একটি জ্বালা।

এশার নামাজের পর বিছানায় শুয়ে হাজি কলিমুল্লা বললেন,—'যা ভেবেছিলাম বাতাসীই কুকাম করেছে।'

'কেমন করে জানলেন ?—জোহরা শুধাল।

'এ সব জানতে কি আর খুব বুদ্ধি লাগে? তারে ঠিকমত ঘা দিলাম, আর তা বেজে উঠল। ব্যস, আর ভাবনা নেই। বিচারটা করতে পারলে বিষ্টি হবেই।' হাজি একটুখানি নীরব থেকে বললেন,—'আগামী শুক্রবারে রাত বারোটার পর বিচার বসাব। দেখা যাক কী হয়।

জোহরা চুপচাপ শুয়ে বাইরের দিকে কান পেতে রইল। আমের বোলের গন্ধ এমন মাতাল কেন? রাত কেন এমন কালো, অন্ধকার? সূর্য যদি আর না উঠত তাহলেই ছিল ভালো, সবার চোখের আড়ালে চিরদিনের জন্য সে হারিয়ে যেত, যেখানে কেউ নেই, কেউ থাকবে না।

কপালে কোমল হাতের ছোঁয়া পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই নাক ডাকাতে শুরু করলেন হাজি কালমুল্লা। ওই শব্দটুকু বাদ দিলে, জোহরার মনে হল, তার পাশে শুয়ে আছে একটা মৃতলোক, বুক থেকে পা পর্যন্ত সাদা কাপড়ে ঢাকা। সে লোমশ হাতটা ছাড়িয়ে কিছুক্ষণ চুপ হয়ে রইল। এরপর আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল। অতি সন্তর্পণে দরজার খিলটা খুলে উঠানের একপাশে আমগাছ তলায় এল।

'সারাদিন কোথায় ছিলে তুমি?' খালেদ চুপি চুপি বাড়ির ভিতরে ঢুকতেই সাঁ করে তার সামনে গেল জোহরা, চাপা-গলায় বলল,—না খেয়ে থাকতে খুব ভালো লাগে, না? কথা বলার চেষ্টাও না করে খালেদ থ হয়ে রইল। হঠাৎ ডান হাতটা তুলে ওর গালে একটা চড় মেরে ক্ষিপ্তের মতো জোহরা বলল, আমি আর এত কষ্ট সইতে পারব না। বাড়ি থেকে চলে যাও, চলে যাও তুমি!'

কাপড় দিয়ে মুখটা ঢেকে ও প্রায় দৌড়ে উঠে গেল বারান্দায়, ঘরের ভিতরে গিয়ে খিল এঁটে দিল।

খালেদ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল। তার দুই চোখ থেকে ঝরঝর করে পানি পড়ছে, কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে। ভোর বেলায় অন্যেরা ঘুম থেকে ওঠার আগেই সে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল, নদীর ধারে ধারে জমির আলের ওপর দিয়ে, মিছিমিছি সে হেঁটে বেড়াল, এর পর চলে গেল বন্দরে, তার বড় দুই ভাই যেখানে কাজ করেন, সেই গদিতে; কিন্তু কোথাও মন টিকলো না। শেষ পর্যন্ত কী যেন এক অজানা আকর্ষণে বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়েছিল।

শুক্রবারে রাত বারোটা বেজে গেলে একে একে সবাই গিয়ে হাজির হল মৌলানা মহীউদ্দিনের বৈঠকখানায়। এর আগেই কানাঘুষার মারফতে

ব্যাপারটা সারা গ্রামে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সবার তো আর বিচারের ক্ষমতা নেই? আজকের মজলিস শুধু গ্রামের আলেম মণ্ডলী ও মাতব্বরদের নিয়ে। দরজা-জানালা বন্ধ করার পর আসামীদের মাঝখানটায় বসিয়ে তাঁরা আলোচনা শুরু করলেন।

তিনদিন তিনরাত্রি হাদিস-কিতাব ঘেঁটে একটা ফতোয়া তৈরী করেছিলেন হাজি কলিমুল্লা। মৌলানার অনুমতি নিয়ে তা পড়ে শোনালেন।

বাতাসী অনেক আগে থেকেই বিনিয়ে বিনিয়ে গুনগুন করছিল, এবারে ডুকরে কেঁদে উঠল। বিলাপ করে বলতে লাগল, ও মা গো, এ-ও আমার কপালে ছিল গো। আঁতুড়ঘরে কেন মুখে নুন দিয়ে মেরে ফেললে না গো!'

'এই বেটি কান্না থামা!' হাজি ধমক দিয়ে উঠলেন। বললেন,—সে সময় বুঝি খুব ফুর্তি লেগেছিল?'

মৌলানা মহীউদ্দিনকে বেশ চিন্তিত মনে হল। তাঁর সৌম্য মুখমণ্ডলে বেদনাতুর গাম্ভীর্যের কান্তি। ধীরে ধীরে মুখ তুলে শান্ত গলায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন—'কিগো, তোমার কিছু কওয়ার আছে?'

'কি কইব বাবা, আপনারা তো গরিবের কথা বিশ্বাস করেন না। আমরা তো মানুষ নই, কুকুর বেড়াল। আমাদের আবার ইজ্জত কি!' বাতাসী চোখ মুছে বলল —'না হলে এমন বদনাম আপনারা আমার উপর ফেলতে পারতেন!'

'কিন্তু এসব কথা তো আর আসমান থেকে পড়ে না!' হাজি কলিমুল্লা বললেন,—'অন্য কারো নামে তো ওঠেনি?'

'সে আমার কপালের দোষ। না হলে, সে বেঁচে থাকতেও আমি কতবার বমি করেছি, প্রতিরোজ পোড়ামাটি আর তেঁতুল না খেয়ে থাকতে পারিনি—এসব জিনিস কারো চোখে পড়ত না!'

একটা ময়লা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে বসে বসে কোঁকাচ্ছিল বাতাসীর মামাতো ভাই রহিমদ্দি। তাকে সওয়াল করায় সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল শুধু।

বিচারের আলোচনা যখন এগিয়ে চলছিল, তখন দক্ষিণ দিক থেকে পালে পালে কালো মেঘ এসে সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলেছিল। চাঁদ বারে বারে আড়ালে পড়ছে, গাছপালা ও খামারে-নদীতে আলো-ছায়ায় লুকোচুরি।

এক সময় বাতাস বন্ধ হয়ে গেল, অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল সারাটা প্রকৃতি। ঘরবাড়ি কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে মাঝে মাঝে গুরু গুরু আওয়াজ উঠল, সঙ্গে সঙ্গে

চমকাল বিদ্যুৎ। ঘরের ভিতর সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল।

ঠিক এমনি সময় হাজি সাহেবের বাড়ির পিছনটায় আমগাছের নীচে দাঁড়িয়ে ছিল একটি মানুষের ছায়ামূর্তি। পা টিপে টিপে খোলা জানলার কাছে এসে অনেকক্ষণ সন্ধানী দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, ঘরের ভিতরে আলো নেই; নাম-না-জানা অরণ্যের ভিতর কোন প্রেতপুরীর মতো সমস্ত বাড়িটা রুদ্ধ-নিশ্বাসে ঝিম ধরে আছে।

জানালা থেকে সরে এসে মূর্তিটা ভিটির ধার ঘেঁষে চলতে শুরু করল, রান্নাঘরের পাশ দিয়ে ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। একেকবার বিজলি চমকায় আর সে যেন শিউরে ওঠে গভীর আতঙ্কে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাতাস বইতে শুরু করল, মেঘে মেঘে সংঘাতে গর্জনে চারিদিক তোলপাড় হতে লাগল। দরজাটা হয়তো ভেজানো ছিল, আচমকা দমকা হাওয়ায় তা সশব্দে খুলে গেল। মানুষটা ত্রস্ত পদে এসে উঠল। এদিক ওদিক খানিক চেয়ে এক সময় মরিয়া হয়েই যেন ঘরে ঢুকে পড়ল। ওপরে নীচে কেবল শব্দ, শব্দ আর শব্দ। জোর বাতাসের তোড়ে একবারে মোচড় খেয়ে ওঠে করগেটের চালগুলি, কাঠের বেড়ায় অবিরত ধুপধাপ আওয়াজ।

খাটের কাছে এসে ইতস্তত করতে লাগল মানুষটা, কি করবে যেন ঠিক করে উঠতে পারছে না। শরীরে রোমগুলি কাঁটা দিয়ে উঠছে, ঢিবঢিব করছে হৃৎপিণ্ড, চিনচিন্ করে মস্তিষ্কে রক্ত উঠে চোখ দুটো ঝাপসা করে দিচ্ছে। তার ভাবনা, কোথায় এল সে? একি জন্ম, না মৃত্যু? একি সব হারানোর হাহাকার, না মিলনের উন্মত্ত রংরাগ? কান পেতে সে যেন শুনল, চুড়ির রিনিঠিনি, একটি গভীর শান্ত নিশ্বাস, কাপড়ের মৃদু খস্‌খস্। ঘ্রাণ আসছে, একি আমের বোলের, না চুলের গন্ধ? না, না, এখানে নয়। এ তো সে চায় না, চাইতে পারে না।

এক পা দু'পা করে সে পিছিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় অনুভব করল; একটা সুপুষ্ট নগ্ন মসৃণ হাত অন্ধকার থেকে উঠে এসে গানের কলির মতো পরম আশ্বাসে তার হাতকে আকর্ষণ করল।

তখন সমস্ত আকাশে মেঘেদের হুড়োহুড়ি লুটোপুটি লেগে গেছে, মন্দ্র-গর্জনে একেবারে কেঁপে কেঁপে উঠছে সারা পৃথিবী। একটানা ঝড়ের তীব্র বেগে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে গাছপালা, মত্ত হয়ে কে যেন লেগেছে লুণ্ঠনের উচ্ছৃঙ্খলা তৎপরতায়। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল মন্থন করে যেন এক মহাপ্রলয়ের উচ্চকিত

শব্দের ভয়ঙ্কর-সুন্দর রাগিণী।

এইভাবে কতক্ষণ ঝড় চলল হয়তো কেউ বলতে পারবে না। বাতাস যখন কমতে লাগল, তখন অযুত মুক্তাবিন্দুর মতো নামল বৃষ্টি।

ধারাল হাওয়ার সঙ্গে প্রথম যখন বৃষ্টি নামল, তখন তাতে রইল শুধু নবজাতকের বিক্ষোভ, ঘর-বাড়ির ওপর ঝর ঝর ঝাপটা দিয়ে গেল। কিন্তু বেশিক্ষণ এ রইল না। ধ্রুপদ সংগীতের বিলম্বিত লয়ের মতো বাতাস যতই কমতে লাগল, বর্ষণে ততই এল নির্বিড়তা। এর পর শুধু ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ।

এইভাবে কতক্ষণ কেটে গেল জানা নেই। এক সময় খোলা দরজা পার হওয়ার পরে উঠোনে নেমে বৃষ্টির মধ্য দিয়েই টলতে টলতে উত্তর ভিটির ঘরের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল মানুষটা। তার পিছনে পিছনে এসে জোহরা এলো-মেলো কাপড়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। তার শরীর ভিজে যেতে লাগল বৃষ্টির ছাটে।

খানিকক্ষণ পরে একটা ছাতা মাথায় ঘাড় নীচু করে ধুঁকতে-ধুঁকতে বাড়িতে ঢুকলেন হাজি কলিমুল্লা। হঠাৎ তাকে দেখতে পেয়ে জোহরা বলে উঠল,—'অত দেরি যে! এদিকে আমার বড্ড ডর লাগছে।'

'কি আর করি বল, আপদ চুকিয়ে এলাম।' ছাতাটা বেড়ায় ঠেস দিয়ে রেখে হাজি বললেন,—সে একটা পাঁড়-হারামজাদী, শেষ পর্যন্ত কিছুতেই দোষ স্বীকার করল না। কিন্তু বাতাসীর মতো মেয়েলোকের ফা-ফুই বুঝি আমি ধরতে পারি না? ফুটো-ক দিলাম পঞ্চাশ জুতো করে, তার ওপর কালকে গাঁ ছেড়ে চলে যাবে। দেখলে আল্লার রহমৎ? সঙ্গে সঙ্গে বিষ্টি নামল!'

'হ্যাঁ, তাইতো বড় তাজ্জব ব্যাপার!' কথাটা শেষ করে ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টির মধ্যে বারান্দা থেকে উঠোনে নেমে গেল জোহরা, তার অঙ্গভঙ্গি রহস্যময়।

হাজি হৈ হৈ করে উঠলেন,—'আরে, আরে করছ কি? তুমি পাগল হলে নাকি? এত রাত্রে ভিজছ, সর্দি করবে যে।'

'না, সর্দি আমার কোনো কালেই করে না।' জোহরা বারান্দার কাছে এল। চোখের উপর থেকে একরাশ চুল ডান হাতে সরিয়ে ফোটা-ফুলের মতো উচ্ছল মুখটা তুলে মধুর হাসি-ওপচানো ঠোঁটে বললো—আপনি জানেন না? বছরের পয়লা বিষ্টি, ভিজলে খুব ভালো। এতে যে ফসল ফলবে।'

পরবাসী

হাসান আজিজুল হক

কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করল সে। কিছু একটা শব্দ। কিন্তু কিছুই শোনা গেল না। বাতাসের কিংবা পাতা ঝরার শব্দ—কোন কিছুই তার কানে এলো না। এই এতটুকু সময়ের মধ্যেই মাটি বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। নিঃশব্দ শিশিরের হিমে স্নান করে বিবর্ণ পাতাগুলো ভিজে। শীতের শেষ বলে সারাদিন ধরে উত্তর দিক থেকে ঝড়ের বেগে বাতাস দিয়েছে—খোলা মাঠ পেয়ে বাতাস হু হু করে দৌড়ুতে দৌড়ুতে শরীরের সমস্ত উত্তাপ শুষে নিয়ে চলে গেছে। তারপর নতুন করে আবার ঝাপটা এসেছে। কিন্তু সন্ধ্যার সূচনাতেই বাতাস দু-একবার ডানা ঝাপটা দিয়ে, শুকনো পাতা ঝরিয়ে একেবারে এদেশ থেকে বিদায় নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে এসেছে বড় বড় মাঠ, ছিলেছিলে পানি-জমা ডোবা এবং খাল, আধশুকনো হলদেটে অপরিচিত লতাপাতা কাঁটা-গুল্মের স্তূপাকার জঙ্গল। ওর চারিপাশের কয়েক হাত জায়গা বাদ দিয়ে নিউমোনিয়া রোগীর শ্লেষ্মার মত জমে বসেছে কুয়াশা। সারাদিনের ঝড়ো বাতাসের জায়গায় এসেছে কুয়াশা। সেই কুয়াশা এবং ম্লান রংএর আকাশ ও বাসি মড়ার মত জলো অন্ধকারের নীচে তার চারিপাশের পৃথিবীটা স্তব্ধ হয়ে গেল। সে কান পেতে কিছু একটা শোনার চেষ্টা করল। কিছু একটা শব্দ। কিন্তু কিছুই শোনা গেল না। বাতাসের কিংবা ঝরা পাতার শব্দ, নিদেন পক্ষে শুকনো পাতার ওপর শিশির পড়ার টপ টপ শব্দ অথবা কোন ছোট বন্য প্রাণীর চকিত পদধ্বনি। কোন কিছুই তার কানে এলো না। মোটা ছেঁড়া র‍্যাপারটা ভালো করে জড়িয়ে সে এবড়ো-খেবড়ো মাটির ওপর, খড়ের রংএর ভিজে দুর্বার ওপর দুই কনুইএর ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে কুয়াশার দিকে চেয়ে রইল।

এখন একমাত্র বক্ষস্পন্দন ছাড়া ওর কাছে শব্দের জগৎ সম্পূর্ণ-রকমে হারিয়ে গেলেও, সারাদিন এবং সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর পর্যন্ত অবশ্য অজস্র শব্দের বিরাম ছিল না। অনেক দূরের কালো পীচঢালা রাস্তা দিয়ে গোঁ গোঁ করে বাস-ট্রাক

যাচ্ছিল। মিষ্টি, দ্রুত স্বল্পস্থায়ী শব্দ করে ছোট গাড়িগুলির—এমন কি তীক্ষ্ণ হুইশেল বাজিয়ে ঝক ঝক করে যে ট্রেন গেল তার শব্দও শুনতে পেয়েছে। একরকম সারাদিনই এসব শব্দ সে শুনেছে। নির্জন মাঠটিতে বড় ঝোপটার ভিতরে শুয়ে শুয়ে তার আকাশ-পাতাল ভাবনার সঙ্গে এইসব শব্দ মিশে গেছে। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার ওপর দিয়ে একঝাঁক কাক উড়ে গেছে, জোড়ায় জোড়ায় বক উড়ে গেছে, তারপর দেখা দিয়েছে শঙ্খচিল, সকলের শেষে একটি দুটি একাকী পাখি, তার মধ্যে একটা বিরাট পাখি বিশাল পাখা অনেকক্ষণ পরে পরে নাড়তে নাড়তে, পা দুটি পিছনে ফিরিয়ে মাটির সঙ্গে সমান্তরাল করে, সুন্দর মাথাটি এদিক ওদিক ঘুরিয়ে চলে গেছে। সোঁ সোঁ শব্দ তুলে পরম নিশ্চিন্তে সে আকাশের পুব কোণের দিকে ছোট হতে হতে একসময় মিলিয়ে গেছে। মাঠের একপ্রান্তে গ্রামটার বাঁশঝাড়ে ছোটবড় অসংখ্য পাখি তখন একসঙ্গে কলরব শুরু করেছে। রাত আর একটু এগোনোর সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য ওদের কাউকেই আর দেখা যায়নি। সে তখন শীতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে র‍্যাপারটা ভালো করে মুড়ি দিয়ে, পেটের কাছে ব্যাপারের বিরাট ফুটোটা লুঙ্গি দিয়ে ঢাকতে গিয়ে নিজেকে প্রায় বিবস্ত্র করে ফেলেছে এবং এই অবস্থার মধ্যেও প্রচণ্ড খিদে অনুভব করেছে। ময়লা ছোট একটুকরো কাপড়ে বাঁধা মোটা চিড়ে বের করে অন্যমনস্কের মত চিবুতে চিবুতে সে ভাবল, হুঁ, অবা ঘুমুইতে গেল।

এরপর অনেকক্ষণ সে আর কিছুই ভাবেনি। একটা খালে জমা পানি অতি সাবধানে কাদা বাঁচিয়ে আঁজলাভরে তুলে খেয়ে টলতে টলতে হাঁটতে শুরু করেছে। শীত যখন দুর্দম হ'য়ে উঠল, মাথা হয়ে উঠল নিরেট একটা বরফের চাঙর, পা দুটি যখন তার অবশ হয়ে এলো তখন পশুর মত সে এই শুকনো খালটায় আশ্রয় নিল। কোনরকমে গুটিশুটি মেরে একটু গরম পেতেই আবার ভাবতে পারল সে। ভাবতে গিয়ে দেখল তার চারিদিকের পৃথিবী জমে গেছে। সে ভাবল, তাইলে রাত তো অ্যানেক হল্‌ছে। শালো কতক্ষণ হাঁটছি গ—কোতো এ্যালোম তা যি মু'টই ফোম করতে পারছি না। আর শালার আচ্ছা জাড় বটে!

ফসলকাটা মৃত মাঠের কঠিন শীতের মধ্যে উবু হয়ে থাকা মানুষটার ভোঁতা মাথার মধ্যে এ বছরের প্রথম শীতের চিন্তা এলো। চিৎকার শুনতে পেলে যেন, বচির বচির র‍্যা, এ বচির, ঘুম মারচিস শুয়ে শুয়ে, মুনিব যি কান কাটবে

র‍্যা। আচ্ছা ঘুম র‍্যা তোর। চিৎকারটা যেন সে একবারই শুনল তার মাথার ভিতরে। তারপর আবার স্তব্ধ সব।

এবারে প্রচণ্ড শীতই গেল বলা চলে। শীত এলো যেমন সকাল সকাল, অঘ্রাণ ভালো করে পড়তে না পড়তেই, তেমনি তাড়াতাড়ি যাওয়া তো দূরের কথা, মাঘের এই শেষদিকেও তার দাঁতের তীক্ষ্ণতা একটুও কমেনি। এবারে শীত এসেছিল হেমন্তকে বেশীদিন তার শব-শয্যায় শুয়ে থাকার সুযোগ না দিয়েই। শরতের শেষে গাছের পাতাগুলি মোটা ও হল্‌দেটে হবার উপক্রমেই এবং শীত শীত বাতাসের আমেজ ভালো করে অনুভব না করতেই হুড়মুড় করে জাড়কাল এসে পড়ল। প্রত্যেক বছরের মতই বুড়োরা বলল, জাড়বটে বাপু, জাড় বটে। হাড়কাঁপুনি জাড় ইয়াকেই বলে, এতোটা বয়েস হোল, চুলদাড়ি পাকিয়ে ফ্যাললোম, এমুন জাড় কুনদিন ভ্যাখলোম না।

প্রত্যেক বছরের মতই জোয়ানরা হেসেছে এ কথায়, উ তুমাদের ওমনি মনে হচে। আমাদের জাড় য্যামুন মালুম হচে না, আমাদের বয়সে তুমাদেরও তেমনি জাড় লাগত না। উ কিছু লয় গো, অক্তটোই আসল। মাথা নেড়ে কেউ সায় দিয়েছে, তা হবে, অক্তটোই আসল। তোদের বয়সে জোস্তা থাকলে পোষ মাসেও রাত দুপুর পয্যন্ত ধান কেটেচি, ভুলকো তারা দেখে মাঠে গেইচি—ঐটোই কথা, অক্তটোই আসল।

কিন্তু যে দু'চারজন বৃদ্ধ সায় দেয়নি, শেষ পর্যন্ত তাদের মতটাই সবাই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে এ বছরে। সত্যি করেই প্রচণ্ড শীত এসেছে। বিশেষ করে মধ্যরাতের এই সমতল চ্যাপটা দেশে ঠাণ্ডাটা যেন আকাশ থেকে উপচে উপচে পড়েছে। অঘ্রাণের শুরুতেই উত্তুরে এলোমেলো ঝড়ো বাতাস সারা দিনে দেশটির শরীরে হিমের কালো পরদা ফেলেছে এবং সন্ধ্যার পর সেই বাতাসের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে মাটি বরফকুণ্ড হয়ে গেছে। ধবধবে শাদা মাটির দেশ এ বছরের শীতে কালো হয়ে গেছে এবং সে দেশের সবাই তা লক্ষ্য করেছে। পাতলা পিছল কালচে একটা আবরণ পড়েছে মাটির ওপর—সেটাকে কোনমতেই শরতে ধানের জমিতে জমা ঘন শ্যাওলার আস্তর বলা চলে না।

এই কঠিন শীতে এ বছরের কাজ আরম্ভ হয়েছে। শীত কি করতে পারে যতক্ষণ হাতে কাজ আছে? শীত যত প্রচণ্ডই হোক না, যতই নিরাশাব্যঞ্জক হোক ফলনের পরিমাণ এবং হোক না সেই ফসলের অর্ধেকটাই জমির

মালিকের বাড়িতে তুলে দিয়ে আসতে, তবু শীত কি করতে পারে? কাজেই গোটা গাঁয়ের কাস্তে সচল হয়ে উঠেছে যথারীতি। মোটা ছেঁড়া র‍্যাপার কিংবা ময়লায় দুর্গন্ধ কাঁথা গায়ে দিয়েই মানুষগুলিকে শীত এবং উত্তুরে বাতাসের সম্মুখীন হতে হয়েছে। পৌষের মাঝামাঝি আসতেই রূপোর মত সাদা হয়ে এলো সামান্যমাত্র ইস্পাত ছোঁয়ানো লোহার কাস্তে। মাঠের ধান কাটা হয়ে গিয়ে আঁটিবাঁধা শেষ হোল—যুদ্ধক্ষেত্রে অগণিত মৃত সৈনিকের মত মোটা মাথার আঁটিগুলি জমিতে পড়ে রইল কিছুদিন। শিশিরে ধুয়ে ধুয়ে ধানের শিষগুলো চকচকে সোনার বর্ণ নিল। এরপর কাস্তের কাজ মোটামুটি শেষ হোল। গাঁয়ের মুচির তৈরী তোবড়ানো উৎকট চটি পায়ে হট্ হট্ হেঁটে আঁটিগুলিকে ছোট ছোট পাহাড়ের মত সাজাতে শুরু করল ওরা।

সমতল চ্যাপটা দেশ থেকে তখন সবুজের চিহ্ন বিলুপ্ত হয়েছে—খাল-গুলোতে মিশমিশে কালো রং-এর কাদা ছাড়া আর কিছু নেই। কাদাখোঁচায় লম্বা ঠোট খচ খচ করে ক্ষতবিক্ষত করছে কাঁচা কাদাকে, বক ঠ্যাং-এর ওপর ভর দিয়ে কালোয় সাদায় মেশানো বিরাট সারস লম্বা সারি দিয়ে বসতে শুরু করেছে। উত্তুরে বাতাস দিন দিন সঙ্কুচিত করতে শুরু করল দেশটাকে, গাছগুলো সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে গেল এবং ঘাসপাতার রং-এর সঙ্গে রং মিলিয়ে দিয়ে গাঢ় সবুজবর্ণের ফাড়িং মেটে হয়ে গেল। আর ধূসর চ্যাপটা দেশ গরুর গাড়ির নেমিচিহ্নিত সমান্তরাল চওড়া রাস্তায় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে গেল।

এই সমগ্র শীতকালটা, শীত আক্রান্ত দেশের এই ছবিটা তার অশিক্ষিত প্রায়-বর্বর মনে আবছাভাবে ভেসে ওঠে। পুঙ্খানুপুঙ্খতার দিক থেকে ওপরের বর্ণনা অনেক বেশি সঠিক—কিন্তু ওর মনের ছবিটা অনুভূতির সজীবতায় গাঢ় এবং উত্তপ্ত। কাজেই শুকনো খুঁটিনাটি অনেক বাদ পড়লেও সে যোগও করল অনেক কিছু এবং ছবিটা তার কাছে চরম সত্য ও সমগ্র হয়ে উঠল। ছবিটাকে যখনই সে পেয়ে গেল, সেই শীতঝরা বীভৎস স্তব্ধ নির্জন রাত্রির আকাশের নীচে অসাড় হয়ে যেতে যেতে, ক্ষুধায় চেতনা হারাতে বসেও সে তুকনুহ-এর ওপর ভর দিয়ে সে আকুল হয়ে পিছনের দিকে ঘাড় ফেরাল। কুয়াশা জমাট হয়ে তার চোখের ওপরই পর্দা ফেলল।

সে কিছুই দেখল না। প্রান্তর নিথর হয়ে রইল। যে খালটায় সে আশ্রয় নিয়েছিল তা তাকে উষ্ণতা দেবার পরিবর্তে বড় বড় দাঁত দিয়ে কামড়াতে লাগল। তবু গোল একটি পুঁটুলির মত হয়ে সে মনের চোখে ছবি দেখে আর

তার কানে স্পষ্ট ভেসে আসে, বচির, বচির র‍্যা—এ্যাই বচির, ঘুম মারচিস শুয়ে শুয়ে কান কাটবে ঘি মুনিব!

চিৎকার করে যে ডাকত তার আর বেশি কষ্ট করতে হোত না। বশির বৌ এর শরীরের ওম থেকে এক ঝটকায় নিজেকে সরিয়ে নিত। বিছানা ছেড়ে ঠাণ্ডা মেঝেয় মাংসল একটা শব্দ করে পড়ত সুডৌল হাতটা। আট বছরের ছেলেটা সরে যেত বিছানা ছেড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই নুয়ে পড়ত বশির, বৌ এর হাতটা আস্তে আস্তে তুলে গলার ওপর রাখত, বাচ্চাটাকে আর একবার কাছে টেনে নিত। তারপর সাবধানে কাঁথা সরিয়ে সে বিছানার বাইরে আসত। র‍্যাপারটা দড়ি থেকে টেনে নিয়ে মাথা থেকে সমস্ত শরীরটা ঢেকে নিত। অন্ধকারের মধ্যে কাস্তেটা চকচক করতে থাকে—পেতে একটুও দেরী হয় না তার। আমকাঠের পলকা দরজা খুলে সে বেরিয়ে আসে, চাচা লিকিন?

হুঁ রে বাপু হুঁ—ডেকে ডেকে হয়রান হচি, কি ঘুম র‍্যা তোর আঁ—ওয়াজদ্দির কণ্ঠে অপ্রসন্নতা, চ এখন, দেরি হয়ে যেচে আবার, বিশে কত্তা লোকটা বেশি সুবিধের লয়,বুইলি না? কত্তার সাঁওতাল মুনিষ কটা আর উদের কামিনীগুলোর তো ঘুম নাই রেতে—শালোরা সারারাত মদ মারে, আর তিনপোহর রাত থাকতে মাঠে যেয়ে হাজির হয়। ওদের লিয়ে হয়েছে আমাদের বেপদ। রাত দুপুরে যেতে হবে এই জাড়ে। চ বাপু এ্যাকোন তাডাতাড়ি।

যেচি যেচি—বশিরের তাড়া নেই, একটু তামুক খেয়ে লি দাঁড়াও এগু। দেরি হয়ে যাবে র‍্যা—তু তবে তামুক খা, আমি চললোম।

দাঁড়াও চাচা, বেস্ত হচো ক্যানে বলো দিকিন—এ্যাই দ্যাখো তো কতক্ষণ, লেলোম বলে।

বিশে কত্তাও বলবে লেলোম বলে, বলবে মানে মানে পথ দ্যাখো।

ভারি বয়ে যাবে তাইলে। পোষ মাসে কাজের অভাবটো কি? সব শালোর মুনিষের পেয়োজন। ভারি তোমার বিশেকত্তা।

বশির খড়ের পাকানো বিনুনি থেকে খড় টেনে ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলে।

খানিকটা খড় নিয়ে গোল একটা গুলি পাকায় সে—ধীরেসুস্থে দলাটাকে হাতের তেলোয় রেখে রগড়াতে থাকে, তামুক না খেয়ে বেরুতে পারব না বাবু—সে যোগ করে।

বারে বারে তামাকের কথা শুনে এই সাংঘাতিক শীতের ভোরে ওয়াজদ্দিরও তামাক খাবার বাসনাটা আস্তে আস্তে প্রবল হতে থাকে। দাওয়ার এক কোণে বসে পড়তে পড়তে বলে সে, লে বাপু, ছাড়বিনা য্যাকোন, দুটান দিয়েই লি। লে লে লুটি হযেছে, গুঁড়িয়ে ফেললি যে।

রগড়াতে রগড়াতে গোল দলাটাকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলে কলকির ওপর সেটাকে রেখে খট খট করে কড়া হাত দুটোয় চাপড় দেয় বশির। দাওয়ার কোণ থেকে চকমকি ইস্পাত শোলা এনে শোলায় আগুন ধরায় অভ্যস্ত হাতে, সেখান থেকে আগুন ধরায় খড়ের দলায়। তামাকটা যখন তৈরী হতে থাকে ওয়াজদ্দি চুপ করে চেয়ে থাকে ওর দিকে—শীতে হি হি করে কাঁপে সে, একটা ঠাণ্ডা বাতাস আসে, ঘরে ঘরে মানুষ জেগে ওঠে—ঘরের অন্ধকার কোণ থেকে ঝকমক করতে থাকা কাস্তে হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ওরা। কেউ নিজের ক্ষেতে, কেউ পরের ক্ষেতে।

বশির তামাক তৈরী করে টান দেবার নামে বার দুই চুম্বন করে হুঁকোটাকে। আস্বাদ করে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়ে সে হাত বাড়িয়ে দেয়, লাও।

ওয়াজদ্দি হুঁকো নিয়ে মিনিট পাঁচেক নিবিষ্ট মনে টান দিয়ে ধোঁয়ার মধ্যে প্রায় গোপন থেকে বলে, তামুকটো না খেয়ে কাজে যাওয়াটো কোন কাজের লয় বাপু।

ল্যায়কো? তবে? বললোম তুমাকে, তুমি বিশেকত্তা বিশেকত্তা করে তামুকের এ্যাটাই লষ্ট করে করে দিলে।

তোর ধান কটা কবে কাটবি? ওয়াজদ্দি প্রশ্ন করে।

ঐ কটা ধান বাপু—উ আর কতক্ষণ ৮ াবে। দ্যাড় বিঘে জমির ধান—উ শালো কাটলেও তিন মাস, না কাটলেও তিন মাস। মরশুমের পেরথম তো, কদিন না হয় মুনিষই খাটি, বুইলে না, কটো টাকা ঘরে আসবে তেবু। তোমার ধানটো কাটলে?

আমারটো? লে হুঁকো লে। আমারটো? শালোর পেটরোগা হেগো রুগীর মতুন ছিঁয়েপড়া ধান—কবে বেটে টিপ দিয়ে রেখেচি। আমার ধানের টিপ দেখিস নাই তু—ওয়াজদ্দি খ্যাঁকশেয়ালীর মত খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসে, পেল্লাই টিপ র‍্যা, খলখলের টিপ ঘাটতলা থেকে দেখা যায় জানিস, —একটো ছাগল লুকোনোও ফ্যার আচে। উ কতা বাদ দে দিকিন।

না, তা লয়, কথাটো তুমিই তুললে কিনা, তাতেই।

চ চ আর দেরি করিস না।

চলো।

ওরা বেরিয়ে পড়ে।

একটু দূরের আবছা অন্ধকারের মধ্যে একটা দল থেকে কেউ চিৎকার করে, কে?

ক্যারে ভক্ত লিকিন?

অ, অজদ্দি চাচো? আর কে গো সঙ্গে?

আমি র‍্যা ভক্তা। বশির জবাব দেয়।

অ, কোন্ মাঠ আজকে?

জামতলা। তোর?

ভেরেণ্ডাগড়ে। কার কাজে যাচ্ছিস?

বিশে কত্তার। তোর নিজের ধানটো কাটা হোল র‍্যা ভক্তা?

হয়েচে—বুইতে লাগব পশু থেকে। কদিন এসে পিটিয়ে দিস ধান কটা।

দোব, দোব। দোব না ক্যানে?

বশির ওয়াজদ্দি এগুলো। সকাল হয়নি এখনও। পাতলা একটা কুয়াশা পড়েছে। কালচে রং এর মাটি অল্প ভিজে এবং পাথরের মত কঠিন। গরুর গোয়াল থেকে ধোঁয়া এসে কুয়াশায় মিশেছে। ভারি একটা পর্দা পড়েছে গাঁটিকে ঘিরে। সেই পর্দা ভেদ করে ওরা মাঠে এসে পড়ল। ভিজে ভারি ধানের লুটিয়ে পড়া শিষ চাবুকের মত আঘাত করে পায়ের গোছায়। শির শির করে বাতাস দেয়, ধানে ধানে ঘষা লেগে শন শন শব্দ হতে থাকে এবং এই অল্প একটু শব্দ ছাড়া বিরাট খোলা মাঠের কোথাও কোন শব্দ নেই। অন্ধকারে ছায়ার মত মানুষগুলোকে হুস হুস করে হাঁটতে দেখা যায়। তারপর কুয়াশার পাতলা চাদর ছিঁড়ে হঠাৎ সূর্যের অজস্র আলো লাল হয়ে মাঠে পড়তেই দেখা যায় বিরাট মাঠে প্রায় জনারণ্য। তখন একটা শব্দ ওঠে, একটা বিশাল গম্ভীর গুঞ্জন—মাঠের আকাশ এবং বাতাস বেষ্টন করে বাজতে থাকে। এর অন্য কোন নাম নেই, একে জীবনের গুঞ্জন বলা চলে। বেঁচে থাকার গুঞ্জন—উষ্ণ উত্তপ্ত এবং চিরকালীন।

খালটায় গুটি মেরে শুয়ে এই ছবি দেখতে দেখতে এখন তার মনে হোল

সে মরে যাচ্ছে। মানুষ কেমন করে মরে যায় তা সে জানে না। কিন্তু তার মনে হোল মরার ঠিক আগে মানুষ তার সমস্ত জীবনের ছবি একবারে দেখতে পায়। তার আরও বিশ্বাস ছিল মরার সময় কেউ কিছু ভাবতে পারে না, সুখ দুঃখ অনুভব করতে পারে না, শুধু দেখতে থাকে। সেও কিছু ভাবতে পারছিল না—এই শীতে শরীরটার মত মনটাও অবশ হয়ে জমে গিয়েছিল, সে যেন সুখ দুঃখের অতীত হয়েছিল, কারণ আর তার কোন কষ্ট অনুভব করার ক্ষমতা ছিল না। এখন আর সে শীত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টাও করছিল না। কিন্তু তবু চোখ বন্ধ করে একদৃষ্টে মনের দিকে চেয়ে নিরীহ অসহায়ভাবে সে একটির পর একটি ছবি দেখতে পাচ্ছিল। স্পষ্ট রং-এ রং করা ছবিগুলো এবং সেগুলোতে যা কিছুই ছিল—মানুষ কিংবা প্রান্তর, আকাশ অথবা বৃক্ষ সবকিছুই যেন তার গা ঘেষে স্পর্শ করে যাচ্ছিল।

সকালের সেই আশ্চর্য গুঞ্জনের সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে কাস্তে চালোনোর ঘস্ ঘস্ শব্দ, শুকনো শামুক বা কাঁকড়া পায়ের নীচে কুড় কুড় করে গুঁড়িয়ে যাওয়া, হঠাৎ কোন ইঁদুরের পালিয়ে যাওয়া, গুঞ্জন ছাড়িয়ে অতর্কিত চিৎকার এবং মেঠো সুর, ধানকাটা, আঁটি বাঁধা, ধানের স্তূপ সাজানো এবং ধান বোঝাই মোষের গাড়ির মন্থর গতি এবং তৈল পিপাসু চাকার চিৎকার, রেষারেষি করে ধান পেটানোর ধুপধাপ শব্দ এবং আরও অসংখ্য খুঁটিনাটি—তার দেশের মাটির এবং তার নিজের জীবনের অজস্র ঘটনা তার হৃৎপিণ্ডের সামনের বুকের দেয়ালে প্রতিফলিত হতে থাকে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লাল রোদ কটকটে সাদা হতে থাকে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হয়—গুনগুন ধ্বনিটা আস্তে আস্তে মাঠের নিস্তব্ধতার উচ্চকণ্ঠের চাপে ডুবে যায়— অসংখ্য কাস্তে একসঙ্গে দুপুরের রোদে ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

এই ছবিদের সঙ্গে সঙ্গে গায়ে গায়ে লাগালাগি করে শেষ ছবিটা এসে মনের ওপরে সেঁটে গেল। আগাগোড়া কেঁপে উঠল সে। ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইল চিত্রটাকে। অন্ধকার দিয়ে লেপে দিতে চাইল। কিন্তু স্থির হয়ে ছবিটা ঝুলে রইল—সে দেখতে বাধ্য হোল, কেঁপে উঠল, চিৎকার করে উঠতে চাইল—কিন্তু তবু চিটচিটে আঠার মত জড়িয়ে রইল সেটা।

মাঠ থেকে সেদিন তখন প্রায় সবাই ফিরে গেছে। সাঁওতাল পুরুষ এবং নারীরা আগুনের চারপাশে বসে গেছে—ইঁদুর কিংবা কাঠবিড়ালী পুড়িয়ে সাবধানে তার ছাল ছাড়াচ্ছে—সারাদিনের ঝাড়া ধানের হিসেব করছে চাষী এবং গৃহস্থরা। বশির এবং ওয়াজদ্দির সেদিন ফিরতে একটু রাত হোল। কান ঢেকে মুখে কাপড় জড়িয়ে খুব তাড়াতাড়ি ওরা বাড়ি ফিরছে। কেউ কাউকে কথা বলছে না। পায়ের নীচে মাটি কনকনে ঠাণ্ডা। বেশ খানিকটা চুপ করে থেকে হঠাৎ বশির বলল, চাচা?

আঁ—একটু যেন অন্যমনস্ক ছিল ওয়াজদ্দি।

বলি অ চাচা?

বল্।

কি শুনচি বল দিকিন্।

ক্যানে, কি আবার শুনলি তু?

তুমি শোন নাই?

কি বেপারটো তা তো বলবি।

আবার হিড়িক লিকিন লাগবে।

কোতা?

তুমি কিচুই শোন নাই গ?

কই বাপু, আমি তো কিচুই শুনি নাই।

আচ্ছা লোক বটো বাপু তুমি—সারোটা দিন আজ খালি কানাকানি হলচে—একানে ফিসির ফিসির, ওকানে গুজুর গুজুর, তুমি কিছুই শোন নাই? পাকিস্তানে হিঁদুদের লিকিন্ একছার কাটচে—কলকাতায় তেমনি কাটচে মোচলমানদের।

ক্যা বললে ক্যা তোকে? ওয়াজদ্দি খেঁকিয়ে ওঠে।

লোকে বলাবলি করচে যি!

তা করুক গো, তু আপনার বাড়ি যা দিকিন—ভাত মেরে শুয়ে থাকগা।

কিন্তুক আজ রেতে যি আমাদের গাঁটোকে—

এ্যাই ছ্যাকো,—ওয়াজদ্দি বলে, ইয়াকেই বলে মুরুক্ষু—মুরুক্ষু কি আর গাছে ধরে র‍্যা? আজ রেতে গাঁটোর কি করবে কি?

আসবে।

কুন শালোরা?

নবাবপুর, ছিষ্টিধরপুর থেকে মা কালীর পুজো দিয়ে হিঁদুরা আসবে।

বাড়ি যা—নিদারুণ বিরক্তিতে ওয়াজদ্দির মুখে কথা আসে না।

শোনলোম তাইতি বলচি।

কেস্তে দিয়ে সি শালোর গলাটো খ্যাচ করে কেটে দিতে পারলি না।

সবাই বলচে যি।

তু বাপু চুপ কর দিকিন এট্টু—বড্ডা জার লাগচে।

দুজনেই চুপ করে। কিন্তু একটু পরেই আবার বশির বলে, চাচা, আমার মনে হচে আবার অরম্ব হবে।

এটা কমনেকার মোনাকাটা গ আঁ—বলচি বাড়ি যা তেবু ব্যাদর ব্যাদরু করবে।

বশির কিন্তু কান দিল না কটুক্তিতে, ফিস ফিস করে বলল, কতকটা যেন নিজের মনেই, হাজাব হলেও পাকিস্তানটো মোচলমানদের দ্যাশ, সিখানে মোচলমানদের রাজত্বি—

তাইলে যাস নাই ক্যানে?

আমাদের কি সায়োস হয় চাচা ঘর সংসার লিয়ে কোতাও যেতে। তবু দ্যাশটো।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল ওয়াজদ্দি—বশিরের মুখের ওপর তীব্র চাহনি ফেলে নিঃশব্দে ওকে যেন দগ্ধ করতে থাকে সে। বশির দাঁড়িয়ে পড়ে বোকার মত, তেমনি করেই চেয়ে থাকতে থাকতে ওয়াজদ্দি জিজ্ঞেস করে, তোর বাপ কটো? এ্যাঁ—কটো বাপ? একটো তো? দ্যাশও তেমনি একটো। বুইলি? যা—বলেই ওয়াজদ্দি নিজেই চলে গেল হন হন করে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা এলো। দূর দূর গ্রাম থেকে, ছোট ছোট মাটির ঘরের উষ্ণতা ত্যাগ করে কপালে চওড়া করে সিঁদুর লেপে অপরিচিত মানুষদের হত্যা করতে এলো ওরা। ওদের আসার আগে প্রায় ঘণ্টা তিনেক ধরে তারা মেঝেতে পাতা ঠাণ্ডা বিছানায় বসে ঢাক কাঁসর এবং শাঁখের শব্দ শুনল। নিস্তব্ধ মাঠ এবং শীতের কুয়াশা ছিঁড়ে ভেসে এলো ঢাকের গুড় গুড় শব্দ। মাঘের আকাশ শিউরে উঠল কাঁসরের ঢং ঢং আওয়াজে এবং রাত্রি বিরাট একটা ঈগলের মত কুৎসিৎ নখর দিয়ে নিরীহ পায়রার মত গ্রামটাকে চেপে ধরল।

সামান্ত প্রতিরোধের ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ল সহজেই—রাস্তার ওপরে

আড়াআড়ি করে লাগানো গরুর গাড়িগুলি ভেঙ্গে ফেলা হোল এবং বশিরের চোখের ওপরেই প্রথম বলি হোল ওয়াজদ্দি। তারপর খড়ে ছাওয়া মাটির ঘরগুলি বেষ্টন করে আগুনের শিখা উঠল—আগুনে উজ্জ্বল হয়ে উঠল অপরিচিত খুনীদের মুখ, তাদের কপালের সিঁদুর এবং তীব্রভাবে উঠল ঝলকে ওয়াজদ্দির তাজা রক্ত এবং মৃত ও ভীষণভাবে বিস্মিত তার মুখের ওপর আগুন খেলা করতে শুরু করল।

বচির, বচির—তোর বাড়িটোর দিকে ওরা গেল।

কই, কখুন।

উই যি—উই যি—আর আমাদের বাড়িটোও—

এ্যাই রকিব—উই যি শালোরা—

দল ছেড়ে প্রাণপণে ছুটল বশির। বাড়িটা পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। বাড়িটা শান্ত। বাড়িটা স্থির। বাড়িটা মূক। ওরা চলে গেছে। বল্লম দিয়ে মাটির সঙ্গে গাঁথা বশিরের সাত বছরের ছেলেটা। বাড়িটার মতই শান্ত এবং মূক এবং ছাব্বিশ বছরের একটি নারীদেহ—কালো একখণ্ড পোড়া কাঠের মত পড়ে আছে ভাঙ্গা দগ্ধ ঘরে। কাঁচা মাংস-পোড়ার উৎকট গন্ধে বাতাস অভিশপ্ত।

আল্লা তু যি থাকিস মানুষের গ্যাহোটার মধ্যি—বুকফাটা চিৎকার করে উঠল বশির, কোতা, কোতা থাকিস তু, কুনখানে থাকিস বল্।

সোজা দাঁড়িয়ে পড়ে সে। যে খালটার মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে গুটিশুটি মেরে সে শুয়েছিল, শীতে আড়ষ্ট হয়ে এসেছিল তার হাত-পা, ভয় ভাবনা চিন্তার অতীত হয়ে, শারীরিক কষ্টের বাইরে চলে গিয়ে সে যেখানে স্থির হয়ে শুয়ে, কুয়াশার দিকে চাইতে চাইতে ছবি দেখছিল, এই শেষ ছবিটা দেখতে দেখতে সে ইস্পাতের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল—তার গলার শিরাগুলি ফুটে উঠল। শিরাওঠা হাতদুটি লোহার ডাণ্ডার মত শক্ত হয়ে উঠল। আর সে কোন ছবি দেখতে পেল না। হঠাৎ একেবারেই অন্ধ হয়ে গেল সে। অন্ধ হয়েই এগিয়ে চলল।

এই ভয়ংকর রাত্রির ছবি দেখতে দেখতে অন্ধ হয়ে পাগল হয়ে তাড়িত হয়ে গত কয়েক রাত্রি ধরে সে এতদূর পর্যন্ত চলে এসেছে তার দেশ ছেড়ে। ঝোপে ঝাড়ে সে লুকিয়ে থেকেছে সারাদিন—কোন মানুষের সামনে যায়নি, সাহায্য চায়নি কারো কাছে, প্রার্থনা করেনি। ঈশ্বরের কাছেও

না। মনে মনে সে বলেছে, আমি আর বচির নাই—বচির শ্যাষ, বচিরের হয়ে গেলচে—দ্যাশ ফ্যাশ নাই—আমি এ্যাকোন আর এক দ্যাশে জন্ম লোব।

আজ সারাটা দিন ঠিক এমনি কেটেছে তার, একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে কত রকমের শব্দ শুনেছে পৃথিবীর—অর্থহীন ভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে সেইসব শব্দ। সারাদিন ধরে উত্তর দিক থেকে ঝড়ো বাতাস এসেছে, পৃথিবীর পাত্র ঠাণ্ডা হয়েছে ধীরে ধীরে। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস বিদায় নিয়েছে—কিন্তু ততক্ষণে জমে গেছে পৃথিবী এবং আকাশ আর কুয়াশার পর্দা নেমেছে ভারি হয়ে। কখন নিস্তব্ধ হয়েছে তার চারিপাশের জগৎ সে খেয়াল করেনি। যখন খেয়াল হয়েছে কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কোন শব্দই সে শুনতে পায়নি। এইমাত্র সে অনুভব করল তার দেশের প্রান্তে পৌছেছে সে—এবার কখন নিজের অজান্তেই যে দেশে সে পালাচ্ছে সে দেশের মাটিতে পা দেবে। অত্যন্ত সাবধান হতে হয়েছে তাকে যেন কারও চোখে না পড়ে। মানুষ কিংবা অন্য কোন প্রাণীর চোখেই সে পডতে চায় না। সে আরও শুনেছে নিজের দেশ যেমন ছাডতে দেওয়া হয় না, অন্য দেশে তেমনি ঢুকতেও দেওয়া হয় না। প্রতি মুহূর্তে এখন তার মনে হচ্ছে এখুনি তার চোখের ওপর টর্চ পডবে, গম্ভীর গর্জন উঠবে একটা, তার প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়বে মাটিতে।

প্রচণ্ড শক্তিধর শীতের একটি তরঙ্গ এলো। তার হাড ভেদ করে মজ্জায় গিয়ে পৌছুল শীত—ধারালো চাকুর মত কাটল তার মাংস, তার হাড, তার মজ্জা; মগজের কোষে কোষে তীক্ষ্ণ একটা যন্ত্রণা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠল এবং এক সময় তার বোধ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হোল। তব কিন্তু সে এগুচ্ছিল—অন্ততঃ বাইরে থেকে তাই মনে হচ্ছিল। আসলে যন্ত্রের মতই পা পডছিল তার—অবশ পা দেহের সঙ্গে সম্পর্কহীন আলাদা এক অঙ্গ হয়ে গিয়ে কাঁপতে কাঁপতে যেখানে সেখানে পড়ছিল। হঠাৎ চষা জমির একখণ্ড কঠিন মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধেই গড়াতে গড়াতে ওর শরীরটা আশ্রয় পেল একটা খালে। এবার তার বিশ্বাস নিশ্চিত হোল যে সে মরে যাচ্ছে।

সে সম্ভবত মরেই যাচ্ছিল। কারণ তার আশেপাশে কোন কিছুই

তাকে উৎসাহ দেবার জন্যে বেঁচে ছিল না। মাঠ জলা, খাল ঝোপঝাড় এবং আকাশ নিয়ে প্রকৃতি এমন একটা অবস্থায় ছিল যে সে অবস্থার সঙ্গে একমাত্র মৃত্যুর তুলনাই সম্ভব। যে খালটার মধ্যে সে শুয়েছিল তার পুবদিকের পাড়টা ছিল এত উঁচু যে খালের ভিতর থেকে কিছুই দেখার উপায় ছিল না। পৃথিবীটা অত্যন্ত ছোট হয়ে এলো তার চোখের ওপরে এবং সেই অত্যন্ত সংকীর্ণ পৃথিবীতে সে মরতে মরতে আবার ছবি দেখতে লাগল।

কিন্তু সবচাইতে হাস্যকর ব্যাপারটা এই যে এই সময় পুরো চাঁদের চারভাগের একভাগেরও কিছু কম জঘন্য হলদে রং-এর একটা চাঁদ উঠেছিল। বীভৎস একটা কাণ্ড ঘটাল চাঁদটি—সে মৃত্যুকে একেবারে ন্যাংটো করে দিল।

এই চাঁদের আলোয় এক পা এক পা করে পুবদিকের মাঠ পেরিয়ে খালটার উঁচু পাড়ের মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে একটি মানুষের মূর্তি। পরনে হাঁটু পর্যন্ত তোলা ময়লা মোটা পাড়ের ধুতি—মোটা একটা চাদর জড়ানো গায়ে। কাঁধে বাঁক—বাঁকের দুদিকের ঝুড়িতে অনেক রকমের জিনিস—বড় একটা কুড়ুল—চাঁদের আলোতে ঝকমক করছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ঘাড তুলে তাকাল বশির—তার মাথা মাটিতে অস্পষ্ট ছায়া ফেলল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঝুঁকে পড়ল ওর মাথা। তন্ময় হয়ে ছবি দেখছিল সে—মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত জীবনটা দেখতে পাচ্ছিল। সে দেখছিল বিশাল বিরাট চ্যাপটা দেশ— সেই বিরাট দেশটা সমস্ত খুঁটিনাটি নিয়ে যেন ছোট্ট হয়ে দুলছিল তার চোখে; তারপর উল্কার বেগে পট বদলাতে থাকে—সে দেখে ওয়াজদ্দির তাজা রক্ত, তার বিস্মিত মৃত মুখ, দেখে লাল টকটক—আগুনের চাইতেও লাল তপ্ত রক্ত, বল্লম দিয়ে গাঁথা তার সাত বছরের ছেলেটাকে, কয়লার মত কালো ছাব্বিশ বছরের যুবতীকে, প্রেয়সী এবং ঘরণীকে।

অকস্মাৎ উৎকট একটা শব্দ করে খালটা যেন বিদীর্ণ হোল—কাঠবিড়ালীর মত উঠে এলো বশির, এসে দাঁড়াল বাঁক কাঁধে নির্বাক মানুষটার সামনে। দুজন সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষ চাঁদের আলোয়, হিমবর্ষী আকাশ-আক্রান্ত মাঠে এই খালটার উঁচু পাড়ের কিনারায় মুখোমুখি দাঁড়াল। বশির দেখল সে মানুষটার পরনে মোটা ধুতি, গায়ে চাদর, কাঁধে বাঁক। তার কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল, চিৎকার করে কে ডাকল, বচির বচির, তার মুখে ঝলকে পড়ল বল্লমগাঁথা সন্তানের উষ্ণ রক্ত। মৃত মাছের চোখের মত ওয়াজদ্দির সাদা

চোখ অর্থহীনভাবে চেয়ে রইল যেন তার দিকে। তীব্র চোখে ওর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কুড়ুলটা তুলে নিয়ে মানুষটার মাথায় প্রচণ্ড একটা আঘাত করল বশির। বাজ পড়ার মত যেন কড় কড় আওয়াজ হোল এবং বাঁকশুদ্ধ সেই মানুষটা বিস্মিত হতচকিত একটা মৃত্যু-চিৎকার করে খালটার ভিতরে গড়িয়ে পড়ল।

পালাইছিলে শালো ই দ্যাশ থেকে—শালো—চাঁদের মৃদু আলোতেও গরিলার মত বিরাট দুপাটি সাদা দাঁত ঝকঝক করে ওঠে।

একসঙ্গে দুটি টর্চের আলো পড়ে—বশিরের মুখে একটি আর একটি মৃত্যু-যন্ত্রণাখিন্ন হতবাক সেই মুখের ওপর। টর্চের আলো মুখ থেকে সরে গেলে বশির দেখল সেই মুখ—ঠিক যেন ওয়াজদ্দির মুখ—রক্তাক্ত, বীভৎস, তেমনিই অবাক। চোখের ওপর থেকে অন্ধকার পরদাটা যেন সরে গেল আর তার চোখের পানিতে ধূসর হয়ে এলো দুটি পৃথিবী—যাকে সে ছেড়ে এলো এবং যেখানে সে যাচ্ছে।

দূরদৃষ্টি

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত

মানুষ কখনো ত্রিকালদর্শী নয়। এমন কি, পণ্ডিতগণ বলে থাকেন জীবন পদ্ম-পত্রে নীরবৎ। অতএব মাত্র মুহূর্তেক পরে কি ঘটবে তা-ও বলতে পারো না। অথচ তারুণ্যের ধর্ম এ নয় যে সে বসে বসে ভবিষ্যতের হিসাব পেতে রাখবে তারপর সেই ছককাটা ঘরে পা ফেলে স্বর্গগামী হবে।

পাঠাভ্যাস, জীবিকা নির্ণয়, অন্নসংস্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রচুর বিবেচনা ব্যয় করা হলেও বিশেষ কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবেগ অস্থিরতা প্রভৃতিই প্রধান হয়ে থাকে। যতোই কোনো না উপদেশ বর্ষণ করা হোক, অনুশাসনের গণ্ডী আঁকা হোক, তরুণ মন সে সব মানবে না।

কিন্তু আমার ক্ষেত্রে এমনি ঘটলো না। আমি যেনো বা বদ্ধপরিকর ছিলাম যে, সুবিবেচনা, দূরদৃষ্টি, স্থির চিন্তা, আবেগ বর্জিত সিদ্ধান্ত প্রভৃতিকে আমায় বজায় রাখতেই হবে। এবং সেই জন্যেই পঁচিশোর্ধ আমি—শিক্ষিত, সুদর্শন স্বাস্থ্যবান যুবক, কিছুতেই হৃদয় দৌর্বল্যকে প্রশ্রয় দিতে পারছি না। অথচ তীব্র আকাঙ্ক্ষার দহনে দগ্ধ হচ্ছি।

ঠিক স্মরণ নেই, কখন কিভাবে আমার মধ্যে এই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলো। কোনো বিশেষ রমণীর জন্যে বাসনা এত তীব্র হয় যে, রাজসিংহাসন অক্লেশে বর্জন করা যায়, আমি শুনেছিলাম। কেবল শোনাই মাত্র। নিজ জীবনে কখনো এই তথ্যকে সত্য মানবো এমন ভাবিনি। অথচ আমার সমস্ত চিন্তা, সিদ্ধান্ত, দৃঢ়তার মূলে অলক্ষ্যে কে কুঠারাঘাত করেছে এক সময় আর দেখছি আমিও এক বিশেষ রমণীর জন্যে দাহক বাসনার দাস হয়েছি। এ-ও লক্ষ্য করেছি। সেই রমণীরও আমার ইচ্ছায় সানন্দ সম্মতি জানাতে দ্বিধা করে না।

কিন্তু আমার পারিবারিক অভিজ্ঞতা, দুঃসময়ে অতীত এবং সীমাবদ্ধ ক্ষমতা যে কোনরকম তীব্র আবেগের পরিপন্থী।

অতি শৈশবেই আমি বুঝেছিলাম, আর আর সমবয়েসীরা যেমনভাবে দিন

কাটাচ্ছে, বড়ো হ'য়ে উঠেছে, আমার জন্যে তেমন কিছু নির্দিষ্ট নেই অবশ্য বালসুলভ খেলাধূলা খেয়াল খুশি ইত্যাদি যে একেবারে করিনি এমন নয়, তবে সবকিছুর আড়ালে স্বাতন্ত্র ছিল। আমি বুঝেছিলাম আমি বড়ো অসহায় —আমি এবং মা। কেবল টাকা পয়সার নয়। সহানুভূতি, ভালবাসা সব কিছুরই অভাব আমাদের পর্বত প্রমান ছিলো।

সেই বয়সেই আমি জেনেছিলাম, মা ছাড়া আপনার জন কেউ আর নেই। মাতুলালয়ে মানুষ হলেই যে সর্বব্যাপী রিক্ততায় চরাচর ভরে যাবে, এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু দৃঢ় মনোবল, আত্মমর্যাদা ও প্রবল ইচ্ছাশক্তির অধিকারী কোনো নারী যদি স্বেচ্ছায় স্বামী সংগ পরিত্যাগ করে আসে, আপন ব্যক্তিত্বকে ভুলতে না পেরে কোনো নারী যদি পরবর্তী সমস্ত জীবন সেই স্বামীর মুখদর্শন না করতে চায়, তাহলে অন্ততঃ আমাদের দেশে তার জন্য গুটি-কতক সজ্জন ব্যতীত আর কোন শুভানুধ্যায়ী থাকে না।

মাতামহের কাছ থেকে আমার মা উত্তরাধিকার সূত্রে যে মনোবল মর্যাদাজ্ঞান ইচ্ছাশক্তি ও ব্যক্তিত্ববোধ লাভ করেছিলেন মাতুলের মধ্যে তা তেমন প্রস্ফুট হয়নি। সেইজন্যই কেবল মাতামহের দেওয়া কিছু সম্পত্তি ও মাতুলের নিরাশক্তি সম্বল করেই আমার মা জীবন কাটাতে শুরু করেছিলেন। অবশ্য মামারও এমন কিছু সঙ্গতি ছিল না যার ব্যয়ে তিনি আমাদের পরম সহায়ক হ'তে পারতেন। তবুও আমাদের দিন কাটতো। আমি জেনেছিলাম, পরিপূর্ণ যৌবনকালেই মা একাকী হয়েছিলেন। আমার পিতা, যাঁর মুখাবয়বও এখন আমি স্মরণে আনতে পারি না, অন্ততঃ এটুকু আত্মজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন যার বলে তিনি আমাকে মা-র কোল থেকে সরিয়ে নেননি। সম্ভবতঃ পরবর্তী বিবাহিত জীবনে আমার অনুপস্থিতি তাঁর কাম্যও ছিলো। যাই হোক, নিঃসঙ্গ জীবনে আমিই আমার মার একমাত্র সঙ্গী ছিলাম। একথা আমি বলবো না যে, তিনি আবার বিবাহ না-করার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। অতো কৃতঘ্ন আমি হতে পারবো না। বরং পরিণত বয়সে আমি ভাবতাম, যদি সেই কালে আমার সমস্ত ব্যাপার বুঝবার ক্ষমতা থাকতো, তাহলে স্বেচ্ছায় তাঁকে সুখী করার দায়িত্ব নিতাম। যে-কালে সেই জ্ঞান আমার হ'লো, তখন আর কিছু করার ছিলো না।

পাছে এইসব ভেবে আমি কষ্ট পাই এবং নিজেকে অপরাধী মনে করি সেইজন্য সেই পরম বিবেচক, সম্মানী মহিলা,—আমার মা, বুঝবার মতো ক্ষমতা

হবার পরই আমায় জানিয়েছিলেন যে, আসলে আমার জন্যে তাঁর ত্যাগ স্বীকার করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তিনি বিশুদ্ধভাবে নিজের জন্যে এই পথ বেছে নিয়েছিলেন। আমি বরং তাঁর উপকারই করেছি বাকী জীবনের সঙ্গী হিসাবে। ঠিক সর্বজয়ার মতোন করে তিনি আমায় মানুষ করেননি এতো দেখাই যাচ্ছে। এবং আমারও ইচ্ছা ছিলো না যে এককালে অপুর মতোনই আমি তাঁকে নিশ্চিন্তপুরের কুঁড়ে ঘরে একলা ফেলে যাবো। তবুও ম্যাট্রিক পাশ করবার পর আরো বড়ো শহরে না যেয়ে উপায় ছিলো না। অপুর সঙ্গে আমার তফাৎ হলো এই, আমার বয়স বাড়ার সঙ্গে মামা আমাদের দু'জনের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন। এবং শহরে যাবার আগে মামার দ্বিধাহীন বিশ্বাস ছিলো, পুত্রের অবর্তমানে মামা তার ভগ্নীর কোনোরকম অসুবিধা ঘটতে দেবেন না।

শহরে যাবার আগে মা আমার হাতে জনৈক অধ্যাপক চৌধুরীর নামে একখানা চিঠি—তাঁর ঠিকানাসহ, দিয়েছিলেন। সারা জীবনে যিনি কারো কাছে সামান্যতম করুণা প্রার্থনা করেন নি, কেনো জানি না কয়েক ছত্র লেখার মধ্য দিয়ে আপন পুত্রের শুভাশুভ অপরের হস্তে ন্যস্ত করলেন। তবে জানতাম, অধ্যাপক চৌধুরী এই শহরের অধিবাসী ছিলেন এককালে। বড়ো শহরে অধ্যাপক চৌধুরীকে খুঁজে পেতে আমার মোটেই কষ্ট করতে হয়নি। তাঁরই সুচারু ব্যবস্থায় অন্যান্য সমস্যাও আমার কাছে অনেক সহজ হয়ে এসেছিলো। প্রকৃতপক্ষে উচ্চশিক্ষার জীবনে অধ্যাপক চৌধুরী আমার সঙ্গে এতো ঘনিষ্ট হয়েছিলেন যে, বয়সের অসমতা সত্ত্বেও তাকে আমার পরম বন্ধু বলে ভাবতে ইচ্ছা করে। আমি অসংকোচে এবং কোনরকমে গ্লানি বোধ না করে বলতে পারি, তিনি না থাকলে আমার পক্ষে আদৌ কোনো পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হতো না। তাঁর সঙ্গে আমার দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক কোনোদিনই গড়ে ওঠেনি। কেবল তাঁর উপদেশ, নির্দেশ প্রচেষ্টা ইত্যাদি সম্বল করেই আমি যেহেতু সমস্ত পথ পাড়ি দিয়েছি, সেই জন্যেই আমাদের সম্পর্কে কোনো গ্লানিমার ঠাঁই রইলো না।

অতএব আমি সমগ্র জীবনে আমার মা ও অধ্যাপক চৌধুরী এই দুজনের প্রিয় থাকার সংকল্প গ্রহণ করেছিলাম। কোনো হঠকারী চিন্তা, চিত্তদৌর্বল্য প্রভৃতিকে স্থান দিয়ে আমি এঁদের মনোবেদনার কারণ হতে চাইনি। এবং এইজন্যেই প্রিয়-রমণীর প্রসঙ্গে আমি এত দ্বিধান্বিত। আমি নিজেকে কখনো

অসাধারণ ভাবতে পারিনি। অধ্যাপক চৌধুরী আমায় শিখিয়েছেন, তোমার চিন্তা কাজ, আকাঙ্ক্ষা, দ্বিধা এ সমস্ত যে একান্তভাবে তোমারই একথা ভেবো না। তুমি বলতে পারো না তোমার আগে—তোমারই পথে ভ্রমণ করে আরো কতজন যন্ত্রণা অথবা আনন্দ অনুভব করেছেন।

এই সমস্ত কথাই আমি প্রিয়তমাকে বোঝাচ্ছিলাম। আপাতত যদিও সে আমার সামনেই বসে আছে কিন্তু আমি জানি, এই দিন এবং এই সান্নিধ্য বহু বিলম্বিত করা যাবে না। আর করা যাবে না এই কথা ভাবতেই আর্ত বেদনায় সমস্ত শরীরে ভয়ঙ্কর অসুস্থতা অনুভূত হতে থাকে।

তবুও আমি ওকে বললাম, দেখো আজ আমরা মনে করেছি আমাদের দুজনের সম্মিলিত পৃথিবী সর্বোত্তম সুখের স্থান হবে। কিন্তু তুমিও জানো না, আমিও বলতে পারবো না, সেই সুখ কতকাল স্থায়ী হবে। এমনো তো হতে পারে যে, ক্ষণজীবী সুখকাল অতিক্রান্ত হবার পরে তুমি আমাকে অথবা আমি তোমাকে ঘৃণা করতে শিখবো। তোমার আরো আলাপী আছে, আমারও অনেক আলাপিতা আছে তাই কোনো সময়ে আমরাতো ভাবতেও পারি, এ না হয়ে অমুক যদি আমার জীবনে আসতো তাহলে জীবনের চেহারাটা পালটে যেতো। তখন সর্বাপেক্ষা বেশী যাকে ভালোবাসা যাচ্ছে সেই হবে আমাদের চোখে সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত। অতো বড়ো কদর্যতার মুখোমুখি হতে আমরা কেউই পারবো না। সেইজন্যে বরং আমাদের পরিচয়কে অস্বীকার করাই শ্রেয়। আমরা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী কাউকে নয়, সামাজিক পথে যে কাছে আসবে তাকেই বরণ করে নেবো। আমি সমস্ত কথা শেষ করে সিগারেটের ধোঁয়ার আড়ালে মুখ ঢাকবার চেষ্টা করলাম। কারণ এইসব সময়ে নিজেকে কেমন অপরাধী আর দুর্বল বলে মনে হয়।

ও কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো তারপর আমার চোখে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলো। গ্লাসের পানীয়ে আঙুল ডুবিয়ে নানারকম নক্সা আঁকলো কিছুক্ষণ টেবিলের রঙিন কাপড়ে। তারপর নিঃশ্বাস মুক্ত করে বললো, তুমি বড়ো বেশী সামনের দিকে চেয়ে আছো। অতো দূরে মানুষের দৃষ্টি যায় না।

আমি বললাম, কিন্তু হাতের কাছে যে আছে তাই কি তুমি নিঃসংশয়ে হৃদয়ে ধারণ কবতে পারো?

এবারে ও আর কোনোরকম বিচলিত ভাব দেখালো না, শেষ কথা বললো, তা ঠিক। তবু সব শেষের কথা হচ্ছে আমরা পরস্পরকে ভালবাসি যার

দাম আপাততঃ অনেক। তুমি সব কিছু আবার ভেবে দেখো। বলে সেদিনের মতো নিজের পথে চলে গেলো।

তুমি তো আমায় ভাবতে বলে গেলে এখন নূতন করে আমি কি ভাববো? এ-পিঠ ও পিঠ দু-পিঠই আমি ভালো করে দেখছি। তোমায়ও বলেছি, এখন আবার কি করা যায়?

আমার আর ভাবনা করবার ক্ষমতা ছিলো না বলে আর একজনের কাঁধে এই দায়িত্ব চাপানো স্থির করলাম। অধ্যাপক চৌধুরীর অজ্ঞাতে কোনো কিছু করবার প্রয়োজন কখনো দেখা দেয় নি। মনোবাসিনী মহিলার সম্পর্কে তাঁকে আমি বলেছি। কেবল তাঁকে নিয়ে আমার ভাবনার কথাগুলো এখনো গোপন রয়ে গেছে অবশ্য আমি তাঁর পরামর্শ চাইনি বলেই তিনি তাঁর মতামত আমায় জানান নি, একথা বলাই বাহুল্য।

আমি যখন পৌঁছলাম অকৃতদার, প্রৌঢ় অধ্যাপক তখনো প্রায়ান্ধকার, ঘরে বাতি জ্বালান নি। টেবিলের সামনে চুপ করে বসেছিলেন। ওঁর নিশ্চয়ই স্মৃতির সায়র আছে, এমন সময় সেখানেই তিনি ডুবে যান বলে আমার বিশ্বাস। এই মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে বিষণ্ণ আবহাওয়াকে বিষণ্ণতর করে তুলতে চাইছিলাম না। সেজন্যে পিছন দিকের দরজা বাড়ীর ভিতরে ঢুকলাম। রান্নাঘরের আলো এবং উনুন উভয়ই জ্বলছিলো। পাচকের সঙ্গে বিভিন্ন রকম কথাবার্তায় সময় কাটাতে চেষ্টা করলাম।

তিনি বোধহয় আমার গলার স্বর শুনতে পেয়েছিলেন। একটু পরে উঠে ভিতরে এসে এখানে সেখানে কয়েকটা আলো জ্বালালেন। তারপর আমার সামনে এসে হাসিমুখে দাঁড়ালেন। আমিও হাসতেই জবাব দিয়ে বললাম, খুব গম্ভীর কিছু ভাবছিলেন নিশ্চয়?

কি করে বুঝলে?

এ-সময়ে আপনি লেখাপড়া করেন না, আমি জানি।

হুঁ ঠিকই। ভাবছিলাম, বুঝলে মানুষ কি বিচিত্র, কেউ কামনার উদ্দামতায় কাম্যকে জোর করে আয়ত্ত করে, কেউ বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে তাকে আত্মস্থ করে, আবার কেউ কেবল বাসনার নির্বাসন, কেবল স্বার্থত্যাগ, কেবল মঙ্গলেচ্ছা নিয়েই বেঁচে থাকে।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, আপনার জন্যে এসব তো খুব জটিল

সমস্যা নয়, তাছাড়া আমি আজ মানব-চরিত্র নিয়ে আলোচনা করতে আসিনি। বরং মানবজীবন সম্পর্কে কিছু গভীর তথ্য আলোচনা করবার আছে।

তাঁর সঙ্গে আবার আমি বসবার ঘরে গেলাম। তারপর সাধ্যানুযায়ী গুছিয়ে সব কথা ও সমস্যা তাকে বলবার চেষ্টা করলাম। শেষে তাঁর কি ইচ্ছা বা সিদ্ধান্ত জানতে চাইলাম। কথা বলতে বলতে লক্ষ্য করলাম একটু আগের সেই হাসি, আর ওষ্ঠ প্রান্তে নেই। অকস্মাৎ ক্লান্ত অস্থির ও গম্ভীর দেখাচ্ছিলো তাঁকে। মুখমণ্ডলে কয়েকটি কঠিন, ভারাক্রান্ত রেখা স্পষ্ট লক্ষ্য করা যাচ্ছিলো। আসন ছেড়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। ঘরের মধ্যে পায়চারি করলেন কিছুক্ষণ। আমি নিস্তব্ধ, অনড় হয়ে বসে রইলাম। তিনি যে উত্তেজিত তা তাঁর আচরণ থেকেও বুঝা যাচ্ছিলো। এইরকম উত্তেজনা তার মধ্যে আমি খুব বেশী লক্ষ্য করিনি। প্রথম সাক্ষাতের দিন সম্ভবতঃ তিনি এর চেয়েও বেশী বিচলিত হয়েছিলেন কিন্তু আমার বয়স ও তার চেষ্টা সেই ভাবকে প্রকট করে তোলেনি।

একটু পরে তিনি বারান্দায় বেরিয়ে গেলেন। কিছু সময় আমি তেমনি বসে থাকলাম। তারপর উঠে ধীরে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বারান্দায় আলোটা জ্বালা ছিলো না বলে সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে তাঁকে এক মহান্ মূর্তির মতো দেখা যাচ্ছিলো।

ফিরে তাকালেন না, তিনি বললেন, তাহলে তুমি ভাবছো ওকে তোমার জীবনের সাথে না জড়ানোই ভালো হবে?

হ্যাঁ, ভাবছি। তবে,—বলে আমি চুপ করে থাকলাম।

তাঁর নিঃশ্বাস পতনের শব্দ একটু দ্রুত শোনা যাচ্ছিলো, বললেন, তোমার মনে হচ্ছে না যে, যা করতে চাইছো তেমন আর কেউ করে না অথবা তুমি অনন্ত, একক?

দৃঢ়কণ্ঠে বললাম, না, তেমনি ভাবি না। আপনার কাছে জেনেছি, আরো অনেকে একই পথে হেঁটে গেছেন যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয়ে।

কেননা, তাঁরা কেউ ভবিষ্যত দ্রষ্টা নন বলে—আবার তিনি হাঁটতে লাগলেন বারান্দায় এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। মনে হলো কথা বলতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। একবার জোর করে গলায় শব্দ তুললেন। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, এমন মনে হচ্ছে না যে এই সিদ্ধান্ত ভুলও হতে পারে?

ততোক্ষণে তাঁর আবেগ আমাকেও স্পর্শ করেছে, জবাব দিতে গিয়ে আমারও গলার স্বর বিকৃত হয়ে গেলো। বহুদিনে আয়ত্ত করা স্থির চেতনা আর কিছুতে বজায় রাখা যাচ্ছিলো না, বললাম, ভাবছি এমনো তো হতে পারে যে অল্পকাল পরে আমরা বুঝবো—

তিনি আমার মুখ থেকে কথা তুলে নিয়ে বললেন, যা ভাবা গিয়েছিলো তা হয়নি। কিসের শূন্যতা দিগন্ত বিস্তারী। আর তখন—এইখানে তিনি প্রাণপণে গলার স্বরকে সহজ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন, আর তখন আপনাপন মূঢ়তাজনিত পরস্পরের প্রতি অভিমান সমস্ত জীবনের পরম দুঃখ বলে বিবেচিত হবে। সমস্ত সংসারকে উপেক্ষা করে সে হবে নিঃসঙ্গ নির্বাসিতা, আর তুমি—

তিনি কথা শেষ করতে পারলেন না, শেষ করা সম্ভব ছিলো না, তাই আমিই সজল আবেগে, রুদ্ধ কণ্ঠে বললাম, আমি সারাজীবন নিয়তির মতো তাকে ভালোবেসে যাবো।

আর সেই ভালোবাসার প্রমাণ দেবার জন্যে অনেককাল তোমায় অপেক্ষা করতে হবে, যতোদিন না সেই সামান্য অনুরোধের সুযোগ—

বলতে বলতে তিনি তাড়াতাড়ি বারান্দা ছেড়ে বাগানে গেলেন।

মনসা মাগো

মাহমুদুল হক

আনোয়ার আলি সহাস্যে বললে—অ্যাকটিংটা থুয়ে দে শালা, পিছন ফেরালেই তো জানোয়ার আলির মুখে কালি বলে গাল পাড়বি। আমি যা বলবো সাফ সাফ মুখের ওপর, ওসব তোমো তোমো কথা আমার দ্বারা কখনো হবে না। তোরা গুলতানি মেরে নরক গুলজার কর, আমি ডেরায় চললুম!

আমার সঙ্গীর নাম কানা সাড়ে তিন পাঁট। কানা এবং সাড়ে তিন বোতল দেশীমদ একাসনে পান করতে অভ্যস্ত বলে লোকটি ওই নামেই বিখ্যাত। আনোয়ার আলির সঙ্গে তার সম্পর্ক বা যোগাযোগের সূত্র আমার অজানা, যতদূর মনে হয় দুজনের পরিচয় বহুদিনের এবং বহু কীর্তির সঙ্গে উভয়ে জড়িত। কানা সাড়ে তিন পাঁট জিভ উল্টে নাকের ডগা চেটে উরুর উপর একটা হালকা থাবড়া মেরে দুলতে দুলতে বেশ একটু তোষামোদের সুরে বললে—অই শোনো, তুমি চলে গেলে এঁড়ে বাছুরের মতো বাঁ বাঁ করতে করতে গলা দিয়ে খুন ঝরবে যে। দোহাই তোমার ওস্তাদ, একেবারে আঁধারে চুবিয়ে মেরে রেখে যেও না—ধর্মে সইবে না!

আনোয়ার আলি কি মনে করে আবার বসলো। মনে হলো আমাকে কিছু বলবে। পরক্ষণেই ভাবান্তর মুখে খুব স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। বললে, শালার সারা গতরটা যা টাটান টাটাচ্ছে না। মনে হচ্ছে এক হপ্তা বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবো না।

কানা সাড়ে তিন পাঁট রসিকতার সুরে বললে—ওসব ভালো করেই বুঝি। মাদুরে শোওয়া গা ডবল তোশক পেলে টাটাবে না তো টাটাবে কিসে। ইস্ শালার যাকে বলে একদম ফেটে পড়া স্বাস্থ্য উথলে ওঠা স্বাস্থ্য, চলকে পড়া স্বাস্থ্য, থমথমে টাটানো যৌবন!

—বেশী কপচে কাজ নেই, থাম। কারো গতর টাটানি কারো চোখ টাটানি। আবে শালা কানা, তোর নোলা দিয়ে বুঝি নাল ঝরছে, না রে? মাল ছেড়ে দেখ না, তোর গলাতেই যদি ওই জান্নাতি কবচ লটকে না দিয়েছি

তো একবাপের বেটা নই।

—এহ্, একেবারে কৃতার্থ হয়ে গেলুম আর কি।

কানা সাড়ে তিন পাঁট বগল চুলকাতে চুলকাতে বললে,—মুফ্‌তে হলে একবার টেস করে দেখতে পারি!

আনোয়ার আলি মুখ ভেংচে বললে,—ওরে আমার নাত জামাইরে! শালার ব্যাটা শালা কানা বলে চক্ষুলজ্জাটাও কি ধুয়ে খেয়েছিস? তবে শোন্‌ তিনটে জিন্নামার্কা পর্যন্ত দাম উঠেছে, আমি পাঁচটার কমে ছাড়বো না, তার চেয়ে বরং দোলাই খালে ভাসিয়ে দেব। ভেবেচিস মুফতের মাল, ভাগাড়ের শকুন কোথাকার! এ রকম খাঁটি জিনিস দু' দশ বছরে এক আধটা শিকে ছিঁড়ে পড়ে! আবে শালা কানার মরণ, রা কাডছিস না কেন?

সাড়ে তিন পাঁট বিমর্ষ হয়ে বললে,—তোমার মুখের ট্যাকসো থাকলে আর এভাবে বলতে পারতে না। যাই বলো তুমি ওস্তাদ বড্ড স্বার্থপর। সাধ্যে কুলায় তোমার এমন কোন কাজটা না করে দিয়েছি বলো, অথচ আমরা কিছু আবদার করলে অমনি ষোলো আনা হিসেব কষতে বসবে। এমন নয় যে নিকে করা বউ, কোথাকার পাখি কোথায় চলে যাবে। আমরা চিরকাল নামেই ইয়ার-বন্ধু থেকে গেলাম।

—ওপ্‌, দুঃখে একেবারে পেটের পিলে ফেটে যাচ্ছে বুঝি! আজ কি সাড়ে তিন পাঁটের বেশী হয়ে গিয়েছে?

খালি বোতলটা দূরে ঘাসের ওপর সজোরে ছুঁড়ে দিয়ে কানা সাড়ে তিন পাঁট তিরিক্ষি মেজাজে বললে—যাও যাও, নিজের ধান্দায় যাও। বেশী ফ্যাচোর ফ্যাচোর করো না। তোমার কথাগুলো মনের ওপর পেট্রলের টিন উপুড় করে দিয়েছে।

তুলনাটা ভালো লাগলো আমার। কানা সাড়ে তিন পাঁটের মুখে বলেই ভালো লাগলো। আনোয়ার আলি পকেট থেকে একটা রেশমী রুমাল বের করে যত্ন করে মুখটা মুছলো তারপর পেশীবহুল হাত দুটো ওপরের দিকে তুলে আড় ভেঙে জড়িয়ে জড়িয়ে বললে—তাহলে উঠলাম হে, একটা বৈঠক আছে আবার।

—বিদেয় হও না, কে তোমায় পাঁজাকোলে করে ধরে রেখেছে।

তারপর প্রকাণ্ড আনোয়ার আলি চলে যেতেই আমার পাশে আরো খানিকটা সরে এসে বললে,—শালার জানোয়ার আলির মুখে কালি। দেখলেন

তো কেমন অখাদ্য।

আমি বললাম—ঠিক বুঝলুম না।

—কেন গুরু, অন্য জগতে বিচরণ করা হচ্ছিল বুঝি?

বললাম,—কোনো একটা কিছু ভাবছিলাম নিশ্চয়ই, আবার তেমন কিছু না। তোমার কথা বলো, চুপচাপ ভালো লাগছে না।

কানা সাড়ে তিন পাঁট বললে—নির্লজ্জ বেহায়া কি আর গাছ থেকে পড়ে। হনুমানটার কথা শুনলেন, শালার ব্যাটাকে আচ্ছামতো দুরমুশ করা যেতো। কতো জায়গায় যে ঢিট হয়েছে তার হিসেব নেই, একটা জ্যান্ত শয়তান। মেয়ে মানুষ বেচে শালা লাল হয়ে গেলো।

আমি তার মন রক্ষা করার জন্যে বললাম—লোকটাকে আমারও খুব অসহ্য ঠেকেছিলো। তুমি যে রকম তোয়াজ করছিলে প্রথমটায়।

কানা সাড়ে তিন পাঁট আমার মুখের দিকে তাকিয়ে খুব অন্তরঙ্গ হয়ে বললে,—ইস আপনার চোখ একেবারে লাল জবাফুলের মতো হয়ে গিয়েছে, রক্ত ফেটে পড়ছে, বরং স্টপ করে দিন।

আমার বলতে ইচ্ছা করছিলো, এখন ও দুটো আর চোখ নয় ও দুটো আমার টুকরো করা হৃদপিণ্ড, কিন্তু লোকটা বুঝবে না, সুতরাং চুপ থাকতে হলো। আমার মনে যা তোলপাড় করছিলো তাকে পাত্রে ধরে রাখা যায় না, কেননা মধ্যরাত্রির শিকার ভাটিখানার নিঃসঙ্গ এক মাতাল দুমড়ে মুচড়ে একাকার শীৎকার চীৎকার গলিত শবের মাংসভক্ষণ এবং কাফন সংগ্রহ শেষ করে ধূর্ত শৃগাল ও নির্বিকার তস্কর কবরখানার বাইরে শীতরাত্রির কৌমার্যে আগুন ধরাবার তুঙ্গ অভিপ্রায়কে উসকে দিয়েছে। কেননা মৃত্যুর মতো ভালোবেসে, দুর্দান্ত দস্যুর মতো উপভোগ করে গুটিকতক জন্মান্ধ খল অবিশ্বাস ও কান্নার মতো স্নিগ্ধ আচ্ছন্ন এবং ন্যুব্জ নগরে গম্ভীর দুর্ভাগ্যের বীথি দুপাশে ফেলে জলন্ত বাদুড়ের মতো প্রকীর্ণ চিহ্নে নিশিন্ধ। কেননা পৃথিবীতে সব মোৎশার্টই মৃত, প্রত্যহের আটলান্টিক ডাকাতিয়া নদী, বিজ্ঞান বিমর্ষ, ঠিক তেমনি ভ্রষ্টা ইহুদী রমণী আজ কোথায় যেমনটি জান দ্যুভাল। কোথায় কোন অনিশ্চিতেই না ভাসমান রুগ্ন আবিষ্কারের স্রোতে। আর পাপের যন্ত্রণা চীৎকার আর্তনাদ দংশনে হন্তে কুকুরের স্বজাতি তথাপি চন্দন কাঠের মূল্যবান প্রাচীন শ্বেত কৌটায় সাজিয়ে রাখতে বলো কি রহস্যময় তোমাদের যাদুঘরে কাঁচের স্বচ্ছ কফিনে। পাপে দগ্ধ আমার সর্বাঙ্গ। পাপে দগ্ধ আমার—দগ্ধ

দগ্ধ দগ্ধ। দগদগে শরীর ছাল ছিলে অর্ধ-উন্মাদের মতো নিজেই খাই। তারা যখন কালো পাপের, অতি অন্তরঙ্গ অতি সুস্বাদ সুপেয়—রক্তপ্রবাহী চিহ্নগুলো কালো কালির আচড়ে লিখে নেয় তখন অতি স্বার্থপর নিঃসঙ্গ এবং স্তম্ভিত শয়তানও চীৎকার করে ওঠেন, আমাকে অন্ধত্ব দাও, আমাকে অন্ধত্ব দাও, আমাকে অন্ধত্ব দাও।

কানা সাড়ে তিন পাঁট বললে,—তুমি গুরু দেখে নিও, ও শালা বাঁদরমুখো জানোয়ার আলির মোষের মতো শরীর আমার ট্রাকের তলায় পড়ে একদিন ছাতুছানা না হয়ে যাবে না। শালার যে সে ট্রাক নয় একেবারে সাতটনি মার্শেলাইজ বেনচি। গুরু একটা কথা বলি কিছু মনে কোরো বসো না যেন আবার, আমি কিন্তু তোমাকে তুমি বলেই বলছি—আচ্ছা তোমরা তো সব লেখাপড়া জানা শিক্ষিত লোক, এ সব নোংরা আস্তাকুঁড়ে পা রাখতে তোমাদের সংকোচ হয় না?

আমি বললাম,—শিক্ষিত লোকদের ওই একটা মস্তবড় গুণ, দুনিয়ার সব জায়গাই তাদের চেনা হয়ে যায়, সহজে সব জায়গাতেই গা ছেড়ে বসতে পারে। তোমাদের দুনিয়ার বাইরে তোমরা অচল!

—তা যা বলেচ গুরু। একবার চ্যাং চ্যাং চ্যাং হোটেলে জোর করে নিয়ে গিয়েছিলো তোমারই মতো একজন, আমার সে কি কাঁপুনি ভিতরে ঢুকে, কিছুতেই আর মুখ তুলে বসতে পারিনে। তা গুরু চলো উঠি। হারামখোরের ব্যাটারা পাততাড়ি গুটোতে শুরু করে দিয়েছে।

আমি অনুনয়ের সুরে বললাম,—এখনই ঘরে ফিরতে চাই না, আরো কিছুক্ষণ থাকো না আমার সঙ্গে। অন্য কোথাও চলো যেখানে সারারাত কাটানো যায়, খরচ আমি দেবো।

কানা সাড়ে তিন পাঁট বললে—আজ অনেক খসেছে, আবার কেন?

—ওসব কিছু নয়।—আমি বললাম,—এই যে তুমি আমাকে সঙ্গ দিচ্ছ, আমার কাছে কিন্তু এটাই বড়, আর কাছে আছে বলেই ওড়াচ্ছি, যখন থাকবে না তখন আসবো না।

—যাই বলো গুরু, তোমাদের বুঝতে যাওয়াটা একটা মস্ত ফ্যাসাদ। চলো কোথায় যাবে।

সব দৃশ্যকে তখন চাঁদ গিলে খাচ্ছে। সুখ নামক অদ্ভুত এক রোগের মড়কে সারা ঢাকা শহর উজাড় হয়ে গিয়েছিলো বহু আগেই। স্যাণ্ডেলের

গোড়ে গোবর লেপটে যাওয়ায় মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিলো বুঝিবা পৃথিবীর কাঁচা মাংসের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। রসালো রাত্রিটাকে কারা যেন নিংড়ে তার সবটুকু রস বের করে নিয়ে চারপাশে ছত্রখান করে রেখে গিয়েছে শুধু নীরস আঁশ।

কানা সাড়ে তিন পাঁট বগলার ধোঁয়া ছেড়ে বললে,—বুঝলে গুরু, মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে শালার হাড়-হাবাতে জানোয়ার আলিটার কল্‌জে বের করি। কাফেরটার ধর্ম বলে কিছু নেই, পয়সা তো রাস্তার হাজা মজা হুলো ভিখারীগুলোও রোজগার করে, অমন পয়সায় আমি মুতে দেই। গাঁ-গেরামের মেয়েমানুষকে গায়েব করে বেমালুম দু'একশো টাকায় বেচে দিচ্ছে, লাখ টাকা দিলেও আমরা বাপু অতোটা নিচে নামতে পারবো না, হ্যাঁ।

কানা সাড়ে তিন পাঁট এই ভাবে অনর্গল বলা শুরু করলো। আনোয়ার আলিকে নিয়ে তার কথার তুবড়ী যেন আর ফুরোতেই চায় না। আমি ভাবছিলাম সন্ধ্যাবেলার কথা যখন আমার ভিতরটা এমন ভাবে গুমরে উঠেছিলো যে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলাম। মনে হয়েছিলো কষ্টের একটি করুণ শীর্ণ নাম-না-জানা নদী আমাকে ভয়ংকর অনিশ্চিতের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে, আমি এমন অসহায় এমন নিরুপায় এমন রুগ্ন যে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি তেমন শক্তি নেই। কি করবো, কোথায় যাবো, যেন বিদীর্ণ হতে চাই, যেন এক খাবলা আকাশ ছিঁড়ে নিয়ে কারো মুখে ছুঁড়ে মেরে শান্তি পাবে এই সব মনে হয়েছিলো। সন্ধ্যাদেবী দরোজার বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমি বের হতেই রহস্যময় আবরণের ভিতর থেকে তার অপরূপ হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, মুখে কিছু না বলে আকাশের দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করে বলতে চাইলেন এক একটি তারার এক একটি স্বতন্ত্র অর্থ আছে, ওই সব অর্থ জানতে যেও না। তারপর আমাকে ভাঁটিখানায় পৌছে দিয়ে নিঃশব্দে নিজের পথে চলে গেলেন। তখন কানা সাড়ে তিন পাঁট, আনোয়ার আলি, সৈফুদ্দিন কাওয়াল কেউই সেখানে ছিলো না। আমার কি যে মনে হয়েছিলো, মনে হয়েছিলো—আমাদের দাদীমারা নিকোনো উঠোনের কোণে প্রাচীন পিঁড়িতে উপবেশন করে গনগনে উনুনে চেলাকাঠ প্রবেশ করিয়ে জাড় ভাঙছিলেন আর ফিসফিসিয়ে ভয়ংকর শিরা-উপশিরাগুলিকে কিছু বলছিলেন, হাসছিলেন অর্থহীন, উদোম রাত্রি, কি মাংসল তার শরীর, পিষ্ট হতে চায়, আগুনের চঞ্চল শিখা থেকে থেকে কাঁপছে রাত্রির

নরম মসৃণ সুগোল বাহুতে, ভাষা দাও! আমাদের দাদীমারা নিকোনো উঠোনের কোণে প্রাচীন পিঁড়িতে, হে রূপসি তাড়না তোমার আনাজ কোটার কি শেষ নেই? গলে পড়া চাঁদ, গলে পড়া অন্ধকার, গলে পড়া বাতাস, গলে পড়া আকাশ, গলে পড়া বয়স, গলে পড়া অবসাদ, গলে পড়া হিম, গলে পড়া স্বর্গ--গভীর থমথমে নাভীর গায়ে জমা লবণ জলের সৌন্দর্যে নিহত যে, ভাষা দাও ভাষা দাও! আমাদের দাদীমারা সব মৃত। প্রাচীন মসৃণ পিঁড়ি, অলস উপবেশন, নিকোনো উঠোন, তাঁদের অর্থহীন প্রলাপ—স্বর্গীয় স্বগতোক্তি বৃষ্টির বিস্তের মতো স্মৃতির অতলে, ভাষা দাও।

—শালার ব্যাটা শালা বাস্তুঘুঘু, তোমায় একদিন ঘুঘুর ডিম খাইয়ে ছাড়বো, না হলে কান কেটে কুকুরের পায়ে ঝোলাবো।--কানা সাড়ে তিন পাঁট বললে —বুঝলে গুরু, ওই একটা কথা আছে না বেশী বাড় বেড়ো না ঝড়ে পড়ে যাবে, শালার ঠিক তাই হবে। একদিন শালাকে নর্দমার পানি না খাইয়ে ছেড়েছি তো নামই বদলে দেব। চিরতে জানলে একটা ধান দিয়েও কারো পেট চেরা যায়। তা গুরু কাছাকাছি একটা তিন তাসের আড্ডা আছে, যাবে নাকি সেখানে, রাত কাবার করার জন্যে খুবই যুতসই।

আমি বললাম---ওই ব্যাপারটা আমার দুচোখের বিষ। চলো নদীর দিকে যাই, এই সময় খুব আশ্চর্য মনে হবে নদীটাকে।

—অ্যাই মেরেছে। তোমার যতো সব অনাসৃষ্টি কথা গুরু, ওখানে ঘোরাঘুরি করতে গেলে সেপাইরা সন্দ করে টানা-হ্যাঁচড়া জুড়ে দেবে, ভাববে আমরা জানের খারাবি করতে গিয়েছি। তার চেয়ে চলো যে যার নিজের ঘরের দিকে ফিরি, আমার আবার কাল সকাল সকাল খ্যাপ মারতে যেতে হবে সেই আড্ডায়।

বললাম সেই ভালো, আমি তাহলে চলি, আবার দেখা হবে।

। দুই ।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি সারা শরীর অদ্ভুত ঝরঝরে হয়ে গিয়েছে। মনে গ্লানির আঁচড়টুকু পর্যন্ত উধাও। সবকিছু ভালো লাগল। দুদিন পর সময়মতো অফিসে ছুটলাম। সারাদিন যেন নেশার ঘোরেই বুঁদ হয়ে থাকলাম কাজের চাপে।

তারপর অফিস থেকে নিজের আস্তানা। আবার সেই সন্ধ্যা। আবার মন খারাপ হয়ে যাওয়া। আবার বেরিয়ে আসা ছুটে। একটা রাস্তা ধরে পাগলের মতো শুধু হাঁটতে লাগলাম। মনে পড়ে, এক এক সময় নিজের অস্তিত্বকে মনে হতো শ্বেত পাথরে মোড়ানো মসজিদের একটি প্রাচীন চৌবাচ্চা যার ফোয়ারা অকারণে স্তব্ধ হয়ে আছে। যেখানে সহজে পোষমানা, আমার রক্তের লাল আর সাদা মাছেরা নির্লিপ্ত সুখে হাঙরের হাঁ, বঙ্গোপসাগরের গভীরতা আড়িয়লখাঁর বুকে মেঘের উদাস খাঁ খাঁ ছায়ার কথা অনন্তকালের জন্যই বিস্মৃত হয়েছে। প্রতিদিন নির্বিকার অভ্যস্ত শিকারীর দল সন্তর্পণে শেষ করে দশ আঙুলের চাঞ্চল্যে বলে গিয়েছে, ফিরিয়ে নাও ফিরিয়ে নাও তোমার লবণাক্ত সমুদ্র, ফিরিয়ে নাও তোমার অবগা দীঘির করুণ জল আর শোকার্ত নগ্ন আকাশ, দাও সোনার হরিণ। তারপর সাইরেনের আতঙ্ক স্তব্ধ হয়ে শোনে ক্ষয়িষ্ণু জিজ্ঞাসা। প্রয়োজন হয়েছে জানাবার। আবার আমার স্বচ্ছ শরীরে ছায়া পড়েছে তাদের করুণ ম্লান সংকল্পচ্যুত ভয়ংকর বীভৎস সারি সারি মুখের। কখনো নিজের অস্তিত্বকে মনে হয়েছে ক্রুর উল্লাসে ফেটে পড়া ভূমধ্যসাগরীয় ঝড় কবলিত একজন নিঃসঙ্গ নাবিক জলাতঙ্ক আক্রান্ত, স্মৃতি বিস্মৃত বিকৃতমুখ দর্শনলোভী, যার ভিতর নেই কোনো আটলান্টিক, নেই কোনো আলোকস্তম্ভ, কোনো প্রবালদ্বীপ, দিকচক্রবাল। মনে হয়েছে জনহীন বিশাল এবং নিদয় পৃথিবীতে আমি পতিত আদম—নিঃসঙ্গ, নির্বোধ এবং নীরোগ, যার চোখে স্বর্গের স্মৃতি, নিসর্গ ভয়ংকর।

এখন ঠিক কি মনে হয় তা জানবার আর উপায় নেই। খোলা পাত্রে স্পিরিট ঢেলে রাখলে যা হয় ঠিক তেমনি যেন যাবতীয় চিন্তাধারাগুলি চিরকালের জন্যে উঠে গিয়েছে। এক বোতল যৌনক্রীড়া পান করে যারা নিশ্বাসের মনে অসংখ্যবার কামারশালার হাপর হবার জন্যে জন্মেছে তাদের বিকৃত ও আক্রান্ত চিন্তাগুলি নিদ্রার চেয়ে মূল্যবান নয়।

এখন আমি কোথায় যাবো। পৃথিবীর বাইরে কোনো নির্বাসনই সুনির্দিষ্ট নয়। মনে হয় আমি অন্ধ বধির। কোনো শব্দ আমার কর্ণপটাহ স্পর্শ করে না। আমার চোখের সামনে নেই কোনো খোলা মাঠ, নেই কোনো নদী, আমাকে ডাকে না একটি দরোজাও, পৃথিবীতে বন্ধ হয়ে গিয়েছে সব জানালা।

এক সময় আমাকে ভীষণভাবে চমকে দিয়ে প্রায় গা ঘেঁসে দাঁড়াল একটা,

লম্বা যন্ত্রদানব, আগে থেকেই ঘন ঘন হর্ন বাজছিল, ড্রাইভারের আসন থেকে কানা সাড়ে তিন পাঁট চেঁচিয়ে বললে—উঠে এসো গুরু, উঠে এসো।

আমি উঠে তার পাশে বসতেই বললে—তুমি অনেকদিন বাঁচবে গুরু, এইমাত্র তোমার কথা মনে হয়েছিলো। আজ তোমাকে আমার ভীষণ দরকার।

বললুম কি ব্যাপার কী।

—পরে সব বলবো. আগে ফ্রী হয়ে নেই। শালার এই মার্শেলাইজ বেনচি আমায় না ডুবিয়ে ছাড়বে না। তোমাদের দোয়ায় যা বাঁচা বেঁচে গেছি আজ।

পথে আর কোনো কথা হলো না। কানা সাড়ে তিন পাঁট মুখ অন্ধকার করে গাড়ী চালিয়ে সোজা তার গ্যারেজে ঢুকলো। তারপর গাড়ী থেকে নেমে কপালের ঘাম মুছে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললে, শালার নিকুচি করি আমি ড্রাইভারার কি খারাবি যে লেখা আছে তিন তক্কোই জানে।

তারপর কি মনে করে বললে- গুরু তুমি ততক্ষণ বাইরের চৌকিটার ওপর বসো, আমি গাড়ীটার চাকা ধুয়ে সাফ করে নেই।

কানা সাড়ে তিন পাঁটকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন খুব সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটিয়ে এসেছে লোকটা। আমার যথেষ্ট কৌতূহল হচ্ছিল, কিন্তু জোর করে পেটের কথা আদায় করা স্বভাব নয় বলেই কিছু জানতে চাওয়ার সাহস হলো না। গামছা দিয়ে মুখ হাত মুচতে মুছতে একসময় সে এসে বললে—চলো গুরু।

তারপর যেখানে নিয়ে হাজির করলো সে জায়গায় আর কখনো আসি নি। খুব অচেনা জায়গা, গলিগুলো গোলোকধাঁধার মতো। আমরা দুজন একটু আলগা হয়ে ছাদের এক কোণে বসলাম। বোতলের ফরমাস দিয়ে কানা সাড়ে তিন পাঁট বললে—সত্যি বলছি গুরু, আজ তোমার সঙ্গে দেখা না হলে দুঃখে মরে যেতুম। ফিরতে ফিরতে শুধু ভাবছিলুম গ্যারেজে গাড়ীটা রেখেই তোমাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজবো। একটা কথা গুরু, আজ কিন্তু আমাকে সাড়ে তিনের বেশিতে কিছুতেই যেতে দিও না। সাংঘাতিক কিছু ব্যাপার ঘটে গিয়েছে। বেসামাল অবস্থা হয়ে গেলে অগোচরে সব বলে ফেলতে পারি। তুমি আমাকে একটু সামলে রেখ।

সাহস করে বলেই ফেললাম—ব্যাপারটা কি কোনো মতেই বলা চলে না?

—কোন মতেই না।—এই বলে আমার কানের পাশে সরে এসে ফিসফিস করে বললে—কিন্তু তোমাকে সব বলবো, সেই জন্যেই তোমাকে নিয়ে আসা। বিশ্বাস কর গুরু, খোদার কসম বলছি, যতক্ষণ না তোমার কাছে ব্যাপারটা বলতে পারছি ততক্ষণ ভিতরের পাথরটা কিছুতেই সরছে না।

তারপর এক নিঃশ্বাসে পুরো একটা গ্লাস সাফ করে বললে—আজ দু'দুটো মানুষ সাবাড় করে এসেছি, একটা অসাবধানে অপরটা ইচ্ছে করে।

আমি চমকে উঠে বললাম—তুমি বলছো কি।

—যা বলছি ঠিকই বলছি। আজ সারাদিন ফুরসৎ ছিল না, ভোর থেকে প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত মাল টেনেছি, পঞ্চবটি থেকে কড়া আবার কড়া থেকে পঞ্চবটি, শালার ইট বওয়ার নিকুচি করি আমি।

জানতে চাইলাম—তা মানুষ মারলে কি করে?

—কুকুর বাঁচা'তে গিয়ে একটু সাইড নিয়েছি অমনি একজনের গায়ে লাগল ধাক্কা। এ তো শালা আর ব্রিটিশ আমলের মিনটনি ঝরঝরে ছ্যাকড়া ফোর্ড নয়, যার নাম মার্শেলাইজ বেনচি, চাকার তলায় পড়ে একেবারে চিড়ে চ্যাপটা। মরেছে এখন কি করবো। ঠেকাবার ফন্দি করছি, এমন সময় দেখি কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে এক শালা পাতিবাবু ঝুঁকে ঝুঁকে নম্বর দেখছে। তক্ষুনি সাব্যস্ত করে নিলুম এই আপদটাকে শেষ করে রেখে না গেলে নসিবে অনেক মন্দ ঘটবে। ব্যস, সিধে এসে একেবারে গায়ের উপর চাপিয়ে দিলুম, ব্যাটাচ্ছেলে কেটে পড়বার মতলবে ছিলো, চলে গেল পায়ের ওপর দিয়ে। ভয় হলো যদি কোনোমতে ধুকতে ধুঁকতে কিছুক্ষণ টিঁকে থাকে তাহলে নির্ঘাৎ কাউকে না কাউকে নম্বর বাতলে যাবে। মানুষ-জন তখন কেউ কোথাও নেই, ব্যাক করে অনেকটা পিছনে এসে এবারে একেবারে চড়া স্পীডে নাড়িভুঁড়ি, মাথামুণ্ডু সব কিমা বানিয়ে রেখে সোজা ঢাকার দিকে চলে এলাম।

আমি বললাম—কিন্তু খুব বড় রকমের অন্যায় করলে এই শেষেরটা।

—কি করবো গুরু, ওটা আমার ওস্তাদের হুকুম। মানুষ খুন করে দোজখে যাওয়া ঢের ভালো কিন্তু আইন-আদালত, ভুলেও ও পথে পা বাড়িয়েছ কি তোমার রক্ত চুষে একেবারে গরম পানিতে চোবানো ফ্যাকাসে হাঁস বানিয়ে ছাড়বে।

আমি আর কোনো প্রশ্ন না করে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে চুপচাপ বসে

থাকলাম। গোটা দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। একবার মনে হলো কি ভয়ংকর এই মানুষটা, কি ঘৃণ্য। কি জানি, এরকম কতো মানুষের ভিতরে যে মানুষ নেই কে তার হিসেবের ধার ধারতে যায়।

—গুরু তুমি নিশ্চয়ই আমাকে মনে মনে গাল পাড়ছো, কিন্তু বিশ্বাস করো গুরু, সেই থেকে আমি নিজেও ছটফট করছি না। ভিতরে যে কি রকমের অশান্তি তার আর কি বোঝাবো। যাহোক একটা ভালো কাজ করে ওটার শোধ দিয়ে দেবো একদিন।

আমি বললাম,—এইসব অন্যায়ের কোনো ক্ষতিপূরণ নেই, বুঝলে!

এরপর সাড়ে তিন বোতল হবার অনেক আগেই সে ছটফট শুরু করে দিলো। বারবার একই কথা—না হে গুরু, আজ আর বেশীদূর এগুবো না, গতরটাও যেন মানা করছে, কতো হলো আমার?

আমি বললাম,—সবে দেড়!

—বাকিটা তুমিই মেরে দাও!

আমি বললাম—এতো ঘাবড়াচ্ছো কেন?

—কি যে বলো! ঘাবড়ালুম কোথায়। রোজ কি আর একরকম যায়।

কানা সাড়ে তিন পাঁট কিছুতেই আর গ্লাস ছুঁলো না। ভাবটা এইরকম যে আমি যেন তাকে ইচ্ছে করেই সাড়ে তিনের ওপর নিয়ে যাবো এবং সে ভয়ংকর রকমের একটা বিপদে পড়বে। কোনো পীড়াপীড়িই শুনলো না সে। বললে—না গুরু, আজ আমাকে জোর কোরো না, আমার গতরে যেন ঘুণ ধরেছে, যদি বলো সারারাত তোমার সঙ্গে থাকতে হবে তাতেও আপত্তি নেই, কিন্তু ওইটে হচ্ছে না—হ্যাঁ।

তারপর রাত্রি অনেক দূর গড়ালো। একটা অস্বস্তি সারাক্ষণ কুরে কুরে খাচ্ছিলো আমাকে। কানা সাড়ে তিন পাঁটকে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলুম না, মনে হচ্ছিলো লোকটার মুখে থুথু ছিটিয়ে দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাই। কিন্তু থুথু না দিয়ে এমনি পালানোরও কোনো সাহস আমার ছিলো না। কেবলই ভয় হচ্ছিলো যে কোনো অজুহাতে আমি উঠলেই কানা সাড়ে তিন পাঁটের সন্দেহ-প্রবণ চারত্র একটা জান্তব কোপ নিয়ে ছায়ার মতো আমার পিছনে পিছনে ধাওয়া করবে। মাঝে মাঝে সে আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিলো আর অর্থ আমার কাছে দুজ্ঞের্য়। ভয়ে ভয়ে স্থাণুর মতো ভাসতে থাকলুম, যেন আমি এই ক্ষীণকায় নিস্তব্ধ মানুষটির কেনা

দাস, সে হুকুম না করলে আমার উঠবার কোনো উপায় নেই। সে যদি আমাকে তার পা-ও চাটতে বলে প্রাণভয়ে আমি তাতেও অমত করবো না। একটু সহজ হবার জন্তেই আমি বললাম—আজকের রাত্রিটা কিন্তু চমৎকার লাগছে। একটা গান ধরো দিকি।

কানা সাড়ে তিন পাঁট খুশীতে গলে গিয়ে বললে—গুরুর যেমন কথা। আমি গান শোনাবো কোথা থেকে।

এর মধ্যে ছায়ার মতো দুটো মানুষ তার পাশে এসে বসলো। তারপর একজন কানের পাশে ঠোঁট এনে ফিসফিস করে কি কোথায় সব বললো। আমার-কানে গেলো শুধু এইটুকু যে সন্ধ্যে থেকে তাকে গরুখোঁজা করা হচ্ছে।

কানা সাড়ে তিন পাঁট খুশীতে ভেঙ্গে পড়ে লাফ মারার মতো ঠিকরে উঠে বললে—বলিস কি, এই ব্যাপাব ?

—তবে আর বলছি কি।

—আমি কিন্তু একা যাবো না, আমি যদি যাই সঙ্গে আমার গুরুও যাবে। গুরুকে ছেড়ে আমি একা যেতে পারবো না।

—নিযে চলো না, বাদ সাধছে কে। বরং ভালোই হলো, আরো একটা লোক বাড়লো।

লোক দুটি চলে যাবার উপক্রম করতেই কানা সাডে তিন পাঁট তাদের আটকালো। বললে,- সবুর করো, একসঙ্গে যাই মিলেমিশে।

তারপর গড়গড় করে পয়সা-কড়ি যাবতীয় মিটিয়ে দিয়ে আমার একটা হাত ধরে টেনে তুলে বললে—চলো হে গুরু, আজ তোমায় ভূরিভোজ দেবো, একেবারে এক নম্বর জিনিস।

বললাম—একটু খোলসা করে বলে। না, ব্যাপাব কি ?

—রাস্তাঘাটে ওসব আলাপ না করাই ভালো। চলোই না, গিয়ে চক্ষু একেবারে ছানাবড়া হয়ে যাবে, হ্যাঁ।

পথে আর কোনো কথা হলো না। খুব তাড়াহুড়ো করে সে বেবি ট্যাক্সি নিলো। আমাকে সঙ্গে নিয়ে তাতে উঠে সিগ্রেটে ঘন ঘন টান মারতে মারতে বাইরের আবছা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলো মুখ বুঁজে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম আমার মাথা দুলছে, হাত-পা গুলো আলগা হয়ে গিয়েছে, যে কোন সময় বমি করে ঢাকা শহর এবং মহান রাত্রিটাকে ভাসিয়ে দিতে পারি।

আমরা যখন গন্তব্যস্থানে পৌছলাম তখন রাত্রি বারোটা থেকে একটা হবে। কানা সাড়ে তিন পাঁট আমার হাত ধরে নামাতে সাহায্য করলো। বললে,—খানিকটা হাঁটতে হবে সামনে, পারবে তো?

বললাম—খুব পারবো। আর তেমন কিছু হলে তুমি তো আছোই।

—তা আর বলতে। গুরুর জন্যে জানও হাজির আছে, আমি থাকতে একটা আঁচড়ও লাগতে দেবো না তোমার গায়ে।

কতোগুলো এলোমেলো গলিঘুঁজি ঢুঁড়ে সে আমাকে যেখানে নিয়ে তুললো সে দিকটায় মানুষজনের বসতি খুবই কম। এমন একটা রহস্যময় অন্ধকার সেখানে হিংস্র প্রাণীর মতো ওঁৎ পেতে আছে যা শহরের আর কোথাও নেই।

একটা বাড়ীর ভিতর ঢুকে, উঠোন পার হয়ে সে কড়া নাড়লো। জানালা খুলে কে একজন দেখলো, তারপর দরোজা খুলে দিয়ে বললে—সঙ্গে কে?

—আমার নিজের লোক।

—চলে এসো।

ভিতরে বড় রকমের দুটো তক্তপোষ ও ঢালাই বিছানা। ইতোমধ্যে প্রচুর বোতল ভাঙা হয়েছে বোঝা গেল। সব মিলে এগারো জন মানুষ যাদের সবাই একটা বিশেষ শ্রেণীর। কারো চোয়ালের পুরু শক্ত হাড় বিশ্রীভাবে ঠেলে উঠেছে, কারো মুখে তারের বুরুশের মতো দাড়ির জঙ্গল, ডুবে শামুকের মতো কারো চোখ, কারো পুরু ঠোঁট ঝুলে পড়েছে নিচের দিকে। এক নজরেই খুব একরোখা এবং মারমুখী ধরনের মানুষ বলে সনাক্ত করা যায় তাদের।

কানা সাড়ে তিন পাঁট খ্যাক খ্যাক করে হেসে একজনকে জিজ্ঞাসা করে,—শালার ব্যাটা শালা বোধহয় ঘরে ছিলো না সে সময়?

—ঘরে থাকলে কি আর রক্ষে ছিলো।

একজন বলতে থাকল—এইবার শালার থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছি।

কানা সাড়ে তিন পাঁট বললে—কজনের হলো?

একজন বললে—এখন ছ নম্বর চলছে।

কানা সাড়ে তিন পাঁট বললে—আমার গুরুকে কিন্তু সিরিয়ালে ফেললে চলবে না, এর পরের বারেই একে চান্স দিয়ে দাও।

এবং কিছুক্ষণ বাদে পাশের ঘরের দরোজা খুলে হাসতে হাসতে ওদের একজন ফিরে আসতেই কানা সাড়ে তিন পাঁট আমাকে গুঁতো দিয়ে উঠিয়ে

বললে—যাও গুরু যাও, সিধা ঢুকে গিয়ে খিল দাও। সিগন্যাল দিয়েছে।

আমি ভিতরে ঢুকে প্রথমে দরোজাটা ঠেলে দিলাম, তারপর চেষ্টা করলাম খিল দিতে, কিন্তু অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে কিছুই খুঁজে পেলাম না। শেষে পকেট থেকে দেশলাই বের করে জ্বালাতেই সবকিছু নজরে পড়লো। খিল আটকে দরোজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ডান হাত বাড়িয়ে বাতি জেলে দিলাম, এক কোণে মাদুরের ওপর তালগোল পাকানো শাড়ী কাপড় চোপড় ইত্যাদির পাশে সতেরো আঠারো বছরের একটি মেয়ে। শুয়ে আছে না পড়ে আছে বুঝবার উপায় নেই। সাহস সঞ্চয় করতে একটু সময় লাগলো। প্রথমে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, তারপর উবু হয়ে বসলাম, তারপর চেষ্টা করলাম চুমু খেতে। আমার পা টলছিল। আমার মাথা ঘুরছিল। ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো আমি তার পা থেকে মাথা অবধি বারম্বার চাটলাম। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে মাথার ধাক্কায় ঠেলতে ঠেলতে তার নগ্ন দেহটাকে মাদুর থেকে মেঝেয় নিয়ে গেলাম। কতোগুলো অসংলগ্ন প্রলাপের স্রোতে ভাসমান আমার শরীরটা এক সময় অতল রক্তাক্ত আর্তনাদে তলিয়ে গেল।

ঠিক কখন বেরিয়ে এসেছিলাম হিসেব করে বলতে পারবো না। আমার মাথার ঠিক ছিলো না। বেরিয়ে এসেছিলাম প্রচণ্ড শব্দে দরোজা খুলে। কানা সাড়ে তিন পাঁট হেসে বললে—গুরু আনার মতো থার্ড গিয়ার পছন্দ করে দেখছি।

আমি বললাম—আমি চলে যেতে চাই, তুমি একটু এগিয়ে দাও।

—সেকি কথা। একা তো যেতেও পারবে না, যে রকম টলমল করছো!

বললাম—খুব পারবো। তুমি শুধু একটু এগিয়ে দাও। আর কিছু চাই না।

রাস্তায় নেমে বললে—কেমন জিনিস বলো দিখি এখন?

বললাম—ভালো। সকাল পর্যন্ত টিঁকলে হয়।

—না টেঁকে না টিঁকবে, আমাদের কি। বাম্ব পড়লে পড়বে শালা ওই জানোয়ার আলির মাথায়।

তারপর এক সময় আমি একা হয়ে গেলাম। কানা সাড়ে তিন পাঁট ফিরে যাবার জন্যে খুবই উদগ্রীব দেখে তাকে ছেড়ে দিলাম। মনে হলো তার মন থেকে দুটো মানুষ খুন করবার গ্লানি এক অদ্ভুত রসায়নে সবটুকু উবে গিয়েছে। কিন্তু আমি? কানা সাড়ে তিন পাঁট সন্ধ্যায় মনে যে গ্লানি নিয়ে দু'হাতে

আমাকে আঁকড়ে ধরেছিলো এই মধ্যরাতে সেই একই গ্লানিতে আক্রান্ত হয়ে আমি কাকে জড়িয়ে ধরবো। সারাপথ হেঁটে, বারবার পুলিশের কাছে সন্তোষ-জনক কৈফিয়ৎ দিয়ে প্রায় শেষরাতে ঘরে পৌঁছলাম। আমি আগের মতোই আবার সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, সবকিছু শুনতে পাচ্ছি, অথচ আমার সবকিছু হারিয়ে গিয়েছিলো। ঘরের বাধ্য দেওয়ালগুলো আমার গায়ে যেন কিসের একটা গন্ধ পেয়ে থমকে আছে।

'আমার নাম হেনা।'

'হাসনা হেনা।'

'আমার বিয়ে হয়নি। আমার বিয়ে হয়নি।'

'আমাকে মেরো না এমন করে।'

'আমাকে চুরি করে এনেছে।'

'আমার দেশ বিক্রমপুর।'

'আমি কোনো অন্যায় করিনি।'

'আমার ওপর অত্যাচার করেছে অনেকগুলো মানুষ।'

'আমি উঠতে পারি না।'

'রক্তে আমার পা ভেসে যাচ্ছে।'

'আমাকে তুমি মেরে ফেলো।'

'আমার ভাই আছে।'

'আমার ভাই পড়ে।'

'তুমি আমার ভাই।'

'তুমি আমাকে মেরে ফেলো।'

'তোমরা হাসনা হেনাকে মেরে ফেলো।'

'তোমরা হাসনা হেনাকে জ্যান্ত কবর দাও।'

'রক্তে আমার পা ভেসে যাচ্ছে।'

'তুমি আমার ভাই।'

'রক্তে আমার পা ভেসে যাচ্ছে।'

'তুমি আমার ভাই।'

'রক্তে আমার পা ভেসে যাচ্ছে।'

'রক্তে আমার পা ভেসে যাচ্ছে।'

'রক্ত রক্ত রক্ত রক্ত রক্ত রক্ত।'

আমি বিছানার ওপর বসে পাশের টেবিলে মাথা রাখলাম। বধির হয়ে জন্মাইনি কেন। কেন স্মৃতিভ্রষ্ট হয়না আমার শ্রবণ। আমি কাউকে চিনিনা, কাউকে চিনতেও চাই না। আমি জানি আমার কোনো বোন নেই, না কোনো হেনা, না কোনো হায়েনা। আমি চাইনা কারো রক্তাক্ত পায়ে শোকের নদী হয়ে বয়ে যেতে। আমি জানি আমার শরীরেও ছ'জনের অত্যাচারের রক্ত লেগে গিয়েছে, কিন্তু রক্ত রক্ত রক্ত রক্ত রক্ত রক্ত বলে হেনার মতো ছ'বার তা উচ্চারণ করতে চাই না। মনে হলো আর একটু পরেই সূর্যোদয় হবে, আমি মাথা তুললাম টেবিল থেকে, নিজ হাতে জানালা খুলে দিলাম, ভোরের অপেক্ষমাণ অদ্ভুত বাতাস হুড়মুড় করে ঢুকলো। আমি জানালার ঠাণ্ডা লোহার শিকে কপাল ছুঁইয়ে বললাম,—'হে প্রভাত, তুমি আমার জনক হও, যেহেতু আমি জারজ, গোত্র পরিচয়হীন, আমি চাই তোমার পরিচয়ে সন্তান হতে। হে প্রভাত, হে আমার পিতা, আমাকে আলোড়িত হতে দাও, আমি জানিনা কি করে উন্মথিত হতে হয়, ভাষা দাও ভাষা দাও ভাষা দাও!'

'মাগো।'

'আজরাঈল তুমি কি অন্ধ হয়ে গেছ?'

'মাগো।'

'আমাকে শেষ করে দাও, আমাকে শেষ করে দাও তোমরা।'

'মাগো।'

'তোমাদের হেনা যে মরে গেল মাগো।'

'মাগো।'

'এরা মানুষ নয় এরা শকুন এরা শকুন এরা শকুন।'

'মাগো।'

'আমি শেষ হয়ে যাচ্ছি।'

'মাগো।'

'মা—আমার মা—মা, মা, মা, এসে দেখে যাও রক্ত রক্ত রক্ত রক্ত রক্ত রক্ত।'

আমি আমার টেবিলের পাশে আবার এলাম। মনে হলো আজ বছরের প্রথম দিন, স্বচ্ছন্দে অনেক কিছুই বাদ দিতে পারি, ইচ্ছে করলে সূর্যোদয়ের পর থেকে হিসেব করতে পারি নিজের। আমি ভুলতে চাই হেনার কথা। মুছে ফেলতে চাই মন থেকে। আসলে হাসনা হেনা এমনই একটা ফুল যার

সৌরভে শুধু ভ্রমরই আসে না, আসে কালসাপও। মনসা, মাগো।

তারপর সূর্যোদয় হলো ১লা জানুয়ারীতে। বাসিমুখে একটা বগলা ধরাবার পর সন্তর্পণে খুব নরমভাবে আমার মনে হলো— এক একদিন আমার চলে যেতে ইচ্ছে করে। সব ছেড়ে, সব ফেলে, সব মুছে দিয়ে এক একদিন আমাব ইচ্ছা করে চলে যেতে অনন্তকালের জন্যে। এক একদিন আমার কানে বৃষ্টির তাণ্ডব, জলের উচ্ছল কলরোল, চোখের নিস্তব্ধ ক্লোরোফর্ম, সাপের মতো কুণ্ডলী পাকানো নিভৃত প্রেম কি দুঃসহ যে হয়ে ওঠে। আর একদিন হৃদয় চিবে হৃদয়কে আবিষ্কার করার পাপাসক্ত আয়োজন সারি সারি কষ্টের ফলক ছড়ানো কবর-খানা মনে হয়। মনে হয় যা কিছু দেখেছি—খোলা চোখে কিংবা স্বপ্নে, যা কিছু অনুভব করেছি—রক্তের বিনিময়ে অথবা স্বভাবের তাড়নায়, তার সব কিছুর অন্তরালেই আছে আমাকে প্ররোচিত করা, চলে যেতে। একদিন আমার ভিতরে আলো জেলে দেয় ভয়াবহ অন্ধকার। একদিন আমার ওপরের চামড়া হিংস্র সূর্যালোকে পুড়ে কালো হয়ে যায়। এক একদিন আমি ময়ূর সিংহাসনে সমাসীন কাপুরুষ অথচ লম্পট সম্রাটের মতো ভয়াবহ দিবাস্বপ্নে শিউরে উঠি, যেন মরকত খচিত বিশাল প্রাসাদ অতর্কিত বিস্ফোরণে বিপুল নীলিমায় নিক্ষিপ্ত। এক একদিন শিউরে উঠি পেখম মেলা ময়ুর দেখে, মনে হয় তাব পায়ে পাক খেয়ে জড়িয়ে আছে বিষধর সোনালী সাপ। এক একদিন মনে হয় চলে যাই, মনে হয় বঙ্গোপসাগরীয় বাতাসে, বিশাল বিস্তৃত আকাশের কোথাও, কিংবা সুবিস্তীর্ণ সবুজ ধানক্ষেতে মৃত্যু তার নাম লিখে গিয়েছে চুপিসাড়ে। মনে হয় গলিত কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত আকাশের গা থেকে ভয়াবহ আলো খসে পড়ছে, মনে হয় পৃথিবীর সব আগ্নেয়গিরিই সচল আর তাদের গায়ে নাক ঘষে পাক খেয়ে খেয়ে হু হু করে মানুষের দিকে তেড়ে এসেছে বাতাস, জলাস্তীর্ণ ধানক্ষেতের গোপনে গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত কোন শিল্পীর ভাসমান লাশ ভয়ংকর স্ফীত। এক একবার মনে হয় চলে যাই যখন অতিরঙ্গ মুখগুলোও শাণিত বন্য কৃপাণ হয়ে ওঠে, যখন সত্যের নাভি থেকে স্খলনে অভ্যস্ত মায়াবী বসন জলপ্রপাতের মতো ভূমিতে আছড়ে পড়ে। ইচ্ছে করে চলে যেতে যখন আমার কষ্টের অ্যাসিডে মৃত থরপড়া চোখে ধর্ষিতা হেলেন বিধ্বস্ত ট্রয়ের স্মৃতি রোমন্থন করে আর সমুদ্রের নীলরক্ত ক্রুর উল্লাসে শুদ্ধ নীলিমার দিকে ফিরিয়ে দেয় বজ্রনিনাদ, চলে যেতে ইচ্ছা করে, চলে যেতে ইচ্ছা করে। আর সেদিন

চলে যেতে ইচ্ছে করে যখন সারা দেশকে মনে হয় ক্ষত জর্জর মৃত আমার পাগলিনী মায়ের মতো নিরুত্তর পড়ে আছে, যেদিন আমি আক্রান্ত হই শকুনের—রক্তের এবং চীৎকারের ভয়ে, যেদিন ভিতরের সব নদী অকস্মাৎ স্তব্ধ পাষাণে পরিণত, সেদিন ইচ্ছে করে আমি আমার সব নাম নিজের হাতে মুছে দিয়ে চিরকালের জন্যে আমার কঠিন পিতা সরল পিতামহ নির্বোধ প্রপিতামহ ও ন্যুব্জপিঠ পলায়নপটু একটি জাতির মতো—তার সভ্যতার মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাই।

চিতা

শওকত আলী

তখনও চারদিকে বুনোজ্যোৎস্না ঝলমল করছে। দূর থেকে একটা চিতার হিংস্র গর্জন কানে আসছিলো, এখন সেটা থেমেছে। হাওয়ায় তুহিনতীক্ষ্ণতা। ঘাস আর শিশিরে মাখামাখি, দুজনে বসেছিলো। রাইফেলটা পড়ে রয়েছে পায়ের কাছে, আর ওরা কাছাকাছি খুব, যেন পরস্পরকে আজ সম্পূর্ণ চিনে নেবে।

অদূরে টিলায় টিলায় বনঝাউ আর বাবলার গাছ থেকে হাওয়ার শব্দ আসছে। সেই শব্দ দুজনে অনেকক্ষণ শুনলো কান পেতে। তারপর একসময় অস্ফুট বললো, হাওয়া দিয়েছে।

হ্যাঁ।

চলো ফিরে যাই, ঠাণ্ডা লেগে তোমার অসুখ করবে, এমনিতে ক্লান্ত তুমি।

না বসো আরেকটু, সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে।

মেয়েটা ওর আরণ্য দুচোখের দিকে তাকিয়ে দেখলো কি যেন। তারপর বললো, এখানে আমরা এলাম কেন?

কায়সার চুপ, ওর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। অরণ্যের অখণ্ড নির্জনতার স্বাদ অনুভূতির মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে। কেউ কোথাও নেই, শুধু হাওয়ার শব্দ আর উতরোল জ্যোৎস্নালোক। সেই অনুভবের মধ্যে নিমগ্ন থেকে মনে হলো ওর রক্ত বোধহয় শীতল হয়ে আসবে, হৃৎপিণ্ড বোধহয় স্তব্ধ হয়ে যাবে। কিংবা হয়তো অমনি অমনি ওর নির্জন মৃত্যু ঘটবে। ওর তবু ভালো লাগলো, শুধু ভালো লাগলো।

নীহার ওর কাছাকাছি সরে এলো আরেকটু। ওর শরীর আশ্চর্য উষ্ণ। কানের কাছে মুখ নিয়ে শুধালো, তোমার কি হলো, কথা বলছোনা যে!

না, কি বলবো! কায়সার মেয়েটার কথায় অবাক হলো। ও অমন করে কথা বলছে আজ, এতো অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব আজ ওদের, অথচ দুদিন আগেও সাধারণ ভালোমন্দ কথা জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়া আলাপ করতো না। কি বিচিত্র

যে মানুষের জীবনের গতি। কতো ঘটনা মানুষকে এগিয়ে দেয়।

নীহার ওর ঠাণ্ডা হাত রাখলো কায়সারের কপালের ওপর, সত্যি খারাপ লাগছে নাকি তোমার!

না, না, খারাপ লাগবে কেন? এবারে হেসে ফেললো কায়সার। ওর নাকে এসে লাগছে নীহারের দেহের গন্ধ। ও সেই জ্যোৎস্নালোকে লক্ষ্য করে দেখতে চাইলো সমস্ত দিন যে আশ্চর্য যৌবন মেয়েটি নক্সাকাটা শাড়ি-জামায় আবরণে ঢেকে রাখে, যে একটি মানুষের সুখদুঃখের দেখাশোনা করে, সে কেমন করে এমন আশ্চর্য কথা বলছে। কায়সারের কেবল দেখতে ইচ্ছে করলো মেয়েটাকে। যেমন ক'রে ও দূরের শিকারকে লক্ষ্য ক'রে শক্তিমত্তা আর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পড়ে তেমনি ক'রে ওর মুগ্ধ হয়ে যেতে ইচ্ছে করলো।

নীহারের উদ্বেগ তখনও কাটেনি। সে আর কাছে এসে বললো, কি হয়েছে তোমার বলো?

নাঃ, কিছু হয়নি। হাসলো কায়সার।

তোমার সঙ্গে বেড়াতে আসাটা এমন বোকামীর হবে কে জানতো! আমি যাই। নীহার উঠলো।

কায়সার নিস্পৃহ চোখে লক্ষ্য করলো মেয়েটিকে। ওর চোখের সম্মুখে ভাসছে খররৌদ্রের দুপুরে দেখা লালরঙের জামা-কাপড়ে আবৃত মেয়েটার অবয়ব। এখানে জ্যোৎস্নার আলোয় দেখলো ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। কি অপরূপ দেখাচ্ছে এখন। ভ্রূদুটিতে কেমন যেন একটা শ্লেষের তীব্রতা জমছে। ধীরে ধীরে বিরক্তির একটা কুটিল ছায়া নক্সা কাটতে আরম্ভ করেছে দু'চোখের ওপর দিয়ে। নীহার পা বাড়াতেই বললো, একা যেওনা, বসো।

না আর বসতে পারবো না। ভালো লাগছে না, আমি যাচ্ছি।

বেশ যাও, তবে রাইফেলটা সঙ্গে নিয়ে যাও।

না। নীহার উঠে দাঁড়িয়ে পা বাড়ালো। ওর অসহ্য লাগছে লোকটিকে। অথচ ওর সঙ্গে বেড়াতে বের হতে ভালো লাগছিলো। এখন দেখছি সাধারণ ভদ্রতা কাকে বলে তাও জানা নেই লোকটার। নিজেরই ওপর ধিক্কার এলো, ছি ছি এই লোককে এতোখানি সম্মান দেখিয়েছি আমি। ও নিজেকে বারবার বললো, মিছেই তুমি একে বন্ধু বলে ভেবেছো।

নীহার কয়েক পা এগোবার পর হঠাৎ ডাকলো কায়সার, ফিরে এসো। চিতাটা কাছাকাছিই কোথাও আছে।

থাকগে! হাসলো নীহার। ও ত' এ জঙ্গলেই থাকে, এবং চেনাজানা জীব। তোমার চেয়ে ভদ্র ব্যবহারই করবে হয়তো। নিজেকে সামলে রেখো বরং তুমি।

নীহার সত্যিই চলে যাচ্ছে দেখে কায়সার রেগে উঠলো। বললো, বলছি যেওনা। যেন আদেশ করছে ও। নীহারের গা জ্বলে উঠলো অপমানে। লোকটা কি কাণ্ডজ্ঞান সবকিছু হারিয়ে ফেলেছে নাকি। ও মুখোমুখি ফিরে তাকালো, না আমি ফিরে যাবো। এখুনি যেতে হবে।

কায়সার কোন কথা বললো না। কাছে এসে হাত ধরে টেনে আনলো। গাঢ় কণ্ঠে বললো, না যাবে না তুমি। নীহার হাত ছাড়িয়ে নিতে লাগলো, পারলো না। একটা বলিষ্ঠ শক্তি ওকে টেনে নিলো। ও কায়সারের বুকের উপর বাঁধা পড়লো।

মানুষ ত' নয়, তৃষ্ণার ফুল। এই মেয়ের শরীরময় এতো তৃষ্ণার জ্বালা। এতো পিপাসা ছড়াতে পারে ও শরীরময়। ওর স্ফীত আর নরম বুক নিজের বিশাল বুকের ওপর চাপতে চাপতে ও বললো, তবে আমাদের মৃত্যু হোক, মৃত্যুই হোক।

নীহার চুপ করে রইল সমস্তক্ষণ। এক সময় অনুভব করলো একটা বিরাট শক্তি ওর সমগ্র চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। ওর সমগ্র অস্তিত্বের ওপর একটা পৌরুষের দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে আর ও যেন ক্রমেই অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে। এবং যতোই অন্ধকারে ও নিজের সত্তা হারাচ্ছে ততই যেন জীবনের দীপ্তি জ্বলছে তার অস্তিত্বকে ঘিরে।

তারপর নীহার বুঝলো না কখন ও নিজেকে ছাড়িয়ে দূরে সরে দাঁড়িয়েছে দু'চোখে তীব্র ভৎ‍র্সনা নিয়ে। কখনইবা ওর দেহের ভেতরকার সেই আলস্যের মন্থরতা কেটে গিয়ে একটা কঠিন ঋজুতা এসে ওকে শক্তপায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কায়সার কথা বললো না কোন। দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখলো শুধু। অনেকক্ষণ দুজনের দিকে দুজনে নীরবে চেয়ে দেখলো। তীক্ষ্নদৃষ্টিতে যেন একে অপরকে যাচাই করে নিলো। তারপর নিঃশব্দে হেঁটে এসে রাস্তার মোড় পার হয়ে যে যার নিবাসে চলে গেলো। কায়সার ফিরবার সময় ভাবলো, এতো আমি চাইনি। এযে আরও যন্ত্রণায় নীলদাহ ছড়িয়ে দিলো সমস্ত চেতনায়। নির্জন চৌধুরী বাড়ী—ঘরের ভেতরে অনেকরাত অবধি পায়চারি করে কাটালো। আর ভাবলো নীহার তো এতো অপরূপ তবু অমন করে কি

খুঁজছে তার কাছে। কি জানতে চায় ও। এই দুটি দিন শুধু দেখেছে মেয়েটা ওকে।

স্বামীর কাছে বসেও ওর স্থির দৃষ্টিতে আকুল কৌতূহল জেগেছিলো সর্বক্ষণ। ওর মনকে যেন কুটিল আঙুলে নেড়েচেড়ে দেখতে চেয়েছে মেয়েটা।

অথচ কায়সারকে এখানে আসতে বলার প্রস্তাবে প্রথমে ও-ই আপত্তি তুলেছিলো। রীতিমতো ঝগড়া হয়েছে দুজনে এই নিয়ে। ও চায়নি একটা বাইরের লোক দুজনের জগতে এসে অযথা বিরক্তির সৃষ্টি করে যাক। যেদিন চিঠিটা এসেছিলো, সেদিন কামাল ওর মত নিতে এলে বলেছিলো তুমি বারণ করে দাও, এখানে শিকারের সুবিধা কিছু নেই। থাকা খাওয়ার ভয়ানক কষ্ট। তা'ছাড়া তুমি নিজেই কষ্ট পাচ্ছো।

কামাল স্ত্রীর বিরক্তি দেখে বিব্রত হয়েছে। বলেছে, তুমি কি বলছো তার ঠিক নেই। পুরনো বন্ধু মানুষ, এতোকাল পরে আসবে, একটা আশ্রয় যদি না দি……।

তুমি কি সরাইখানা খুলে বসেছো নাকি ? এতো লোক তোমার কাছে আসে, নীহারের ক্ষোভ আর বিরক্তি একই সঙ্গে প্রকাশ পেলো, আমার মোটে ভালো লাগে না।

কিন্তু আমরা না ডাকলেও তো আসবে, হয়তো দূরের ডাক-বাংলোতে ঠিকই থেকে যাবে কয়টা দিন। মাঝখান থেকে বদনাম হবে। কামাল ওকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে।

বেশ তুমি যা ভালো বোঝো কর, নীহার আর কথা বাড়াতে চায়নি —পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। ওর আর ভালো লাগেনি। সত্যি, কতো রকমের যে মানুষ এসে থাকতে চায় ওদের কাছে। কতোজন যে শিকার করতে আসে, কতোজন যে হাওয়া বদলে যায়। আর এসমস্ত ব্যাপারে নীহার নিদারুণ অস্বস্তি আর বিরক্তির মধ্যে ক্রমশঃ নিজেকেই হারিয়ে ফেলে।

আর সবার মতোই এসেছে এ্যাকোয়ার্ড ষ্টেটের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার কায়সার আহমদ। এক বিকেলে লটবহর সমেত এসে উঠলো ফরেষ্ট অফিসারের বাংলোতে। খুব মনোরম জায়গা, একপাশে তেঁতুলিয়া হয়ে জলপাইগুড়ির সীমান্ত পর্যন্ত শুধু শাল আর সেগুনের সাম্রাজ্য, আর অন্যপাশে বিহারের সীমানা। মাঝখানে অরণ্য। সকালে পাতার ফাঁক দিয়ে রোদের রেখা এসে

কাঠের দেয়ালে ছবি আঁকে, সমস্ত দুপুর হাওয়া দেয়, বনপালা গান গায় আর নিঃশব্দে সন্ধ্যা নামে। তারপর অন্ধকারে হাওয়ার আলোড়ন আর দূরে বুনো শ্বাপদের হিংস্র গর্জন। কায়সারের ভালো লেগে গেলো। দু'বন্ধুতে অজস্র কথা বললো সমস্তটা বিকেল, সন্ধ্যা। অবশেষে কয়েকটা লোক এলো আর উঠলো কায়সার। তাকে ফিরতে হবে।

ফিরতে হবে? বিমূঢ় প্রশ্ন করেছে কামাল।

হ্যাঁ ভাই, অফিসের কাজও দেখা চাই, সেজন্যেই ত' আসা। চৌধুরী বাড়ীর পুরনো দলিল-পত্রগুলো দেখতে এসেছি। ওদের পুরনো ম্যানেজার ওখানেই থাকার ব্যবস্থা করেছেন।

তবে এলি কেন?

হেসে ফেললো কায়সার কামালের অবস্থা দেখে। বললো, ওদের ওপরে ভরসা ছিলো না তাই এখানে এসে উঠেছিলাম। খানিকপর বললো আবার, আর সকাল বিকেল ত' এখানেই কাটাবো গল্প জমিয়ে।

কামাল আশ্বস্ত হয়েছে অবশেষে। আর যাবার সময় দরজার কাছে এসে হঠাৎ কায়সারের খেয়াল হয়েছে কামালের বৌ-এর সঙ্গে দেখা করে যাওয়া দরকার। কামাল নিয়ে এলো নীহারকে। আদাব জানিয়ে কায়সার সেদিনকার মতো অন্ধকারে পথে নামলো।

কয়টা দিন কেটেছে বাইরে বাইরে। বুনো পায়রার ওপর গুলি ছুঁড়ে, দু'চারটে বরা-কে জখম করে, আর সমস্ত দিন বন্দুক কাঁধে একাকী জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে। রোজ একবার করে কামালের ওখানে হয়ে গেছে। সকালের রোদে বসে উচ্চ হাসিতে ঘর ভরে দিয়ে গল্প করেছে দু'বন্ধুতে। সব ওদের ছেলেবেলাকার গল্প। তারপর কামাল এক সময় অফিসের জন্যে উঠলে কায়সার বেরিয়ে পড়েছে সবুজের সাম্রাজ্যে।

সেদিন হঠাৎ দেখা হয়ে গেলো নীহারের সঙ্গে। কামালের খোঁজে এসেছিলো, কামাল ছিলো না, নীহার বেরিয়ে এসে বললো, উনি নেই।

নেই! হতাশ হলো একটু যেন লোকটা। তারপর মুখ তুলে চেয়ে দেখলো নীহারকে। মনে মনে স্বীকারও করলো, হ্যাঁ, খুব সুন্দরী মেয়ে কামালের বৌ। ওর শরীরের রঙ শ্যামল কিন্তু কি আশ্চর্য পুষ্পিত শরীর ওর। মন ভরে দেখে নাও, ওর মন একবার ফিস ফিস করে কানের কাছে সাড়া দিয়ে উঠলো বোধহয়। ও সেই ইচ্ছেকে শাসন করলো মনে মনে। চোখ নামিয়ে

নিলো একটু পর। তারপর বললো আপনার সঙ্গে ত' আলাপ হলো না। কামাল না আসা অবধি আসুন গল্প করি।

কায়সারকে নিয়ে নীহার বারান্দায় বসলো। এমনিতে লোকটা একটু বিরক্তিকর। অভদ্র রকমের চোখমুখ, পানখাওয়া লালচে দাঁত, চুরুটখাওয়া পুরু ঠোঁট, আর অজস্র কথা বলে, হাসে ঘরের দেয়াল কাঁপিয়ে। এলোমেলো চুল, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ভয়ানক অস্বস্তিকর চেহারা লোকটার। তবু ভদ্রলোক ত'—নীহার সান্ত্বনা দিয়েছে নিজেকে। এই জঙ্গলের দেশে এমন লোকই বা কয়জন মেলে—তাছাড়া স্বামীর বন্ধু মানুষ। একথায় সেকথায় অনেকক্ষণ গল্প হলো দুজনাতে।

গল্প যখন ফুরিয়ে এলো তখন নীহার অবাক না হয়ে পারলো না। এতক্ষণ ধরে ও কেমন করে কথা বলতে পারছে লোকটার মুখোমুখি বসে। কথার শেষে ও বুঝতে পারলো লোকটার প্রকৃতিটা অদ্ভুত বন্য রকমের। সেদিন শান্ত দুপুরে বারান্দার মেঝের উপরে চেয়ারে মুখোমুখি বসে একসময়ে ওদের কথা ফুরিয়ে এলো। কায়সার কথা শেষ করে বললো, এতো আশ্চর্য মেয়ে আপনি।

আশ্চর্য! অবাক হলো নীহার। কেন?

সে প্রশ্নের জবাব দিলো না কায়সার। দুচোখের আশ্চর্য দৃষ্টি পড়লো এসে নীহারের চোখের ওপর। নীহার চোখ ফিরিয়ে দেখলো, ডানদিকে পুকুরের পাড়ে ঘন গাছের ছায়া পড়েছে।

আমি রাতের বেলাতে জ্যোৎস্নায় বার হয়ে পড়ি কখনো কখনো। ঠাণ্ডা হাওয়া আসে, শিশির গুঁড়ো গুঁড়ো ঝরে পায়ের তলে, আর গাছের পাতায় পাতায় উত্তরের হাওয়া সাড়া দিয়ে যায়। জ্যোৎস্না-ভরা সে অরণ্যের রূপ দেখে এতো ভালো লাগে, সব ভুলে যাই তখন আমি। অনেক সময় হাতের কাছে শিকার এসে পড়লেও মারতে পারি না। কয়দিন আগে একটা বরা'র মুখোমুখি পড়েছিলাম। জানোয়ারটা কখন যে সম্মুখে এসেছে টের পাইনি। যখন ক্রুদ্ধ হুঙ্কার দিয়ে উঠেছে তখন ফিরে তাকিয়ে সরে গিয়েছি। পাশ দিয়ে জন্তুটা ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেছে। প্রত্যেকটা মুহূর্ত মৃত্যু আর আশঙ্কা, আর তার সঙ্গে জ্যোৎস্নায় মাতাল হয়ে যাওয়া। আপনি গিয়েছেন কখনো বনে, এমনি জ্যোৎস্না রাতে? মন্ত্রের মতো এতোক্ষণ কথা বলে ও শেষে শুধালো।

না, মাথা নাড়লো নীহার।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললো. কায়সার, অথচ আপনি এই অরণ্যেই দিনের পর দিন কাটিয়ে যাচ্ছেন, অরণ্যের সবুজ আপনার শরীরে লাবণ্য ভরে দিচ্ছে, এই রৌদ্র আপনাকে বেঁচে থাকবার প্রেরণা দিচ্ছে। আপনি কতো সুন্দর হয়েছেন, সত্যি আশ্চর্য্য সুন্দর দেখতে আপনি। অথচ আপনি কিছুই লক্ষ্য করেননি। একটু থেমে আবার বললো, সেদিন সন্ধ্যেবেলা যখন দেখা হলো, তখন ভাবিনি আপনি এমন !

কি বলছেন আপনি? নীহারের কণ্ঠে বিরক্তি প্রকাশ পেয়েছে। এবং সেই সঙ্গে একটা মিহি ভয়ও কেঁপেছে বুকের মধ্যে।

কিছু মনে করবেন না, আমি বড় বাজে কথা বলি। বলে কায়সার হেসেছে এবং সেদিনই কায়সার কামাল আর নীহার রাতে বেরিয়ে এসেছে জঙ্গলে। তার পরদিনও অনেক রাত অবধি ঘুরে বেড়িয়েছে তিনজনে। আজ নীহার গিয়েছিলো কায়সারের নিবাস দেখতে। কায়সার ছিলো না, শিকারে বেরিয়ে-ছিলো, সন্ধ্যে পর্যন্ত অপেক্ষা করে ফিরছিলো—এমন সময়ে দেখা হয়ে গেলো। সেই অরণ্যে বুনো জ্যোৎস্নার মাঝখানে ওরা পরস্পরকে জানতে চাইলো আকুল তৃষ্ণা নিয়ে। কায়সার সেদিন সমস্ত রাত্রি শুধু ঘরময় পায়চারি করলো। সেতো চায়নি এমন হোক। এই দীর্ঘ রাত্রি ওকে ঘৃণা আর কুটিল গ্লানিতে জ্বালিয়ে তুললো। ও সমস্ত রাত ঘুমোলো না।

নীহার সে রাতে কথা বললো না কারুর সঙ্গে। কামাল শহরে গিয়েছিলো, ভোর রাতের দিকে ফিরে এলো। এসে দেখলো তার স্ত্রী তখনও ঘরে আলো জ্বেলে চেয়ারে বসে রয়েছে জানালার দিকে মুখ করে।

তারপর নীহারের সমস্ত দুপুরগুলো ছড়িয়ে রইলো বাড়ীটার উঠোনে। কতো কাজ ওর, কথা বলতে ইচ্ছে করে না মোটে কারুর সঙ্গে। সকাল থেকে ওর কাজ নিয়ে ব্যস্ততা আরম্ভ হয়। তারপর স্বামী অফিসের কাজে চলে যাওয়ার পর ও উঠোনের রোদে একটা চেয়ার নিয়ে বসে। দেখতে দেখতে হেলাফেলায় হেমন্তের দুপুর ফুরিয়ে যেতে থাকে। শান্ত নিঃশব্দতার মাঝখানে থেকে একটা আশ্চর্য আর শূন্য পরিতৃপ্তিতে মনটা ভরে যায়। ছোটবেলাকার ঘটনাগুলো পরপর সাজিয়ে ও মনে মনে বিচিত্র রকমের ছবি আঁকে। আর মাঝে মাঝে মুগ্ধ হয়ে শোনে হাওয়ার বনমর্মর। দেখে নিমগাছ থেকে সব পাতাগুলো একে একে ঝরে আসছে, কয়টা প্রজাপতি ফুরফুর করে উড়ছে টবের ফুলগুলোর চারপাশ দিয়ে। একসময় হয়তো কোন বুনো পাখী ডানা ঝাপটে

ডেকে ওঠে, আমড়া গাছের ডাল থেকে ডালে কাঠবিড়ালী ঝুপ ঝুপ শব্দ করে লাফিয়ে নামে। ও দেখে আর দেখে। ওর মনোময় থাকে সেই নিস্পৃহ আর শূন্য একটা পরিতৃপ্তি। শিশুকালে, ওর মনে পড়ে, আহা কি বিচিত্র দিনের আলোয় ভরে যেতো ওর সমস্ত দেহ, কি অজস্র হাওয়া ছিলো সে দেশে আর সেই সাঁওতাল ছেলেরা মাতাল হয়ে উদ্দাম নাচতো পৌষের ক্ষেতে নেমে। কি বিচিত্র দেশ, রূপাভাঙ্গা, জলঢাকা, ফুলবাড়ী। তারপর শহর। মিলি, বিলকিস আর মিকি সেই মেয়েগুলো, তাদের বন্ধুরা। কৌশিক, রাহমান আর মরিস। মেয়েগুলো অল্প বয়সেই কি অদ্ভুত যৌবন পেয়েছিলো। শেষে এমনি আশ্চর্য ওর নিজের বিয়ে হয়ে যাওয়া এই নির্জন বাস। মানুষের জীবনে কতো কিছু যে ঘটতে পাবে!

বিকেল এসে চলে যায়। দোরের ওপর টুকটুক করে কে যেন সাড়া দিয়ে ডাকে। তারপর সে উঁচুস্বরে ডাকে কামালের নাম ধরে। চাকরটা গিয়ে দরোজা খুলে দিয়ে এসে বলে, সেই সাহেব এসেছেন, বসেছেন ঘরে।

নীহার ওঠেনা। ওর দুচোখ ভরে থাকে সম্মুখের জগতটা। প্রজাপতি-গুলো হলুদ রোদে রঙের চক্র কাটছে উড়ে উড়ে। হাওয়া মরে এলো যেন, সেই বনমর্মর নিঃশব্দ হয়ে আসছে, অলস পাতাঝরা থেমে গেলো। আরেকটু পর পায়ের জুতোয় শব্দ তুলে লোকটা চলে যায়। নীহার বসে বসে সেই শব্দও শোনে।

একদিন নয়। বেশ কয়দিন কায়সার এমনি এসে চলে গেলো। নীহার দেখলো ওকে কিন্তু কথা বললো না। আসলে যে ওর বলবার মতো কথা থাকে না, ও কি বলবে।

অবশেষে কামালই কথাটা তুললো। তুমি কায়সারের সঙ্গে কথা বলোনা শুনলাম।

আশ্চর্য হয়ে মুখ ফিরিয়ে নীহার দেখলো স্বামীর মুখের দিকে। তারপর পাল্টা প্রশ্ন করলো, কে বলেছে তোমাকে? কায়সার!

না, না কায়সার কেন বলবে—রাইসের মা বলছিলো। ও বিদেশে এসেছে, একটু কথাবার্তা বলতে আসে, এখানেও যদি তুমি খামখেয়ালি করো।

নীহার একথার উত্তর দিতে পারতো। কিন্তু কিছুই বললো না। দেখলো ওর স্বামীকে। চার বছর ধরে ওর পরিচিত এই মানুষটা, এর বন্ধুত্ব আর সহানুভূতি এতো বেশি কেন? ও কেন বন্ধুদের কথা এতো বেশি ভাবে। কই

কোন বন্ধু ত' এমন করে ওর খোঁজ রাখে না। এতো যে দয়ালু মানুষ তাতে ক্ষতি হয় কার?

কায়সার খুব দুঃখ পেয়েছে, সত্যি নীরু, চলো ওর ওখানে একদিন বেড়িয়ে আসা যাক। তোমার এসব খামখেয়ালের কোন মানে হয় না। ও এসেই যখন গিয়েছে তখন ও এখানে থাকা পর্যন্ত মেলামেশাটা না রাখলে ভালো দেখায় না। কামাল স্ত্রীকে বোঝাতে চেষ্টা করলো।

নীহার কিছু শুনলো, কিছু শুনলো না। ওর কেমন যেন বিরক্ত লাগলো। বিরক্ত আর ক্লান্ত। কামালের কথাগুলো ওকে ক্লান্ত করে দিয়েছে। উঃ এই দীর্ঘ চারটা বছর ধরে ওকে এমনি আবদার শুনতে হচ্ছে।

কামাল স্ত্রীর মুখের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে ছিলো। এক সময়ে স্ত্রীর দু'-কাঁধের ওপর হাত রাখলো, বুকের কাছে টেনে এনে একটু আদর করলো। ওর বুকের মিষ্টি উত্তাপ নিজের বুকের ওপর অনুভব করতে করতে ও নিজের গত চার বছরের সুখী জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্তের কথা মনে মনে স্মরণ করলো।

কামাল ওকে টেনে নিয়ে এলো আরও ঘনিষ্ঠ করে। অন্যান্য দিনের মতো আজও নীহার হাসলো, দেহমন এলিয়ে দিলো স্বামীর আবেগের কাছে। অনুভব করলো, সেই বিরক্তি আর বিতৃষ্ণা মনের মধ্যে সূক্ষ্ম সুতোর মতো অনুভূতির সঙ্গে জড়িয়ে আসছে। তারপর ওর নিজের ওপর ঘৃণা জমতে লাগলো। একসময় ও উঠে পড়লো বিছানা থেকে। ঘর পেরিয়ে উঠোন, তারপর দীর্ঘ চত্বর শেষে গেট। সম্মুখে দীর্ঘ পথ, দু'পাশে অরণ্য-মহীরুহ।

বাইরে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করলো ওর। শীতের হাওয়া বইছে শাখায় শাখায়। জ্যোৎস্না ওঠেনি তখনো। দূরে কুকুরের ডাক, অসংখ্য পতঙ্গের মৃদু গুঞ্জন, একটানা। নীহার নিজেকে বুঝতে চাইলো এই নির্জন-রাত্রির মাঝখানে। কেন ওর এমনি খারাপ লেগে আসছে, অথচ ও মনে করতো এটাই জীবন। এই-ই জীবনের আনন্দ, পরিপূর্ণ হয়ে বেঁচে থাকার এটাই স্বরূপ। এই চার বছর ধরে ও মনকে এতো করে বোঝাতে চেয়েও পারেনি। চার বছরের প্রতিটি মুহূর্তে ওকে নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে হয়েছে। কি দীর্ঘ আর কি অসহ্য এই চারটা বছর। একটু একটু করে জ্যোৎস্না উঠলো বনপালার ফাঁক দিয়ে। চিকুরি চিকুরি জ্যোৎস্না নক্সা আঁকলো শিশির ভেজা ঘাসের ওপর। ঠাণ্ডা হাওয়া জোরে বইতে শুরু

করলো। মাথার ওপর মিট্‌মিট্‌ করছে তারার আলো। এই রাতের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ওর ভালো লেগে গেলো। কি নিঃশব্দ আকাশটা, কি গম্ভীর আর একাকী। কতোকাল এমনি রয়েছে, আরো যে কতোকাল এমনি রয়ে যাবে। তার নীচে অসংখ্য মানুষ, তাদের হাসিকান্না; সুখ-দুঃখ দিয়ে জীবনকে খণ্ড খণ্ড করে ভাগ করা। কত যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে পৃথিবীকে ভাগ করা হয়েছে। তার স্বামী তাকে ভালো বাসে, তার সুখ-দুঃখ নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই। গত চারটা বছর তার কোন চিন্তা ছিলো না। টাকা পয়সার জন্যে ভাবতে হয়নি। স্বাচ্ছন্দ্য তার অজস্র এসেছে স্বামীর অকৃপণ ভালো-বাসার জন্যে। আর সত্যি, কামাল ত' ওর সঙ্গে কোনদিন খারাপ ব্যবহার করেনি। ওর মনে হলো এই নিঃশব্দ রাতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, কেউ সুখী হতে পারে না পৃথিবীতে। যদি সুখ বলে কিছু থাকে তা হলো স্বাচ্ছন্দ্য, সে সুখী। নীহারের মনে পড়লো তার মতো স্বামী ওর বন্ধুদের কারুরই ভাগ্যে জোটেনি। তার বন্ধুদের কথা একে একে মনে পড়লো ওর। তারপর মনে পড়লো একদিন তার অসুখ করেছিলো আর কামাল ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ফেলেছিলো। রাত বেড়ে চললো আর শীত করলো ওর। একসময় ও ফিরলো! বেশ দূরে এসে পড়েছে। বহুদূর থেকে চিতার গর্জন শোনা যাচ্ছে। নীহার পা চালিয়ে ফিরে এলো। আর গেটের মুখেই দেখা হয়ে গেলো কামালের সঙ্গে। ও কায়েম খাঁ-কে নিয়ে রাইফেল হ্যাজাক নিয়ে বের হয়েছে। স্ত্রীকে দেখে ও আশ্চর্য হলো। জিজ্ঞেস করলো, কোথায় গিয়েছিলে ?

নীহারের সমস্ত মন স্নিগ্ধতায় ভরে উঠলো। কোন কথা না বলে ও স্বামীর হাত ধরে ঘরে ফিরে এলো। ঘরে ফিরে স্বামীর চোখের ওপর অদ্ভুত চোখ রেখে দেখলো। চিনতে চাইলো তার অতি পরিচিত মানুষটাকে। তারপর শুধালো, তুমি ভেবেছিলে চিতাটার মুখে পড়েছি আমি, তাই—না ?

হেসে ফেললো কামাল, খুব ভয় পেয়েছিলাম। যা মেয়ে তুমি, সব পারো। খুব শিক্ষা হয়ে গেলো যাহোক। সামনের সপ্তাহে রহমান শহরে যাচ্ছে তোমাকে রেখে আসবে। তুমি ঢাকায় ফিরে যাও।

স্বামীর কথায় হাসি পেলো নীহারের। ভয় নেই, ভয় নেই, চিতাটা লোক চেনে। আমাকে খেয়ে ফেলতে কষ্ট হবে ওর।

কামাল গম্ভীর হলো, না ঠাট্টা নয়। গত দু'দিনে জানোয়ারটা দু'জন

মানুষ খেয়েছে, বলা যায় না কখন কি হয়। তুমি আর এমন পাগলামী করো না।

সেদিন রাতে ও স্বামীর সঙ্গে ঘুমোতে গেলো। কামালের বুকে মুখ রেখে ও অনেকদিন পর আরামে চোখ বুজলো।

নীহার ভেবেছে তারপর কায়সারের কথা। কায়সার আর আসেনা এদিকে। এলেও দূর থেকে কামালের সঙ্গে কথা বলে চলে যায়। রহমান এলো পরের সপ্তাহে, নীহার শহরে গেলো না।

যাবে না তুমি? কামাল জিজ্ঞেস করলো।

না, কেন যাবো, কোথায় যাবো আমি?

শহরে থাকো গিয়ে, তারপর ঢাকায় চলে যেও।

না, মাথা নাড়লো নীহার।

কেন? কামাল কাছে এসে হাত রাখলো স্ত্রীর কাঁধের ওপর। ওখানে কোন কষ্ট হবেনা তোমার। ছোটমামা কতদিন ধরে যেতে লিখছেন। যাও তুমি। কামাল অনুরোধ করলো।

আমি পারবো না, বললাম তো। নীহার পাশ কাটিয়ে গেলো।

কামাল ক্ষুব্ধ হলো ওর জেদ দেখে। বললো, এসব ছেলেমানুষীর কোন মানে হয় না।

এর মধ্যে মানে হওয়া না হওয়ার কি থাকতে পারে? নীহার বিরক্তিতে মাথা ঝাঁকিয়ে উঠলো। তুমি এখানে থাকতে পারো আর আমি পারবো না?

বেশ আমিও তাহলে চাকরী ছেড়ে চলে যাই, তাহলেই যেন ভালো দেখাবে।

নীহার সে কথার উত্তর দিতে চায়নি আর। কিন্তু কামাল ছাড়লো না। অনুরোধ করলো, লক্ষ্মীটি নীরু, তুমি শহরে গিয়ে থাকো এ-কয়টা দিন।

নীহার বিরক্ত হয়ে ফিরে তাকিয়েছে স্বামীর দিকে, এ তুচ্ছ ব্যাপারটা নিয়ে একি আরম্ভ করলে তুমি। আমার ভালো লাগলো না, গেলাম না। এ নিয়ে এতো কথার দরকার কি?

বেশ। কামাল ক্ষুব্ধ মনে সরে গিয়েছে।

তারপর সারা দুপুর স্বামী-স্ত্রীতে কথা হয়নি আর। দুপুরের রোদ ডানা বিছিয়ে শুয়েছে উঠোনের ওপর। আবার ফুরফুর করে প্রজাপতির ঝাঁক উড়ে এলো, হাওয়া অজস্র পাতা ঝরিয়ে চলে গেলো দক্ষিণের দেশে। নীহার

নিস্পৃহ দৃষ্টিতে মন ফিরিয়ে দেখলো সব।

দুপুরে এমনি সময় হঠাৎ দরজায় সেই পরিচিত টোকা। সেই জুতোর শব্দ।

উৎকর্ণ হয়ে শুনলো নীহার, উঠলো না। বুঝলো যে এসেছে সে আজ আর দোর থেকে ফিরে যাবে না। একবার ভাবলো দোর থেকেই ফিরিয়ে দেয়া দরকার। কিন্তু ওর উঠতেই ইচ্ছে করছে না। অনেকক্ষণ—তারপর। সাড়া নেই। ফুরফুর প্রজাপতিরা হাল্‌কা রঙ ছড়াচ্ছে বিকেলের রোদে, আর একরাশ পাতা ঝরলো নিমগাছ থেকে। এমন সময় ডাক এলো, নীহার শুনে যাও।

নীহার উঠলো। ওর সমস্ত মন বিরক্তি আর ঘৃণায় ভরে উঠলো, কি মনে করেছে সে! তারপর বসবার ঘরের ভেতর এসে শান্তকণ্ঠে বললো, তুমি কি সেদিনের ব্যাপারটা ভুলতে পারছো না। এমন কাপুরুষ তুমি, বন্ধুর স্ত্রীর সর্বনাশ করতে এতোটুকু বাধে নি। আবার এসেছো—লজ্জা হওয়া উচিত ছিলো তোমার।

ওর কথা শুনে, নীহার লক্ষ্য করলো, কায়সারের উজ্জ্বল মুখ কালো হয়ে গেলো। মুখ নিচু করে ছিলো ও। তারপর মুখ তুলে বললো, কামাল বললো, তুমি শহরে যেতে চাইছো না। এরকম জেদের সত্যিকার কোন মানে হয় না ভেবে দেখো।

ওর হাতের রাইফেলটার দিকে চোখ রেখে বললো নীহার, তুমি কেন এলে একথা বলতে। তোমার বন্ধুর সঙ্গেই সেকথা বোঝাপড়া করতাম।

কায়সার চুপ করে রইলো! যাবার সময় বললো, তুমি আশ্চর্য মেয়ে, শুধু আশ্চর্য নয় দুর্বোধ্যও।

আর তুমি? হাসি পেলো নীহারের। তুমি এতো কাপুরুষ যে তোমার সঙ্গে কথা বলতেও আমার ঘৃণা হয়।

বেশ, হেসে উঠলো কায়সার। কথা বলো না। তারপর দরোজার দিকে পা বাড়িয়ে বললো, আজ চিতাটার দিন কি আমার দিন। কামালকে বলে দিও আমি বেরিয়ে গিয়েছি—জানোয়ারটাকে শেষ করে তবে ফিরবো।

ও দীর্ঘ পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলো। তারপর নিঃশব্দ বিকেল, সেই প্রজাপতি ডানা-রোদ, নিমপাতা ঝরানো সিরসির হাওয়া, আর চারদিকে নিঃশব্দ। সেই নিঃশব্দ দুপুরের মাঝখানে ও দাঁড়িয়ে রইলো দোরের কাছে।

সন্ধ্যের আগে কামাল এলো। এসে একেবারে নীহারের হাত ধরলো,

এসো।

কোথায়!

আরে এসোই না?

আনন্দে মানুষটার মুখ ঝলমল করছে। উচ্ছ্বাসে চারটা দেয়াল কাঁপিয়ে দিলো একেবারে। তারপর ঘরের ভেতর এসে নীহারকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো। মুখের ওপর বুকের ওপর অসংখ্য চুম্বনে ভরে দিলো। উচ্ছ্বাস থামলে শান্তকণ্ঠে নীহার জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে? কথা বললো না কামাল। পকেট থেকে কাগজ বের করে দেখালো, ওর ট্রান্সফারের চিঠি এসেছে। বললো, ডিরেক্টারকে ভজিয়ে রেখেছিলাম কাজে লেগে গেল। মৈমন্‌সিং এবার চাকরীস্থল। এক সপ্তাহের মধ্যে জয়েন করতে হবে।

এতো শিগ্রী কেন? বিমূঢ় নীহার জিজ্ঞাসা করলো।

বাঃ সেইতো চাচ্ছিলাম। যতো তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়। এই জংলা জায়গায় কি মানুষ থাকতে পারে। মানুষ আছে নাকি এখানে?

নীহার চুপ করে বসলো। আর কামাল একসঙ্গে অজস্র কথা বলে চললো। কত যে কল্পনা ওর।

এরপর আমরা ঢাকায় বাড়ী করবো, রমনা এলাকায়। রমনায় না পেলে শান্তিনগর অথবা মতিঝিলের দিকে। ছোটখাট বাড়ী হবে, ফুলের বাগান দিয়ে সাজানো। সপ্তাহে একবার করে ঢাকায় যাবো তখন সারাদিন ঘুরে বেড়াবো, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করবো তারপর নিশ্চিন্তে ঘুমোবো। ইলেকট্রিক আলো, পানির ব্যবস্থা, কতো আরামে থাকা যাবে।

ও উঠে পড়লো কথার মাঝেই। তারপর ছুটোছুটি করতে আরম্ভ করলো বাড়ীময়। চাকরটাকে ডাকলো, অফিসের বেয়ারা দুটো এলো। তারপর বাঁধাছাঁদার উদ্যোগ চললো। নীহার প্রথমটা কিছু বললো না। তারপর যখন বিছানাপত্র বাঁধা শুরু হলো তখন ও সহ্য করতে পারলো না। বললো, এখন থাক এসব কাল দেখা যাবে। আজ ওদের যেতে দাও।

চাকরটা আর অফিসের বেয়ারা দুটো হাত জোড় করে দাঁড়িয়েছে। স্যার যাই। রাত হলো।

এখনই যাবি! অবাক হলো যেন কামাল। এখনো কতো কাজ বাকি। এই ত' সবে সন্ধ্যা হলো।

সবে সন্ধ্যা হলো।

ওরা আরেকবার হাত জোড় করলো, জানোয়ারটা ক্ষেপে আছে স্যার ম্যানেজার সাহেবের গুলি খেয়ে। দূরের রাস্তা।

কামাল বিরক্ত হয়ে উঠলো। বললো, বাজে বকোনা। জানোয়ারটা আর লোক পেলো না, বেছে বেছে তোমাদের পথ আগলে বসে থাকবে।

ওরা তবু কাকুতি মিনতি করতে ছাড়লো না।

নীহার এসে বললো, যাও তোমরা বাড়ী যাও। কাল সকালে এসো।

ওরা চলে গেলো। আর চলে যেতেই কামাল স্ত্রীর মুখোমুখি তাকালো, ওদের চলে যেতে দিলে কেন! এ ব্যাপারটাও তুমি সিরিয়াসলি দেখছো না। এখানে আর এক মুহূর্তও নয়, কাল ভোরেই বেরিয়ে পড়বো।

নীহার আর কথা বললো না, কামাল বাবার চাকরটাকে নিয়ে বাঁধাছাদা করলো। নীহার জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বাইরে জ্যোৎস্নালোকিত অরণ্যের দিকে তাকিয়ে রইলো। কিন্তু বাইরে ওর মন নেই। মন অনুসরণ করছে ওর স্বামীর প্রতি কাজকে। লোকটা তার নিরাপত্তা সুখ-শান্তি নিয়ে চিন্তা করছে, দীর্ঘ চারটা বছর। বাচ্চাটা যে বছর মারা গেলো, সে বছর থেকে স্ত্রীর জন্যে ওর চিন্তা আরও বেড়েছে, সময়ে অসময়ে কি অসহায় মনে হয় লোকটাকে। কেমন সাধারণ সুখ-দুঃখের অনুভূতি দিয়ে গড়া মনটা ওর। ওকে চেনে নীহার। বুঝতে পারে, এখন ওর বুকের ভেতরে মুক্ত পাখীর আনন্দ, ওর কল্পনায় ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি, যে ধরনের ছবি ও নিজে কয়েকবছর আগে দেখতো। এই যে এত উৎসাহ ওর সব নীহারের জন্যে, নিশ্চিন্ত আশ্রয় আর নিরিবিলি বিশ্রাম আর সুখ মানুষের চিরকালের জন্যে যা প্রয়োজন তার জন্যে ও অমন করে। সত্যি, কতো স্বাভাবিক, নীহার নিজেকে বললো। জানালার বাইরে মুখ ফিরিয়ে ও ঠাণ্ডা আকাশের তারা দেখলো কয়টা। বাইরে অরণ্য মাতাল জ্যোৎস্না, উত্তরের ঝিলে বোধহয় এই জ্যোৎস্নায় নীল গাইর দল নেমে এসেছে পানি খেতে, আর দক্ষিণের আখের ক্ষেতে নেমে গিয়েছে বরার দল, কয়দিন আগে গোটা কয় ফেউ ঘোরাফেরা করেছে, তাদের ডাকও চুপ এখন। এখন অরণ্য শান্ত আর সমাহিত। রহস্যের পুঞ্জীভূত স্তব্ধতা যেন একাকী দাঁড়িয়ে রয়েছে। এবং এই অরণ্য ছেড়ে চলে যেতে হবে কালকেই নীহারকে। কয়েকমাস হয়ে গেলো, কিন্তু চেনা হলো না ওর এই অরণ্যকে। এর একটি ঘাসের পাতায়, একটি দেবদারুর শাখায় কি যে রহস্য রয়েছে, কোন

যে ভয়ের শীতল শিহর কাঁপে বনঝাউ আর মেহগিনির হাওয়ায় শব্দ শুনে ও বুঝতে পারেনি আজো। অরণ্যের এই আকাশ, অরণ্যের এই তরুবীথি ওকে বলছে যেন, তুমি জানো না, তুমি কি চাও। কি তোমার ভালো লাগে, তোমার নিজেরই জানা নেই।

হঠাৎ ডাকলো কামাল, নীহার শুনতে পেলে?

কি?

আবার শব্দটা হ'ল। বহুদূর থেকে একটা শ্বাপদের তীক্ষ্ণ আর্ত চীৎকার আর তারই সঙ্গে রাইফেলের গর্জন, দু-বার।

তারপর আবার চুপ। জ্যোৎস্নালোকিত অরণ্য আবার বিকল হয়ে পড়লো।

কামাল কাছে এসে শুধালো, শুনলে! চিতাটাকে শেষপর্যন্ত মারলো কায়সার।

কেমন যেন কেঁপে উঠলো নীহার। অদ্ভূতভাবে সমস্ত অনুভূতি ঘিরে কয়েকটি বিদ্যুৎ-তরঙ্গের আকস্মিক ধাক্কা লাগলো যেন। চিতাটাকে মারলো কায়সার। কিন্তু কেন মারলো?

হঠাৎ এক অনভ্যস্ত কান্নার আবেগে গলে পড়তে ইচ্ছে হ'ল নীহারের।

কামাল তার আরও কাছে সরে এসে ব'ললো, কি হ'ল, ভয় পেলে নাকি?

নীহার সাড়া দিলো না। তার শুধু মনে হচ্ছে, কায়সার কেন মারলো চিতাটাকে? নীহারের ওপর রাগ করেই নাকি?

স্ত্রীর কাঁধে হাত রেখে কামাল ব'ললো, চলো শোবে।

অদ্ভুত এক বিরক্তি লাগলো নীহারের। স্বামীর হাত দু'খানা সরিয়ে দিলো ধীরে ধীরে। বললো, তুমি শোও। আমি জানালায় দাঁড়িয়ে থাকবো আরো একটু।

স্বাভাবিক স্বরেই কথাগুলো ব'ললো নীহার। কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পেতে দিলো না তার এই মুহূর্তের বিতৃষ্ণা। এইমাত্র সে অনুভব করেছে যে, প্রেম আন্তরিকতা অথবা আনুগত্য যতই থাক, কামালের স্পর্শ পৌরুষের প্রভাবে তাকে কখনও আবিষ্ট করতে পারেনি।

মন মাটি সূর্য

জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী

পশ্চিমে মৌরলির হাওর, পুবে করমচা বিল, লোকে বলে করঞ্জ বিল। বর্ষার ঢলে পুবে পশ্চিমে একাকার হয়ে যায়। মৌরলির হাওর তখন ক্ষুধার্ত পশুর মত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। করমচা বিল যেন গৃহস্থ বাড়ীর মত শান্ত নিরিবিলি। উত্তেজনা নেই, জটিলতা নেই। মৌরলির হাওরের মত খাঁই নেই, হ্যাংলামো নেই।

ফাল্গুনের শেষাশেষি শিমূল গাছের মাথায় যখন আগুন লাগে, প্রতিটি গাছে ধাক্কা খেয়ে বাতাসে কেমন মাতাল মাতাল স্বর জাগে, আর অল্প দামের দোয়াতের কালীর মত আকাশটা যখন না-নীল, না-কালো রঙ নিয়ে হা হা করে, তখনই একদিন সমস্তটা গ্রাম চেয়ে থাকে ওই প্রান্তরের সীমান্তে—বসন্তে শুকিয়ে আসা হাওরেব প্রান্তে।

পাতা-রং ডাঁটা আর হরেক রকমের পুঁতি খোঁজার জন্যে ছেলে-মেয়ের দল দিনের সারাক্ষণই মেডা আর বরুণ গাছের গুঁড়ির কাছে ঘোরে! জল তখন সরে গেছে, থৈ থৈ জলের গভীরতা ভাবাই যায় না তখন। বাতাসটায় তখনই উৎসবের গন্ধ ভেসে বেড়ায়। চৈত্র-গাজনের মহড়া দেবার জন্যে প্রস্তুত হতে থাকে গ্রাম্য-পুরুষেরা। সুশ্রী চেহারার মেয়েলী লাবণ্যের পুরুষ খোঁজা শুরু হয়, গৌরী সাজাবার জন্যে, হর-গৌরীর নাচ হবে বাজবে ঢাক ঢোল 'কাঁশী'। মাস-ব্যাপী এ উৎসব মহড়ার প্রথম দিকেই জমিদার আসেন গ্রামে। সারাটা গ্রাম যেন নতুন জল পাওয়া মাছের মত খেয়াল খুশীতে নেচে বেড়াতে থাকে। বসন্তদিনের উৎসবে জমিদারের আগমন-সংবাদ অনুরক্ত প্রজারা পায় আগেই, তাই নির্দিষ্ট দিনে কয়েকশত চোখের মণি দিগন্তের পানে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ হঠাৎ উজ্জল হয়ে ওঠে।

কিন্তু উৎসব জমে আশ্বিনে—শরৎ কালের মিঠে মিঠে দিনে। দুর্গা পূজার বাদ্য কেঁপে কেঁপে মিলিয়ে যায় হাওরের শ্যাওলা-গন্ধ জলের ওপর দিয়ে। ঢাকে নতুন করে ছানি দেয় ঢাকী কৃষ্ণদাস আর তার ছেলে মহেন্দ্র। নাট-মন্দিরে

নতুন সাজ হয়, পালা-কীর্তন, কবি গানের দিন গুণে গুণে উল্লসিত হয়ে ওঠে আবাল বৃদ্ধ বণিতার প্রাণ।

দিনটা ছিল ভাদ্রমাসের। জলের রং কখন সাদা থেকে ছায়ার গভীরে হারিয়ে গেছে। গঞ্জের ঘাট থেকে কেবল বেপারী-নৌকাগুলি ছাড়া আর সব কেরায়ী নৌকাই ভিন্ গাঁয়ের পথে আরোহী নিয়ে রওনা দিয়েছে। ঘাটের ওপর দাঁড়িয়ে বহু দূরে চেয়েছিলেন জমিদার বাবু পশুপতি রায়। পাশে যথোচিত ব্যবধান রেখে দাঁড়িয়েছিল কয়েকজন কর্মচারী।

মেয়ে মমতাকে আগেই পাঠিয়ে দিচ্ছেন বাড়ীতে। তিনি পরে আসছেন। জরুরী মামলা সেরে দু'চারদিনের ভেতরই রওনা দেবেন। পূজোর আর বেশী দেরী নেই।

নৌকাটা আস্তে আস্তে যাচ্ছে সরে।

মহেন্দ্রকে বিশ্বাস করা চলে। শক্ত সুঠাম দেহ, বাবার নতুন সংস্করণ। বহুরূপী হাওরের যে কোন পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার ক্ষমতা মহেন্দ্রের আছে। অন্ততঃ, ওর দেহে স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য দেখে বিশ্বাস করেই যেন মনটা শান্তি পায়।

নৌকার পাল ভরা বাতাস পেয়েছে। হালে এসে বসে মহেন্দ্র। কল কল গানের সাথে তাল মিলিয়ে নাচের ছন্দে এগিয়ে যায় নৌকা।

উক্কাডা বাও করচে নাহি ল্যাংড়া।

হালে বসে মহেন্দ্র কথা বলে।

পা দুটো পাটাতনের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে গলুইয়ে বসেছিল ল্যাংডা, বছর দশেকের ছেলেটি। পা ভাঁজ করে উঠে দাঁড়ালো।

ছইয়ের ওপর দিয়ে দৃষ্টি ফেলে জিজ্ঞেস করলো, হেই বেলা তামুক ধরাইরা টিক্কাডি কই থুইছিলা।

তর এইহান দিয়া ছইয়ের কুনাত চুঙ্গিডার ভিতরে।

তামাক সাজতে বসে ল্যাংড়া। ছইয়ের ভেতর থেকেই মুখ বাড়িয়ে মমতা হাওরের ধূ ধূ বিস্তার দেখে। সঙ্গিনী হিসাবে 'হধি' সম্প্রদায়ের একটি বৃদ্ধা ছিল, আঁচল বিঝিয়ে ঘুম দিয়েছে কষে।

মহেন্দ্রের সন্ধানী দৃষ্টি ঘুরে ফেরে ছদ্মবেশী আকাশের নিষ্ঠুর প্রান্তে। আকাশের একদিকে নীলে কালোয় মিশে যাচ্ছে। আবার সাদা! বিষ্টি হচ্ছে

কোথাও। এখানে, এই মৌরলির হাওরের ওপরের আকাশে নীলের মেলা, ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরের রাজত্ব। গাঙচিল উড়ছে কয়েকটা। শুয়োরের মত কালো কালো পিঠ ভাসিয়ে জলের নীচে ডুবে যাচ্ছে শুশুকের দল।

নিশ্চিন্ত হোল মহেন্দ্র। ঘাট থেকে নৌকা ছাড়বার আগেই অবিশ্যি বোঝা গিয়েছিল আজকের হাওরের বুকে বৃষ্টির একটি ফোঁটাও পড়বে না। একটু ছায়া, একটু রোদ্দুর, এই যা ভাবান্তর।

নিঃশব্দে কয়েকটা টান দিয়ে কিছু ধোঁয়া হাওরের ওপর উড়িয়ে দিল ল্যাংড়া। ছইয়ের কিনার দিয়ে কতখানি গিয়ে হুকোটা বাড়িয়ে দিল মহেন্দ্রের দিকে।

ছায়া নামছে দিগন্ত-বিসারী হাওরের ওপর। পশ্চিম আকাশের মেঘের স্তূপে কালো রেখা ঘেরা লাল রঙের নিবিড় ছোঁয়া।

হুকোর ছিদ্রটা মুখে লাগিয়েই চাইলো সামনের দিকে মহেন্দ্র। বৌ নিয়ে সদানন্দ ফিরে যাচ্ছে।

জোরে ডাক দেয় সদানন্দ, কিগো হালা, সময়ডা যে খারাপ, কই থাইক্যা আইল্যা?

মহেন্দ্র গ্রাম্য সুবাদে শালা। হাসি মস্করা নির্বিবাদে চলে।

সময়ডা যে খারাপ হেইডা ত তুমবারে দেইখ্যাই বুঝি। দুরাত যাওন লাগে কেরে? তারপরে, কদ্দুর আওগাইল্যা?

হাসি মুখে সদানন্দ প্রশ্ন করে, কুনদিকে?

কুনদিকে? হেইডাও বুঝ না সোনার চান নীলমণি?

অকস্মাৎ হো-হো করে হেসে ওঠে সদানন্দ, হালা দেহি জবর হারামি!

কথার মোড় কোন্ দিকে আগেই বুঝতে পেরেছিল নিশা। মুখটা ওর নিদারুণ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো। সদানন্দ আর মহেন্দ্রের যতবারই দেখা হয়েছে, ততবারই মহেন্দ্র নিশাকে উদ্দেশ্য করে মস্করার বাণ ছুঁড়েছে। আর কি আশ্চর্য, প্রতিবারই নিরুপায় নিশা এগুলি নিজের কানে শুনেছে। ছোট বেলায় একসাথে খেলাধুলা, চালতা-আমড়া-জাম খাওয়া আর পুঁতি কুড়োবার জন্যেই কি এতসব কথার অবতারণা!

মহেন্দ্রের নৌকা আরও এগিয়ে যায়। উচ্চকণ্ঠে ও বলে, তাইলে শেষ তক্ লইয়াই গেলা?

হঃ।

ফিরতাছ কবে ?

ঠিক নাই। ভগমান না করেন যুদি অসুক-বিসুক হয়, তাইলে ত আওন লাগবই।

ঠিহই। অসুক বিসুক অওনের কতাও ত রইল একটা।

আরেক পশলা হাসি বয়ে যায় হাওরের ওপর দিয়ে।

আশ্চর্য বিস্ময়ে মমতা ওদের সহজ সরল কথাবার্তা শুনছিল। কৃত্রিমতা ওদের কাছ থেকে বহুদূরে পালিয়ে বেঁচেছে। ওদের তকতকে হৃদয়ের সমস্ত কথাই যেন এককে খণ্ড সরলতা। শুনতে ভাল লাগে, বুঝতে ভাল লাগে আর সবচেয়ে বড় কথা এই, কথার উত্তরে কথা বলতেও কেমন যেন আনন্দ লাগে।

আরও তিন চার যাত্রা মহেন্দ্র ওদের নিয়ে গেছে। কিন্তু আজ যে মমতার কি হোল, প্রাণটা ক্ষণে ক্ষণেই বর্ষা-আকাশের মেঘের মত গুড গুড করে উঠছিল। ষোল সতেরো যৌবনের চোখ দুটি মহেন্দ্রর তেল জল ধোয়া স্বাস্থ্য শ্রী দেখে খুশী হয়ে উঠেছিল। মহেন্দ্র যেন এই মৌরলির হাওরের মানস-পুত্র। পরিপূর্ণতার জোয়ারে ধ্বক ধ্বক করছে ওর সব অবয়ব। হাওরের তুফান নাকি ভয়ংকর, বড় বড় নৌকাকে খেলনার মত ভেঙে দুমড়ে নাকি জলের নীচে পাঠিয়ে দেয়। আজ তুফান হলে বোঝা যেত মহেন্দ্রের ঘুমন্ত শক্তির পূর্ণ জাগরণের অপূর্বতা।

শিঙ্গারা খাইবা নাহি দিদিমণি।

মহেন্দ্র কথা বললো, মমতাকে লক্ষ্য করে।

পেয়েছ ? দাওনা তুলে।

ছেলে মানুষের মত বলে মমতা।

পাইছি না, আরেকটু রাহ, করঙ্গ বিল আইলো আইলো। যাওনের সময় বহুত দেইখ্যা গেছি।

মনটা আবার তৃপ্তিতে ভরে যায় মমতার। প্রাণহীন শহরের বিষাক্ত পরিবেশে মানুষ পল্লীর উদাররূপ আর অযত্ন-বর্ধিত সুস্বাদু জিনিষের সহজ-লভ্যতা দেখে বিমুগ্ধ হবেই হবে। এত সমস্ত মুখরোচক বস্তু যা শহরে পয়সা দিয়েও পাওয়া যায় না, এখানে আছে যেখানে সেখানে। হাত বাড়ালেই পেতে পার, যত তোমার খুশী।

ছায়া সরিয়ে সূর্য দিয়েছে উঁকি। আকাশের ঢালুতে সীমান্তের কাছাকাছি

সূর্য ; আলো ক্লান্ত, বিমর্ষ বুঝি বা। একটু একটু বাতাস ছেড়েছে, জলো গন্ধ, সোঁদা সোঁদা। অপরাহ্ন বেলায় ক্লান্ত আলোর নীচে সারাটা হাওরে বিমর্ষতার তুফান।

একটা হিজল গাছ দেখিয়ে মহেন্দ্র বলে, তুমার যুগেশের কতা মনে আছে না দিদিমণি ? সাত আটদিন আগে কের লাইগ্যা জানি ডিঙ্গি লইয়া আইছিল এইহান। তুফানে ধইরা খুব আছড়াইছে। হের পরে সাতার পিট্যা উঠছে গিয়া হেই ইজল গাছঅ। আঃ বিষ-পিপড়ায় কামড়াইয়া বেকটা শরীল চাক্কা চাক্কা কইরা ফালছে। আমরা আইয়া পরে লইয়া গেলাম। অহনও বিছানাত্।

ভাগ্যিস্ সাপ-টাপ ছিল না !

আমরাও হেইডাই কইলাম। নারু কাহার বাড়ীর হম্‌খের (সামনের) বরুন গাছটা ধুরা (ঢোড়া) হাপে হাপে অইলদা অইয়া গেছিল। বর্শী ফালাইলে বাইন মাছের বদলে উইঠ্যা আয়ে লাম্বা লাম্বা হাপ।

এবার সাপ খুব বেশী নাকি ?

অইত না ? সংক্রান্তির দিন মেঘে যে মুডেই ডাকছে না। জানা কতাই হাপ এইবার ঠ্যাঙে ঠ্যাঙে ঘুরব।

দূর আকাশে দিনান্তের ক্লান্তি নিবিড় হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। মমতার স্বাপ্নিক চোখের পল্লব প্রচ্ছায় একটা নীল অনুভূতি যেন থর থর করে কেঁপে ওঠে। মুখের এদিক ওদিক ছড়িয়ে যায় কিছু রং, সূর্যাস্তের রং।

সুপুরী আর বাঁশবনের হাতছানির নীচে গ্রামটা দেখা যাচ্ছে লেপামোছা একটা শ্লেটের মত। সামনেই করমচা বিল।

মহেন্দ্র আর ল্যাংড়া হাত বাড়িয়ে তুলে আনলো শ্যাওলা রং শিঙ্গারা, যার ভিতরে দুধের মত সাদা সুস্বাদু বস্তুটি। ল্যাংড়া বেছে বেছে দিল মতাকে।

রোদ মরে গেছে অনেকক্ষণ। সন্ধ্যার বিধুর ছায়া শয়ন বিছিয়েছে মৌরলির বুকে, গ্রাম-সীমান্তে। পালটা খুলে গুটিয়ে নিলো মহেন্দ্র।

আরও কিছুক্ষণ পর ছইয়ের একধারে শুইয়ে রাখা বড় লগিটা টেনে নিল। পেট-মোটা 'বোড়া' সাপের মত হেলতে দুলতে নৌকা এগোয়। দূরে গৃহস্থ বাড়ীর গায় নক্ষত্রের মত বাতি জ্বলছে।

কল্ কল্—ছলাৎ ছলাৎ। অপূর্ব এক ছন্দ, প্রথম রাতের মায়াময় আঁধার। হাওর-ছোঁয়া পুবালী বাতাসের শির শির স্পর্শ, গ্রাম-ঘরের নক্ষত্রের স্নিগ্ধ

চাউনি, শক্ত সমর্থ পুরুষের বলিষ্ঠ টানে টানে নৌকার তর তর গতির দোলা দুলুনি মনটাকে অদ্ভুত এক সুখানুভূতিতে ভরে দেয় মমতার।

অবশেষে বাড়ীর ঘাটে নৌকা বাঁধলো মহেন্দ্র। বুভুক্ষু মনকে টেনে, বাঁ হাতে শাড়ীটা আলগোছে একটু তুলে পাড়ে লাফিয়ে পড়লো মমতা। নৌকাটা একটু দুলে উঠলো।

কাকীমা, পিসিমা, মেজো খুড়ি দাঁড়িয়েছিলেন পাড়ে। ওঁদের চক্রে বাঁধা পড়ে মমতা বাড়ীর দিকে হাটলো। ঘাড় বাঁকিয়ে সে যখন পেছন দিকে চাইলো, অন্ধকার পটভূমিকায় মাটিতে পোঁতা লগি আর বড় ঢোলের মত নৌকা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

অন্ধকাব গ্রাস করেছে বাঁশবাগানের কিনারে ওই পথটাকে।

বিন্দু বিন্দু অন্ধকার দিয়ে গড়া ওই পথ কোন্ এক শিশুর খেয়ালের নীচে মুখ লুকিয়ে পড়ে আছে। ঠাহর করে পথ চলতে মহেন্দ্রের অবশ্য চোখ দুটি কিছুমাত্র ভুল করে না। প্রথম বাতের প্রসন্ন বাতাসে সঞ্চারিত হচ্ছে বন কুসুমেব গন্ধ। চিড়িফ-চিড়িফ-চি্ফ—পাখা সাপটিয়ে কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলো একটা অশান্ত পাখির বাচ্চা।

ভাটি দেশের বাড়ীগুলিব এই একটা বৈশিষ্ট্য যে এক উঠানে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি চালনা করলে কয়েক বাড়ীর উঠান চোখে পড়ে।

গায়ে গেঞ্জি, পরনে কার্ত্তিক ঠাকুবের মত দুই কোঁচা দিয়ে মোটা ধুতি, বাঁ হাঁটুর বিঘৎ খানেক নীচে গিয়েই থমকে গেছে, মাথায় গামছাটা পাগড়ির মত পেঁচিয়ে দেওয়া, মহেন্দ্র বাড়ীর উঠানে এসে দাঁড়ালো।

বিরজা ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছিল। মুখে বসেছিল সুনীতি, চারুর মা। গোবর দিয়ে সুচারু ভাবে লেপা ঢাকিটাকে উপুড় করে তার ওপর দপ দপ শিখা বাতিটা বসিয়ে দেয়া, তারই কিনারে অসহ্য যৌবনের জ্বালায়-ছটফট চারু বাইরের অন্ধকাবের দিকে চেয়ে বসেছিল।

কত্তাবাবু আইছুন নাহিরে!

মহেন্দ্রকে দেখে বিরজা প্রশ্ন করে।

নাঃ, তাইন পরে আইবাইন। মম দিদিমণিরে পাডাইয়া দিছুইন।

অ। ই কর, এই চারুরার বাড়ীত যা। খাইয়া আয় গা।

কের লাইগ্যা গো মা!

বিস্ময়ে চোখ বড় করে মুচকি মুচকি হাসে মহেন্দ্র। হেরার বাড়ীত

বেকেরই আইজ নিমন্তন ; তর লাইগ্যা আলগ কইরা রাইখ্যা দিছে সব। যা যা দিরম্ কসিছ না!

আত মুখটা ত ধওন লাগব!

হারাদিনে ছানটান করছ না?

ছান করছি না? কও কীত্তা! আওরঅ তিনবার ডুবাইছি।

চারু উঠে দাঁড়িয়েছিল। অন্ধকার এতক্ষণ দেহের কোন কোন স্থানে ঘাপটি মেরে বসেছিল, চারুর ওঠে দাঁড়ানোয় আলোর প্রপাতে স্নান করে নিল সমস্তটা দেহ। ঈষৎ নড়াচড়ায় তৈল খাওয়া পুকুরের জলের কম্পনের মত ওর উদ্‌ভ্রান্ত উৎকণ্ঠিত যৌবনটুক্ কেঁপে উঠে আস্তে আস্তে লুকিয়ে পড়লো।

দাওয়া থেকে নেমে উঠানে পা রেখেছে চারু। বিরজা বললো, চারু, আগুনের সময় 'গাইল' 'ছেহাইট'টা লইয়া আয়িছ্।

আইচ্ছা। ছুডুডা না বডডা?

বডডা।

মহেন্দ্র যখন চারুদের বাড়ীতে এলো তখন মাথায় তার গামছাটা জড়ানো নেই, লম্বা লম্বা এক মাথা চুল পাট করে আঁচড়ানো। মাথার বাম পাশে জেগে উঠেছে সুন্দর একটি সিঁথি।

এট্টু বওন লাগব মহেন দা: কাছে এসে চারু বলে।

কের লাইগ্যা?

গরম গরম দুইডা বড়া ভাইজ্যা দেই।

বড়া মানে স্থল-পদ্মের বড়া। পিটালির সঙ্গে স্থল-পদ্ম মিলিয়ে যে বড়া ভাজা হয়, তা খেতে যেমন অপূর্ব তেমনি মুখরোচক। মহেন্দ্রের কাছে এক অতি লোভনীয় বস্তু। ইচ্ছে করলে এক স্থল-পদ্ম বড়া দিয়েই সব ভাত তুলে ফেলতে পারে সে।

একটুক্ষণ কেন, বেশ কিছুক্ষণ ওই বড়ার জন্যে সে অপেক্ষা করতে পারে, তাও চারুর হাতে ভাজা বড়া, আর চারুদের বাড়ীতে বসে।

চলে যাচ্ছিল চারু। মহেন্দ্র ডাকলো, হুন, বড়াডি লাল টক টক অইলে পরে লামাইবা, মুড়মুড়া ভাজা না অইলে কিন্তুক খাইতাম না।

আইচ্ছ্যা আইচ্ছ্যা।

দেহে অনেকগুলি ঢেউ ফেলে ঝির ঝির হাসিতে মুখটা ভরে দিল চারু।

চারুর যৌবনটা যেন কলসীর জল, একটু দোলা লাগলেই ছলাৎ ছলাৎ

করে ওঠে, অথবা মৌরলির হাওরের গহীনতা, বাতাস দিলেই অনেক ঢেউয়ের জন্ম হয়।

মহেন্দ্র যখন খেতে বসলো, রাত আরও ঘন হয়ে বসেছে। উঠান থেকে দেখা যায় ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছে বিরজা, শব্দ হচ্ছে ঠুপ্ ঠুপ্।

ভাতের থালা মহেন্দ্রের সামনে রেখে সরে দাঁড়াতেই অভিজ্ঞ ব্যক্তির মত মহেন্দ্র বলে, একটা কতা কই, ভাত দেউনের সময় তুমার চুল যুদি আমার চুলে না-ই লাগলো তাইলে আর তুমি কেরে, যতীনের মারে ডাইক্যা আনলেই অয়।

যতীনের মার একটি চোখ কানা, সারা দেহে খোস পাঁচড়া, দাদ আছেই, অর্ধেকটা মাথা টাক পড়া।

হেসে ফেললে চারু, তাইলে কি করন লাগব ?

বিয়া দিলেত চাইর ছেড়ার মা অইব, কি করন লাগব হেইডাও কইয়া দেওনা লাগব।

লজ্জা-জড়িত একটা কথা ছুঁড়ে দৌড়ে পালালো চারু।

এলো কিছুক্ষণ পরই। মনে মনে হাসলো মহেন্দ্র, প্রতিবারই চারু এভাবে মাছ তরকারী পরিবেশন করলো, যেন ওর মাথায় মহেন্দ্রের মাথায় ঠোকাঠুকি লেগে যায়।

খাওয়া দাওয়া সেরে মহেন্দ্র হাত মুখ ধুয়ে ঘরে এলো।

চারু বললো, যাইও না তুমি। 'গাইল'ডা লইয়া আমার লগে যাওন লাগব।

আমি পারতাম না।

ইঃ, লাজ করে না, আবার কয় !

সারাটা গ্রামই আসন্ন উৎসবের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে। ধান-ভানা আর চিড়ে কোটার শেষ নাই। ভিন্ দেশে যে মানুষটা নৌকা নিয়ে দিয়েছিল পাড়ি, সে-ও গ্রামে এসেছে ফিরে। ব্যথাতুরা কোন্ বধূ লাজ-নম্র মুখের ওপর টেনে দিয়েছে কুয়াশার সূক্ষ্ম আবরণ, ডাগর ডাগর চোখের কোল থেকে বিরহের যে অশ্রু ঝরে পড়েছিল, তা-ই যেন শরৎ কালের ঘাসের মাথায় শিশির হয়ে জলছে।

ছাপাছাপি যৌবনের দৌরাত্মে কাতর বধূ আশ্বিনের আকাশের দিকে চেয়ে হাত জোড় করে, মাগো, বছর বছর মানুষটা যেন এমনি করেই ঘরে আসে ফিরে।

গ্রামের মরদদের জিরান নেই মোটে। জমিদার বাড়ীর পূজো। সেকি সোজা ব্যাপার। এই চারদিন ঘরের উনানে আগুন দেয়া মানে নিজের মুখে আগুন দেয়া। জমিদার বাড়ীতে যত পার খাও, যত ইচ্ছা স্ফূর্তি কর।

চারুকে চার জোড়া ক্যামিকেলের চুড়ি দিয়েছিলো মহেন্দ্র। হেসে হেসে চারু বলেছিল এই চুড়িডি পইরা দুগ্গা-মারে দেখতাম আর তুমার বাজনা হুনতাম।

মহেন্দ্রকে একটা ধুতি দিয়েছিল চারু। হেসে হেসে মহেন্দ্র বলেছিল এই কাপড়ডা পইরা দুগ্গামার হমুখে বাজাইয়ম আর তুমারে দেখবাম।

জমিদার বাবু এলেন পূজোর দু'দিন আগে। আনন্দের ভাবনায় প্রতিটি ঘরের প্রতিটি লোক তখন কাঁপছে।

'শুন জয়তুন, সোনার চান মনি।'

পশ্চিম পাড়ার নাছির আলীর সতেজ গলা। জারী গানের প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা।

ঢন্-ঢন্-ঢনন্-ঢন্। ঘণ্টা, 'কাশী'র শব্দ মৌরলির হাওরের বুকে বেয়ে দৌড়ুতে দৌড়ুতে পৌঁছে যায় অনেক দূর।

দুইটি বাঁশের ওপড় আড়াআড়ি টাঙানো আরেকটি বাঁশে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে আটটা ঘণ্টা। উৎসাহী ছেলেরা বাজানোর আনন্দে মেতে উঠেছে।

পড়তি বেলায় জমিদার বাড়ীর প্রশস্ত উঠানে খেতে বসেছিল ওরা সবাই। উঠানে রোদ্দুরের ছিটেফোঁটা নেই, শুধু ছায়া। ঢক্ ঢক্ করে জল খেয়ে আরও এক গ্লাশ জলের জন্য চোখ তুলে চাইতেই বড় ঘরের দরজার একপাশে দাঁড়ানো মমতাকে দেখে মহেন্দ্র আশ্চর্য হয়ে গেল। এক দৃষ্টে তাকিয়ে ছিল মমতা, পলকহীন চোখ, অনড় মূর্ত্তি। বুকটা কেঁপে উঠলো মহেন্দ্রের। এ ধরনের চাহনি আর দাঁড়াবার ভঙ্গি তার খুব চেনা। ভঙ্গিতে আত্মসমর্পণ, চোখে নিজেকে বিলিয়ে দেবার আকুতি, মমতা এভাবে মহেন্দ্রের দিকে চাইবে কেন? চোখ ফিরিয়ে এদিক ওদিক চাইলো সে। ঘাড় গুঁজে খেয়ে যাচ্ছে সবাই, আবার মুখ তুললো মহেন্দ্র। সেই চোখ, সেই ভঙ্গি।

নিজেকে খুব দুর্বল দুর্বল লাগলো। শুধু নখ দিয়ে কলাপাতাকে খুচিয়ে খুচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগলো।

দেহ দেহ, দিতে এটু দিরম অইছে দেইখ্যা হালার হালা গরম অইয়া গেছে।

পাশ থেকে নগেন বলে।

আমার অইয়া গেছে, তরা খা।

কছ্ কিরে, দই দিছে না যে।

দুর হালা, চুপ যা। হুদাই প্যাট প্যাট করিছ না।

অবাক নগেন মহেন্দ্রের মেজাজ বুঝে চুপ করে যাওয়াই যুক্তি সঙ্গত মনে করলো।

সন্ধ্যা বেলায় ঢাক নিয়ে উন্মাদ হয়ে গেল মহেন্দ্র। মণ্ডপে আরতি হচ্ছে। ভিড় করে দাঁড়িয়েছে গ্রামের মেয়ে পুরুষ। মণ্ডপের কিনারেই ফাঁকা জায়গাটুকুতে জমিদার স্বয়ং, অন্যান্য মহিলারা। রক্ত-লাল শাড়ী পরনে মমতা বাবার পাশে দাঁড়িয়ে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেবীর আরতি আর মহেন্দ্রের ঘাম দর দর পেশল দেহের অপূর্ব শ্রী দেখছিল।

হ্যাজাকের আলোয় আলোয় জায়গাটাকে দিন বলে ভ্রম হয়। নেশা চেপে বসেছিল মহেন্দ্রেরও। ট্যারা ট্যারা, ট্রাক ট্রাক, তাকধুমা ধুম ধুম। সাথে 'ঝাজ' 'কাঁসি', একটা উত্তেজনা যেন লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছিল। ঘামে ঢল ঢল দেহে, চুলগুলো উসকো খুসকো, মালকোঁচা মারা ধুতি হাঁটুর ওপর তোলা, একটা প্রচণ্ড আকুলতার মূর্তি, একটা অদ্ভুত যজ্ঞের নায়ক মহেন্দ্র যেন দেবীকে কথা বলিয়ে ছাড়বে। স্তম্ভিত সবাই। কেউ নেই, কেউ নেই; শুধু ওই সর্বনাশা ঢাক!

মহেন্দ্রের বাদ্য শেষ হোল এক সময়। এতক্ষণ যেন দম বন্ধ ছিল, প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিল সবাই। চমৎকৃত জমিদার বাবু পাঁচ টাকা পকেট থেকে বার করে মহেন্দ্রের হাতে তুলে দিলেন। বাবার পাশে দাঁড়িয়ে মমতার মনে হোল, কি যেন দেয়া হোল না, কি যেন দেয়া উচিত ছিল!

ধুতিটা ভিজে জবজবে, গামছা দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে ওদের কাছে এসে দাঁড়ালো মহেন্দ্র।

কি বাজনটা বাজাইলা! বাপরে বাপ, দত্যিডার লাহান ছুরৎ অইছিল।

হাসতে হাসতে চারু বলে।

কৃষ্ণদাস সস্নেহ দৃষ্টিতে ছেলের দিকে চেয়ে অন্য লোকের সঙ্গে কথা বলতে লাগলো।

অইতোনা! কার দেওয়া কাপরডা পরছি? শরীলডা দিয়া আগুন ছুটতাছিল্!

প্রায়-ফিসফিসিয়ে বললো মহেন্দ্র।

ইঃ, কিতা যে কয়।

মুখে লজ্জা মাখিয়ে মহেন্দ্রের দিকে চাইলো চারু।

পূজার এই চারদিন কেমন একটা আচ্ছন্নতায় ডুবে রইলো মহেন্দ্র। ছল ছুতো করে মহেন্দ্রকে ডেকে আনা, এমন সব কাজের কথা বলা যা মহেন্দ্রকে না বললেও চলে। দুপুরের পংক্তি ভোজনের সময় সেই দরজার পাশে দাঁড়িয়ে এক ধ্যানে চেয়ে থাকা, রাত্রির প্রথম লগ্নে মহেন্দ্রের ঘাম দরদর পেশী বহুল দেহের দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টি ছুঁড়ে মৃদু মৃদু হাসা—মমতার ভাবসাব ভাল লাগেনি মহেন্দ্রের। বারবারই শিউরে উঠেছে দেহের ভেতরটা। কবিগান অথবা পালা কীর্তনে বসেও স্বস্তি পায়নি, ছটফট করে পালিয়ে এসেছে।

প্রতিমা বিসর্জন হয়েছে কাল। নৌকা থেকে লাফিয়ে পড়বার সময় কোথায় কি ভাবে লেগে তর্জনী আর বুড়ো আঙ্গুলের মাঝ থেকে কনুই অবধি প্রায় চিরে গেছে। জমিদার বাবু ডেকে এনেছেন মহেন্দ্রকে, আয়োডিন আর ব্যাণ্ডেজ বার করে দিয়েছেন আর তাঁরই অসাক্ষাতে মহেন্দ্রকে আশ্চর্য, নির্বাক করে দিয়ে মমতা অতি যত্নে বেঁধে দিয়েছে ক্ষতস্থান। তখনই বুঝতে পেরেছে মহেন্দ্র, সর্বনাশ হয়ে গেছে। কিন্তু এযে হয় না, তুমি কোথায় আর আমি কোথায়!

হাত পা ছড়িয়ে দাওয়ায় বসে সেই কথাই চিন্তা করছিল মহেন্দ্র। চারু কখন এসে দাঁড়িয়েছে, খেয়ালই নেই।

—কি গো মশয়, পরাণ-পক্ষীরে কই উড়াইয়া দিছ?

—নাক বুচা ছেড়িডার কাচ্ছত্ম।

—কে রে?

—হের কানডা ছিইড্যা অন্ত!

—হে আবার কি দুষ করলো?

—পেথম বাডছে, হারাদিন টিক্কিডার লাগাল পাওয়া যায় না।

—তে, হেরে ফিরাইয়া আন, ছেড়িডা বাড়ীত নাই।

—তুমার কওন লাগত না। পক্ষী আইয়া আসন লাগাইয়াছে।

—কে রে?

—ছেড়িরে দেইখ্যা। দেহ, তুমারে কই! হারাদিনে একবার আইও, নাইলে পরাণডা আওরের লাহান আথাল পাথাল করে।

—আইয়াম গো আইয়াম। বাড়ীর কামডি তুমি কইরা দিবা আর কি?

নিজেও ত যাওন যায়। থাউক, আমরার পীরিতঅ থাক্ নাই। দিদিমণি কত্তাবাবুরে লইয়া কবে যাইতাছ তুমি ?

— আমি যাই ক্যামনে ? আতই লড়াইতাম পারি না, আর না গেলেই ভালা অয়।

—কে রে ?

—বুজনা হেরার ধরনডাই অন্য রহম। আমরা ছুড়ু ছুডুই আছি, হের লাইগ্যা আমরারে লইয়া যেইডা মন লয়, হেইডাই করব ?

—কিছু অইছে নাহি ?

না, মনের কতা মনের মানুষরে কই !

হেসে ফেললো মহেন্দ্র। চারুও হাসলো। কিন্তু একটা সন্দেহের কাঁটা খচখচ করতে লাগলো ওর বুকে।

হাওরে 'টান' লাগবার আগেই জমিদার বাবু মমতাকে নিয়ে যাবার জন্তে প্রস্তুত হলেন। সঙ্গে যাবে কৃষ্ণদাস, মহেন্দ্র নয়। যাবাব দিন মমতার তৃষিত চোখ দুটি খুঁজে খুঁজে ফিরছিল বলিষ্ঠ দেহধারী পুরুষটাকে, কিন্তু কোথাও ওর ছায়া পর্যন্ত দেখা গেল না। অব্যক্ত বেদনায় নীল হয়ে গেল মুখটা, বুভুক্ষু প্রাণ কেঁপে কেঁপে উঠলো। মহেন্দ্র তখন চারুব সাথে কৌতুক করে জোর করে হেসে হেসে হাওরের বুকে খুঁজছিল অতিচেনা একটি নৌকা।

মৌরলিব হাওরে জলের 'টান' পড়েছে, তাবপর আস্তে আস্তে জল এসেছে শুকিয়ে। এর মাঝে একদিন গলা-চেপা 'চুপড়া', কোঁচ, পলো নিয়ে সমস্তটা গ্রাম টানের মাছ ধরেছে। কুয়াশার বিস্তাব হয়েছে আরও ঘন, বিষ্টির মত শিশির পডে ঘাসগুলিকে একেবারে ভিজিয়ে দেয়, শিমুল পলাশেব মাথায় জ্বলে আগুন, চ্যালা দাঁডকানা মাছেবা পুকুবের কিনারে এসে স্বচ্ছ জলের মাঝে রূপালী আঁশের ঝিলিক তুলে চোখ কবে পিট পিট, এতদিনের উত্তেজনার পর নিঃসাড় হয়ে ঘুমিয়ে থাকে দূরের করমচা বিল।

মাঠে মাঠে পুরুষদের ব্যস্ততা, ঘরে ঘবে বধূদের "গুড়ি" কুটবার ক্লান্তিহীন পরিশ্রম। পৌষ পার্ব্বণ, পিঠে পুলির পার্ব্বণ, হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভর পেট পিঠে খাওয়ার সম্ভাবনায় দু'দিন আগের থেকেই থৈ থৈ করে নাচে।

সংক্রান্তির আগের দিন গ্রাম আবার অবাক বিস্ময়ে দেখলো করমচা বিলের পাশ দিয়ে জমিদার বাড়ীর সুদৃশ্য পালকি আসছে। কে এসেছে, কে

এসেছে, না, জমিদার-নন্দিনী মমতা। জমিদার বাবুও আসছেন।

এ সময়ে ওদের আগমনে প্রথমটায় অবাক হোল সবাই, তারপরই হাসি খুশীর বন্যায় ভেসে গেল ভাবটা। খাওয়া হবে, কড়া খাওয়া হবে। মহেন্দ্র বুঝতে পারলো, জমিদার বাবুর এই অসময়ে আসার পেছনে মমতার হাত রয়েছে।

খড়ের আঁটি, শুকনো ডাল জোগাড় করে রেখেছে সব। খড়ো ঘরও তোলা হয়েছে একটা। খুব ভোরেই উঠতে হবে কালকে, মাকড়সার জালের মত কুয়াশায় ঢাকা জলের ওপর দমবন্ধ করে লাফিয়ে পড়তে হবে, না হলে শীতে জমে যাবে হাত পা। তারপর গোল হয়ে বসে হাত পা সেঁকতে হবে।

শেষ রাতেই জেগে গেল সমস্তটা গ্রাম। হুলস্থুল ব্যাপার। যারা ঘুম থেকে জাগেনি অথবা জেগে শীতের ভয়ে ঘুমের ভান করে পড়ে আছে তাদের ক্ষেপিয়ে তুলবার জন্যে অদ্ভুত গান রচনা করেছে ওরা। মহেন্দ্রের গলা উঠছে সবার ওপরে।

পুইল্যা খ্যাতা জড়াইয়া
পাছাত রইদ লাগাইয়া
হুইত্যা থাহে চুরা।
দুয়ো দোঃ।
জারের জ্বালায় বাঁচিনা
বেকের লগে নাচিনা
(এমা) খাই' খাইগণ পুড়া।
দুয়ো দোঃ।

এ বাড়ী ও বাড়া সে বাড়ী। খেতে খেতে পেট আর পেট থাকে না, ঢাক হয়ে যায়। পিঠের নেশায় ঘুম ঘুম লাগে। তবু যেতে হয় প্রায় সব বাড়ীতেই। পেটে জায়গা না থাকলেও আন্তরিকতার দাম দিতে গিয়ে একটু কিছু মুখে দিতেই হয়।

দুপুরে টানা ঘুম দিল মহেন্দ্র। যখন উঠলো, সূর্য আর আকাশে নেই, একটা নিবিড় ছায়া ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে। আষাঢ়ের মেঘের মত পেটটা থম্ ধরে আছে।

সেই 'হষি' বৃদ্ধাটি ডেকে নিয়ে গেল মহেন্দ্রকে। মমতা ডাকছে।

কোন বাড়ী থেকে গল্পগুজব করে চারু আসছিল, একা একা।

মহেন্দ্রকে দেখে বললো, কই যাও গো মহেনদা ?

বন্যার জলে ভাসতে ভাসতে আশ্রয় করবার মত শক্ত কি যেন পেয়েছে মহেন্দ্র। ব্যাকুল কণ্ঠে বললো, তুমি এট্টু খাড়াইয়া থাহ চারু আমি আইতাছি অহনই।

এ রকম কণ্ঠস্বরের সঙ্গে চারুর এই প্রথম পরিচয়। দাঁড়িয়েই রইলো সে।

থালা ভবা পিঠে পুলি, মহেন্দ্রকে বসিয়ে নিজের হাতে এগিয়ে দিলো মমতা। মহেন্দ্রের বুকের ভেতর ঢাক বাজছে, হাত দুটি অবশ, পা কাঁপছে।

নাও খাও।

একধাবে একটু সরে গিয়ে মহেন্দ্রেব শক্ত হাতটা টেনে মমতা আবার বললো, খাও।

চোখ তুলে চাইলো মহেন্দ্র। মমতার স্বাপ্নিক চোখের মায়ায় সেই আত্মসমর্পণেব গভীব আকুতি। ওব-ও হাত কাঁপছে।

নিবিড় অনুভূতিতে বুঝি বুঁজে এসেছিল চোখ, উবু হয়ে মমতার পায়ের ধুলি নিয়ে নিঃশব্দে বেবিযে এলো মহেন্দ্র।

স্তম্ভিত মমতাব হাতেব থালাটা থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল সব পিঠাপুলি। মহেন্দ্র নয়, একটা নির্মম সত্য যেন মমতার আশ্চর্য চোখের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে।

বেদনায় নয়, প্রত্যাখ্যানের জ্বালায় নয়, ঘৃণায় বিকৃত হয়ে গেল মমতার মুখ।

অন্তহীন

সাইফুল ইসলাম

ঘোলাটে চোখ। কুঁচো দাড়ি। ফোকলা দাঁত। কুচ্‌কানো সিনা। শীর্ণ হাত পা। বাঁকা কোমর। লোকটা ঘুমুচ্ছে। ঘুমোক। ফোকলা দাঁতের ফাক দিয়ে ফুসফুস করে নিঃশ্বাস বেরুচ্ছে। কেমন হাসি পায় জরিনার। দীর্ণ শীর্ণ বুড়ো কলিমুল্লা তার দ্বিতীয় সোয়ামী।

গোলগাল হাত পা। ভরাট কালো মুখ। মসৃণ। কমনীয়। কাজল কালো চোখ। ভ্রমর কালো চুল। দেহে পূর্ণ যৌবনের জোয়ার। কাঠের কপাট দেয়া আয়নাটা সামনে খুলে ধরে নিজেই কতবার অবাক হয়ে গেছে। বুক আর কোমরের কথা নাইবা ভাবলো। সরম লাগে তার।

অমন উন্নত পুষ্ট বুকখানা দেখে জহির একদিন বলেছিল—

—জরি, বোকখান তর উঁইয়ের ঢিপি।

জরিনার ভালই লেগেছিল। তবু লজ্জার ভান তাকে করতেই হয়েছিল। নতুবা মনে করবে কি অমন জোয়ান মরদটা। বুকের কাপড় সামলাতে সামলাতে কৃত্রিম রোষে সে বলেছিল—

—তোমার লজ্জা সরম নাই গো?

—তুই যে সব কাইড়া নিছস।

—আমি তো কালা। যেন একটু যাচাই করে নিতে চায় জরিনা।

—কালা? কালার উপে জগৎ আলা। যেন কবি হয়ে ওঠে জহির। কালা শরীলেই যে উপ ধইরছস। যুদিল—

—আর তোমার? তোমার পিন্দা খান?

—কি রহম? প্রশ্ন করে জহির।

—ঐ, ঐ যে, ঐ রহম। দূর মাঠে চরা একটা তাগড়া মহিষ দেখিয়ে দেয় জরিনা।

দুজনেই প্রাণ খুলে হেসে ওঠে।

সত্যি, যেমন জরিনা, ঠিক তেমনি জহির।

মিশকালো দেহ। প্রশস্ত লোমশ বুক। দীঘল হাত পা। অপরূপ বলিষ্ঠতা। কুৎকুতে চোখ। দৃঢ় চিবুক। দশাসই জোয়ান।

জহির-জরিনাকে মানিয়েছিল বেশ। জহির ছিল জরিনার প্রথম সোয়ামী।

ভালই ছিল ওরা। সুখেই ছিল। অফুরন্ত যৌবন দুটো নর-নারীর। তাকত ভাঙ্গিয়ে খেলে অভাব কিসের ?

প্রাণ প্রাচুর্য আর একান্ত করে পাওয়ার মত্ততা নিয়ে জহির আসতো জরিনার কাছে। জহিরের চওড়া বুকে পরম নির্ভয়ে নিজেকে সঁপে দিত জরিনা। দুটো সবল সুস্থ মানুষ একাত্ম হয়ে যেত। নিত্যকার অভাব অভিযোগ ছাপিয়ে সুখানুভূতির বন্যা বয়ে যেত ওদের জীবনে।

জরিনা ভাবতো, আর কিছুই দরকার নেই তার জীবনে। শুধু এই বিশাল বুকটায় যদি সে আশ্রয় পায়।

জহির ভাবতো, জরিনার উন্মাদ করা যৌবন অক্ষয় হয়ে থাক।

অনেক রাতে তৃপ্তির ক্লান্তি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তো তারা। এমনি এক সার্থক রাতে কেন যেন জরিনার ঘুম ভেঙ্গে গেল। পাশে ফিরে হাত বাড়াতেই চমকে ওঠে সে। বিছানা খালি। মানুষটা গেল কোথায় ?

কান পেতে শোনে জরিনা। কারা যেন ফিসফিসিয়ে কথাবার্তা বলছে বাইরে। সে উঠে গিয়ে ঈষৎ খোলা কয়াড়ের পাশে দাঁড়ায়। জহিরকে ফিসফিস করে কি যেন বলে দুটো লোক দ্রুত আঁধারে মিলিয়ে গেল। জহির ঘরের দিকে পা বাড়াতেই বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো জরিনা। যেন সে কিছুই দেখেনি। জানে না। বাকী রাতটুকু আর ঘুম এলো না তার। কেমন একটু সন্দেহ। মনটা এলোমেলো। জহিরও চুপচাপ। অতি সন্তর্পণে বিছানায় উঠে এলো। যেন জরিনার ঘুম না ভাঙ্গে। কিছু জানতে না পারে। অভিমান করে সেও কিছু জিজ্ঞেস করলো না জহিরকে।

ঘুম ভাঙ্গা আর এক রাতে জহিরকে বিছানায় না পেয়ে প্রতীক্ষায় বসে রইলো সে। তারপর কুপি জ্বালিয়ে বাইরে বেরিয়ে খোঁজ করলো। কিন্তু কোন পাত্তা মিললোনা জহিরের। ঘরে ফিরে এলো সে। মনে অসংখ্য দুশ্চিন্তার মিছিল। নিদ্রাহীন প্রহরগুলো দীর্ঘতর।

টোরায় ধরে রাখা মোরগটা এক সময় ঘরের কোণা হতে ডেকে উঠলো। ঠিক তার একটু পরেই জহির এসে কয়াড়ে টোকা দিল।

অভিমানী চোখের পানি চাপতে চাপতে কয়াড় খুলে দেয় সে। উসকো

খুসকো চুলে কি একটা পোটলা হাতে ঘরে ঢুকলো জহির।

অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে জরিনা বলে—কোনে গেছিলা ?

উত্তর না করে মৃদু হেসে পুটলিটা জরিনার হাতে দেয় জহির। যেন জরিনার কৈফিয়তের উত্তর ঐ পুটলিটাতেই আছে।

অভিমানের রেশ টেনেই বলে জরিনা—

—মিটাই আইনছো বুঝি ? তা এত রাইতে মিটাই পাইলা কোনে ?

—হুঁ হুঁ, মিটাইরে ; মনের মিটাই। এত ব্যাজার অইচস ক্যান ? খুইলা দেখ, মনডা খুশী অবনে !

পুটলি খুলতে থাকে জরিনা। জহির নিবিড় হয়ে বসে জরিনার কোমর ঘেঁষে। কুপির কাঁপা আলোকে খোলা পুটলিটার ভিতরের বস্তুগুলি চক চক করে ওঠে! চমকে ওঠে জরিনা।

—একি, এগুলা পাইলা কোনে ? এনা সোনার গয়না দেইখতাছি ?

মুচকী হাসে জহির—দেখ্‌লি না তর হাসির নেহাল কেমন চমক দিতাছে।

জরিনার চমক দেয়া হাসি চমকে গেছে। সে ভাবে তার এত দিনের সন্দেহ তাহলে মিথ্যা নয়। যা হলে সে সব চেয়ে বেশী খুশী হোত ; সব কিছু বুঝেও সে প্রশ্ন করে—কওনা এগুলা পাইলা কোনে ?

তর নিগা আনছি। পইরলে বাহার খুইলবো। জরিনার প্রশ্ন এড়িয়ে যাইতে চায় জহির।

ঝাঁঝালো কণ্ঠে জরিনা বলে—

—অত বাহার খোলায়া কা‍ম নাই। পাইলা কোনে তাই কও ?

হাসতে হাসতে জরিনাকে জড়িয়ে ধরে সোহাগ করতে করতে জহির বলে—মাকৃরিডা কানে পরেক না ?

জহিরের আলিঙ্গন থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে সে—শ্যাষ পর্যন্ত চুরি ধইরলা ?

মুখে হাসি টেনে জরিনাকে কৃতার্থ করার ভঙ্গিতে সে বলে—তরই নাইগা তো ?

—চোরাই গয়না আমি চাইনা। কার সর্বনাশ করইছো তুমি, হেই গয়না আমাক পিন্দিবার কও ? বালো চাওতো ও'গুলা ফিরা দিয়া আইসো। শাসনের ভঙ্গিতে বলে সে। তারপর বিছানায় শুয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

তার সোয়ামী চোর। যে সন্দেহ কিছু দিন থেকে করছিল তাই শেষ পর্যন্ত সত্য হলো।

জহির নীরবে কিছুক্ষণ জরিনার কান্না দেখলো তারপর প্রশস্ত বুকে জরিনাকে টেনে বললো—

—কান্দিসনা জরি, আর ও কামে যামু না।

এর চেয়ে বেশী কিছু বলবার প্রয়োজন ছিলনা জহিরের। জরিনা অদ্ভুত এক দৃষ্টি নিয়ে তাকায় জহিরের দিকে। ভাবখানা এই যে, ছিঃ তুমি কেন এত নীচু হবে? তুমি কত ভালো। জহির আরও নিবিড় করে বুকে চেপে ধরে জরিনাকে।

অদ্ভুত এক উষ্ণতা। মাদকতা, এ বুকের আশ্রয়ে। সব অভিমান অভিযোগ জহিরের হৃদয়ের উত্তাপে গলে যায়। মরদ মানুষের বুকে এত সবলতা, এত নিভরশীলতা, এত উদ্দামতা যে আছে জরিনা কি তা জানতো? জহিরের রক্তেব উদ্দামতা যেন ধীরে ধীরে তারও রক্তে সংক্রামিত হচ্ছে। রক্তের কণিকা নেচে ওঠে দুটো উদ্দাম প্রাণের দৃঢ় আলিঙ্গনে।

দুটোই তাব নেশা। জরিনাও নেশা। চুরিও নেশা। জরিনার নেশা যেন দিন দিন কেটে যাচ্ছে। ঘুমন্ত জরিনাকে ফাঁকি দিয়ে রাতের আঁধারে বেরিয়ে পড়ার রোমাণ্টিকতা জহিবকে পেয়ে বসেছে। জহির গুটি গুটি পায় মাচাঙ্গ থেকে নামছে। জরিনা জেগে ওঠে। সে জহিরের পা জড়িয়ে ধরে।

—তোমার পায়েত ধরি, আর চুরি করবার যাইও না।

—আঃ ছাড় ছাড় একি কবতাছস? জরিনাকে উঠাতে চেষ্টা করে জহির।

—আগে কও তুমি অমন সর্বনাশা কাম করইবা না।

—চইলবো কি কইরা?

—তোমার এত সোন্দর শরীল। কামলা খাইটা খালিই চইলা যাইবো।

—হু মাইনসের বাডী চাকর নাগি।

—তুমি না পার ঘরে বইসা থাইকো। আমি মাইনসের বাডীত কাম কইরা তোমার বাত জোটামু।

—কি কলি? আমার বৌ অয়া মাইনসের বাড়ীতে চাকরানী খাটবি। মান ইজ্জুত সব ধুইয়া ফেলাইছস।

—চুরি ডাহাতি করা খুব মান ইজ্জতের কাম, শ্লেষ সূচক উক্তি করে জরিনা।

—চুরি ডাহাতি করা হেম্মতের কাম বুইজছস্। বোকের পাটা নাগে ?

—যহন পুলিসের নাটীর গুতা খাইবা তহন হেম্মত বারাইবো।

জরিনার বাড়াবাড়ি ভাল লাগে না জহিরের। সে রেগেই বলে—

—তোরা মাগী মানুষ। ঘরে থাইকা ভাত আন্দিবি। পোলপান বিয়াবি। তোরা হেম্মতের কি বোঝছ ?

জহিরের এ ধরনের কথা জরিনার আত্মসম্মানে ঘা দেয়। সে আর কিছু বলে না। জহির বেরিয়ে যায়।

পুলিশ যেদিন ধরতে এলো জহির পালালো। সেই থেকে দিনের আলোতে বাড়ী আসতো না সে। রাত গভীর হলে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়তো তখন দরজায় এসে টোকা দিত জহির। প্রথমটা মৃদু। দ্বিতীয়টা আস্তে। তৃতীয়টা জোরে। সাংকেতিক টোকা বোঝে জরিনা। সে কয়াড খুলে দিত। জহির ঘরে ঢুকতো। মাঝে মাঝে জহিরের কথাগুলো জড়িয়ে আসতো। মুখ দিয়ে মিঠে মিঠে গন্ধ ভুব ভুব করতো। কোন কোন রাতে মারধোর করে রক্ত ঝরিয়ে দিত জরিনার দেহ হতে। সব কিছুই জরিনা মুখ বুজে সহ্য করতো। সরকার বাড়ী হতে কাজ করে আনা ভাতের থালা এগিয়ে দিত। হাত না ধুয়েই গোগ্রাসে গিলতে থাকতো জহির। জরিনা তাকিয়ে দেখতো লোকটা কত ক্ষুধার্ত। সারাদিন বনে জঙ্গলে পালিয়ে ফেরে। দিনে নিয়মিত খাবার জোটে না। ভাতের থালাটা সাবাড় করে দেয় জহির, জরিনার খাওয়া হয় না। এমনি হয় প্রায় প্রতি রাতে। জরিনার কোন অনুযোগ নেই। লোকটা যা পারে খাক। না খেলে অমন জোয়ান শরীরটা টিকবে কি করে ? খেয়ে উঠে বিছানায় গা এলিয়ে দেয় জহির। রাত ভোর হবার আগেই আবার চলে যেতে হবে। এই সময়টুকুই জরিনার দুঃখ ভুলবার অবকাশ।

এমনি এক রাতে উঠি উঠি করে উঠতে পারেনি ওরা দু'জন। যখন জহির জাগলো তখন সকাল হয়ে গেছে। সে দেখে জরিনা অকাতরে ঘুমচ্ছে। তাকে ঠ্যালা দিয়ে বলে—

—ও জরি, ওঠ্ ওঠ্। এ আল্লা বেলা উইঠা গ্যাছে ?

জরিনা চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে বসে। ভীত কণ্ঠে জহির বলে—

—এহন কেবা ওবরে জারি ?

জরিনা উঠে গিয়ে কয়াড়টা ঈষৎ খুলে দেখে রাস্তা দিয়ে লোক চলাচল শুরু হয়েছে। সে বলে—লোকজন চলাফেরা কইরতাছে।

—তালি ? তালি কি করমু, ক ?

জরিনার সমবেদনা জাগে, হাসিও পায়। অমন সাহসী মানুষটা ভয়ে কেমন ভেঙে পড়েছে। তার উপর কেমন নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ভাল লাগে তার। মানুষটা তার দায়িত্ব কিছু জরিনার উপর ছেড়ে দিক। সে আগলিয়ে রাখবে তাকে। জরিনা দেখেছে আকাশে চিল উড়তে দেখলে বাচ্চা দেওয়া মুরগী কেমন করে বাচ্চাগুলোকে পাখনা মেলে রক্ষা করে। রাতের আঁধারে দুর্দান্ত মানুষটা দিনের আলোয় কেমন অসহায়। মমতায়, স্নেহে, প্রেমে, মনটা ভরে আসে তার।

—এহন যদি পুলিশ আইসে ? জহিরের কণ্ঠস্বর ভয়ার্ত, অসহায়।

বাচ্চা ছেলের ভীতিবিহ্বলতা দেখে মা মৃদু হেসে বাচ্চাকে কোলে তুলে নেয়। জহিরকে হাত ধরে বিছানা থেকে টেনে নামাতে নামাতে বলে জরিনা—

—ভয় নাই। তুমি আইসো। এমন জাগাত তোমাক রাখমু পুলিশের বাপ খুঁইজা পাইবো না।

চট পেতে হাঁড়ি পাতিল রাখা মাচাংয়ের অন্ধকার কোণায় বিছানা করে জহিরকে শুইয়ে দেয় জরিনা। তারপর মাচাং থেকে কিছু হাড়ি পাতিল পেড়ে তাকে আড়াল করে দেয়াল তৈরী করে। জ্বাল দেবার পাটশোলা, কুড়িয়ে আনা গাছের ডাল আর পাতা দিয়ে পাতিলের দেয়াল ঢেকে দেয় সে।

পুলিশ এলো। সমস্ত বাড়ীটা খুঁজে পেতে জহিরকে পেল না। সেই থেকে অমনি মাঝে মাঝে দিনের বেলায় নিজের ঘরে লুকিয়ে থাকতো সে।

কিন্তু ধরা পড়লো জহির। জরিনার কপাল ভাংলো। তাকে নিতে এলো তার বাপ গহের শেখ। কিন্তু তাকে ফিরে যেতে হলো। জহিরের ভিটে ছেড়ে জরিনা যেতে পারলো না।

একদিন সংবাদ এলো জহির পালিয়েছে। জেলের দেয়াল টপকিয়ে। পুলিশের রাত দিন আনাগোনা বেড়ে গেল গ্রামে। এত সতকর্তা সত্ত্বেও জহির এলো জরিনার ঘরে। চমকে উঠলো জরিনা। জহির যেন আরও ভীষণ হয়ে উঠেছে। কুৎকুতে চোখ দুটো লাল। ভয়াল। কুটিল। মুখে দাড়ি গোঁফ গজিয়েছে এক আঙুল করে। অল্প একটুকরো কাপড় হাঁটুর উপরতক কোন মতে জড়িয়ে আছে।

ক্ষুধার্ত ছিল জহির। দেহের। মনের। পেটের। বোধহয় মানুষের

পেটের ক্ষুধাই সব ক্ষুধাকে চাপা দিয়ে রাখে। জহিরের তাই হয়েছিল। নইলে ঘরে ঢুকেই সে বলবে কেন—

—শালী বাত দে ?

জরিনা জানতোনা যে আজ সে আসবে। তার জন্য ভাত জুগিয়ে রাখবে।

—এত রাইতে বাত কোনে পামু।

একে মাতাল। তাতেও ক্ষুধার্ত। সুতরাং যুক্তি অচল। দাঁত চেপে খেঁকিয়ে ওঠে জহির—

—শালী কোন নাংগেক খাওয়াইছস ?

—দেহ মুক সামলায়া—

কথা শেষ হতে দেয় না জহির। লাফিয়ে পড়ে জরিনার উপর। যেন তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে কুটে খেয়েই ক্ষুধা মিটাবে সে। ভয়ার্ত জরিনা হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে। নিশুতি রাতের সে চিৎকারে সবাই জেগে উঠেছিল। পাহারারত সেপাইরাও। লাথি মেরে গর্জ্জাতে গর্জাতে বলেছিল জহির—

শালীর কোন বাঙ্গ আছে যে আমাক ধরায়া দিবাব নিগা ওবা চিল্লাইতাছস।

সেই মুহূর্তে সত্যি করেই মনে প্রাণে কামনা করছিল জরিনা, হ্যাঁ জহির ধরা পড়ুক। অমন অত্যাচারী মানুষটার শাস্তি হোক।

লোকজনের আসার শব্দ পেয়ে জহির কুড়ের বেড়া দা দিয়ে কেটে পিছনের জঙ্গল দিয়ে ভেগে গেল। যাবার সময় জরিনার পরনের কাপড়খানা টেনে খুলে নিয়ে তাকে উলঙ্গ করে রেখে গেল।

পাড়াপড়শিরা যখন ঘরের দরজায় এসে হাঁকডাক শুরু করেছিল তখন দড়িতে রাখা ছেঁড়া কাপড়খানা কোনমতে জড়িয়ে কয়াড় খুলে দিল সে।

পাহারারত সেপাই একজন প্রশ্ন করলো—

—কিরে মাগী, কি হয়েছে তোর ? অমন চেঁচাচ্ছিলি কেন ?

কোন উত্তর করতে পারেনি জরিনা। দাঁড়িয়ে থেকে কেবল কাঁপছিল। মনের সাথে যুঝতে যুঝতে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল। কি বলবে সে ? কে এসেছিল তার ঘরে ? যদি বলে তার স্বামী এসেছিল তাহলে দলবেঁধে এখনই পিছনে ধাওয়া করবে এরা। যদি কোন কিছু না বলে তাহলে সবার সন্দেহ হবে পরপুরুষ এসেছিল তার ঘরে। অমন করে চেঁচানো তার উচিত হয়নি। কিন্তু কি করবে। সে তো চেঁচাতে চায়নি। না চেঁচালে, পাড়াপড়শি না জাগলে

জহির হয়তো তাকে মেরেই ফেলতো।

কোন উত্তর না পেয়ে সেপাই দু'জন ক্ষেপে যায়—

—কিরে মাগী বলবি, না ডাণ্ডার গুতা খাবি ?

ধা করে উত্তর এসে যায় জরিনার মনে—

—খোয়াব দেখছিলাম। খারাপ খোয়াব।

গায়ের মুন্সী ফয়েজুল্লাহ লোলুপ দৃষ্টি মেলে আরও সবার সঙ্গে জরিনার পুষ্ট দেহটা যেন লেহন করছিল। সে মাতব্বরী চালে বললো—

—বদ খোয়াব তো দেখবোই। যেমন হইছে চোর ছ্যাচোর তেমনি ঘরের মাগীগুলান।

অনেক ঝকাঝকির পর জরিনার মুখ থেকে এর বেশী কিছু বের করতে না পেরে সবাই চলে গেল।

এই ঘটনার পর জহির আর কোন দিন আসেনি। কোন খোঁজ খবরও করেনি। সেই সুযোগে রাতের আঁধারে প্রায়ই টোকা পড়তো জরিনার কুঁড়ের কয়াড়ে। দা খানা পাশে রেখে প্রহর গুণে শিয়াল পেঁচার ডাক শুনে নিদ্রাহীন রাত কাটাত জরিনা।

জরিনার সই ছকিনা। বেড়াতে এসে সেদিন বলেছিল—জরি, খালি ভিটায় পইরা থাইকা কি করবি ?

—ভিটাখালি অইলেও মনডা যে খালি অয়নাই ছকি!

এ্যাদ্দিনেও নোকটাক ভুইলবার পাল্লিনা ?

—ভুলমো কি কইরা তাই ক। মনডা যে আমার নিয়া গ্যাছে। রাইতে একলা যহন শুইয়া থাকি ঘোম আইসে নারে। সব কতা মনে পড়ে। কিছুই যে ভুইলবার পারি না।

ছকিনা তাকিয়ে দেখে জরিনার দুই চোখে পানি টলটল করছে। সমবেদনার সুরে সে বলে—

—আমি তাক ভুইলবার কইতাছি না জরি, কইতাছি কি একলা ভিটায় পইরা থাকার চায়া বাপের বাড়ীতে যায়া যাক।

—তা অয়না ছকি।

—ক্যা ?

—রাইতের আন্দারে যুদিল ফিরা আইসে।

তাতো বটেই যদি কোনদিন লোকটা ফিরে আসে। এসে যদি দেখে

জরিনা নেই। তাহলে? ছকিনা আর কিছু বলতে পারে না।

জরিনা প্রতীক্ষায় থাকবে। এই ভিটেটায়। এই কুঁড়েটাতেই থাকবে সে।

দিন গেলো। মাস গেলো। বছর গেলো তিনটি। জহির আর এলো না। গাঁয়ের লোকের মুখ বন্ধ রাখতে পারেনি গহের শেখ। টিকাটিপ্পনী খেয়ে যেদিন সে কাতরস্বরে মেয়েকে বললো সব কথা, সেদিন বাপের অপমানিত করুণ চেহারা আর নিজের মান সম্ভ্রমের দিকে তাকিয়ে না করতে পারেনি জরিনা। এই তিন বছরে গায়ের মুন্সী ফয়েজুল্লাহ, মাতব্বর তছির প্রধান প্রতিযোগিতা করে তাকে প্রলোভন দেখিয়েছে। ভয় দেখিয়েছে। রাতের আঁধারে দরজায় এসে টোকা দিয়েছে। প্রতিমুহূর্তে সজাগ হয়ে চলতে হচ্ছে তাকে। আর কত দিন? বাপের চোখে পানি। নিজের মনে দ্বন্দ্ব।

বেছে বেছে শেষ পর্যন্ত পবহেজগার ধনী বুড়ো কলিমুল্লার প্রস্তাবে রাজী হলো সে। শুধু লোকের মুখ বন্ধ করতে। ধনী কলিমুল্লার কাঁধে ভর করে বেঁচে থাকতে।

বিয়ে হয়েছে প্রায় একমাস। বিয়ের রাতে বিছানায় এলেই বুড়োটা চেয়েছিল তাকে জড়িয়ে ধরতে। মাংসহীন লিকলিকে হাত জোড়া আর ঘোলাটে চোখের দৃষ্টিতে কেমন ঘৃণা লাগে তার। সে বুড়োটাকে কাছে ঘেঁষতেই দেয়নি। অমন কুঁকড়ে যাওয়া বুড়োটাকে সে দেহ দেবে কেমন করে? কোনদিন স্বপ্নেও যা সে ভাবেনি। কি করে তা সম্ভব? কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। বুড়ো কলিমুল্লাও সাহস করেনি অমন জোয়ান মেয়েটাকে ঘাঁটাতে। অক্ষম দুর্বল পুরুষ শুধু 'লালু' দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে দেখেছে জরিনার পুষ্ট দেহটার দিকে।

গতরাতে জরিনা যখন ঘুমিয়ে পড়েছিল কলিমুল্লা তখন তাকে কাছে টানতে চেষ্টা করতেই তার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। জরিনা সবল হাতে বিরক্তি সহকারে কলিমুল্লাকে ঠেলে দিয়ে বলেছিল—

—দেহতো মর্দার তামসা। তুই কাল যায়া একাল আছে তার সখ কত?

কলিমুল্লা আর দ্বিতীয়বার সাহস করেনি। বুড়ো হতে হতে ভাজা চিংড়ির মত গুটিয়ে গেছে লোকটা। দিব্যি আরামে ঘুমচ্ছে। অথচ তার চোখে ঘুম নেই। ঘুম কেড়ে নিয়ে গেছে সেই তিন বছর আগের পলাতক লোকটা।

দ্বিতীয় সোয়ামীর পাশে শুয়ে প্রথম সোয়ামীর চিন্তা কত মধুর। আনন্দময়।

কোপাচ্ছে না? কে যেন মাটি কোপাচ্ছে তার হাতের বাঁ পাশে। কান সজাগ করে জরিনা। উঠে বসে। আঁধারে চোখ দুটো তীক্ষ্ণ করে দেখে কে যেন সিঁদ কাটছে ঘরের পিরালীতে। কেমন যেন বোকা বনে যায় জরিনা। গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসে। শুধু মন্ত্র-মুগ্ধের মত চেয়ে থেকে সে দেখছে। দেখতে দেখতে সিঁদটা বড় হয়ে গেল। সিঁদের ফাঁক দিয়ে ঈষৎ আলো এসে ঢুকছে নিঃসীম আঁধার ঘরটায়। নির্বাক হয়ে দেখে কাটা সিঁদ দিয়ে একটি মানুষ ঢুকছে ঘরটায়।

আবছা অতি মৃদু আলো এসে পড়েছে লোকটার উপর। জরিনার দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর হয়। চোখের মণিটা আরও ঘনিষ্ঠ আরও ক্ষুদ্রতর হয়ে আসে।

কে? কে ঐ লোকটা? এগিয়ে আসছে মাচংটার দিকে। কেমন মৃদু অথচ দ্রুত পায়ে চলছে? ছিঁড়ে যাওয়া চিন্তার জট তার জোড়া লাগে।

এ পদক্ষেপ, এমনি সাবলীল গতি তার পরিচিত নয়? পিছনে, আরও পিছনে এমনি একটা লোক রাতের আঁধারে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে তার ঘরে এসে ঢুকতো না? অমনি মৃদু অথচ দ্রুত সে পদক্ষেপ। ঘরের আঁধারে চলমান মানুষটার মতই সতর্ক ছিল তারও গতিবিধি। অমনি বলিষ্ঠ দেহ। হ্যাঁ ঠিকই। ভুল হয়নি তার। মানুষটার সব কিছু এখন মুখস্থ আছে তার। প্রতি পা ফেলা। প্রতিটি ভঙ্গি: অতি আপন করে চেনা। ভুল হবার নয় কোন ক্রমেই।

সে এসেছে। সেই যে গিয়েছিল আর আজ এলো। কিন্তু কি লাভ হলো আজ এসে।

মনটা তার অনিবার্য আকর্ষণের মত টানছে ঐ চলমান মানুষটি। ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে মানুষটার বুকে। কিন্তু আরও একটি মানুষ তার পাশেই ঘুমছে স্বামীত্বের দাবী নিয়ে। মুখে গন্ধওয়ালা বুড়ো মানুষটা তার মত উদ্ভিন্ন যৌবনা মেয়ের স্বামী। যার বাহুতে বল নেই। কুঁচকে যাওয়া সিনাতে নেই উত্তাপ। বুকে নেই বলিষ্ঠ ইচ্ছা। হাসি পায় তার। কেমন এক তুলনামূলক রূপ দাঁড় করিয়ে ফেলে সে পাশের মানুষটা আর আঁধারে চলমান মানুষটার সঙ্গে।

সে কি যাবে চলমান মানুষটার কাছে? বলবে ওগো গহনাগাটি, থাল-বাসনের সঙ্গে আমাকেও লুটে নাও।

কিন্তু লোকটা যদি তা না নেয়? যদি তার সাঁড়াশির মত শক্ত সবল হাত

ছুটো দিয়ে গলা টিপে ধরে? ঐ লোকটাই তো তাকে মেরে, রক্ত ঝরিয়ে পরণের কাপড়খানা পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে ভেগে গিয়েছিল। ঐ লোকটার প্রতীক্ষায় তিন তিনটি বছর সে নির্যাতন, অপবাদ, অনাহার সব কিছুই সয়েছে। কৈ লোকটা তো একদিনও খোঁজ করেনি সে বাঁচলো কি মরলো। জঘন্য। ডাকু। সিঁদেল চোর। আজ এসেছে তার সর্বস্ব লুটে নিতে। না—না কলিমুল্লা বুড়ো হলেও তার সোয়ামী। তাকে সুখেই রেখেছে। এ সংসারে সে রাণীর হালেই আছে। তার সুখের সংসারে আগুন জ্বালাতে এসেছে লোকটা। হ্যাঁ ওকে সে ধরিয়ে দেবে।

সাদা হাতী

মুর্তজা বশীর

ও যখন ঘরে এসেছিল, তখন রাত দশটা হবে।

সারা দুপুর জুয়ো খেলেছে। টাকা জেতার ইচ্ছে নিয়ে নয়, কিংবা খেলাটা যে তারপক্ষে নেশা তাও না! কেমন একটা একঘেয়ে ক্লান্তিকর জীবন। সকালে ঘুম থেকে উঠে রং তুলি নিয়ে বসে এগারোটা-বারোটা নাগাদ। দুপুরে, রয়াল পার্কের ছোট ছোট দোকানে দুটো রুটি আর আধা প্লেট তরকারী দিয়ে কোনমতে পেট চালায়। তারপর, 'মলে'র রাস্তায় ইতস্ততঃ ঘুরে স্কুল ফেরৎ মেয়েদের দেখে। বিকেল হলে, আর্ট কাউন্সিলে আড্ডা। আর আটটা-নটা পর্যন্ত এই। আর এই একঘেয়েমী থেকে পালিয়ে থাকার জন্য, আকিলের ঘরে খেলতে বসেছিল। পকেটে ওর ছিল ত্রিশ টাকা। কিন্তু ত্রিশ থেকে হয়ে উঠেছিল একশ। বাকী টাকাটা ও টেবিল থেকে না নিয়ে উঠে পড়েছিল। আবার অনুভব করছিল সেই অস্বস্তিকর একঘেয়েমী। সবাই অবাক হয়েছিল ওর এমন অদ্ভুত ব্যবহার দেখে। খেলা তাই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বসেছিল মদের পার্টি।

মদ খেয়েও স্বস্তি এতটুকুন পায়নি। বরং নিজেকে মনে হয়েছে বড্ড বেশী নিঃসঙ্গ। এক সময়, দল বেঁধে টাঙ্গায় করে গিয়েছিল হীরামণ্ডিতে নাচ দেখতে। মেয়েটা কম বয়সীই ছিল। দেখতেও বেশ। নেচেও ছিল মন্দ না। তবুও কেন জানি ভাল লাগছিল না বেশীক্ষণ বসতে। গাটা মনে হচ্ছিল পুড়ে যাচ্ছে, কপালে ব্যথা। জ্বর মনে হয়েছিল। বন্ধুদের কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারলো না যে তার জ্বর হয়েছে, আর না হয়ে থাকে হবে।

তাড়াতাড়ি কাপড়চোপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। শীত শীত করছে। ঘরে স্টোভ নেই যে কয়লা জ্বালাবে। প্লাগও নেই যে হিটার রাখবে। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করল, কি আছে ঘরটায়? ভাড়া ত মোটেই সস্তা নয়, "এল" ধরনের ঘর। দেড়তলা। সুবিধা থেকে অসুবিধাই অনেক। আঙ্গুল দিয়ে ও অসুবিধাগুলো এক এক করে গুনলো। ১ ঘরে চুনকাম নেই। তৈরীর

সময় সিমেণ্টের প্ল্যাস্টার লাগিয়েছিল, তেমনিই রয়েছে। ২ বাথরুম নেই। ওটায় কি কেউ গোছল সারতে পারে?

মাথাটা এতক্ষণ লেপের ভেতর ছিল। বের করে বাঁ পাশে তাকাল। হাসল।

মেঝে থেকে তিন ফুট উঁচুতে লম্বায় পাঁচ আর পাশে আড়াই ফুটের গর্তটা হলো গোছলখানা। এখন শীত, তাই রক্ষে। গরমে, লাফিয়ে গর্তে ঢুকেছে, বালতির পানিতে গোছল সেরে আবার লাফিয়ে নেমেছে। আশ্চর্য এতদিনে মনে পড়ল ওর গত এক বছর ধরে সে নীচ থেকে রোজ বালতি করে পানি এনেছে। এবং আনবে, আনতে হবে কাল-পরশু-তরশু। যত দিন থাকবে, ততদিন।

ঠাণ্ডা লাগছে। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে এ বছর। মারীতে জলদি বরফ পড়েছে এবার। বাতাস আসছে ওখান থেকে। লেপটা ফের মুড়ি দিল ও।

শুয়ে শুয়ে গালি দিল বাড়ীওয়ালাকে। অকথ্য। বাপ তুলল। মা তুলল। বোন তুলল। আর বলল, শালা চোর। প্রতিজ্ঞা নিল, ভাল হলেই এ ঘর ছেড়ে দেবে। অন্যত্র কোথাও চলে যাবে। হোক না ঘরে ঢোকার পথ সম্পূর্ণ ভাবে আলাদা। থাকুক না কেন তার চলাফেরা গোপনীয়।

হাঁটুটা মুড়ে কাত হয়ে শুয়ে ছিল, চিৎ হলো।

পেটের ওপর হাতটা ছিল, আঙ্গুল দিয়ে সেখানে দাগ কাটতে কাটতে মনে হলো, খিদে পেয়েছে।

শীতের মৌসুম। নটার মধ্যেই সামনাবাদের এলাকা হয়ে যায় নিশুতি। রেষ্টুরেণ্টে যে যাবে তার উপায় নেই। এক হয়, যদি চৌবুরজীর দিকে যায়। তা হলে হয়ত রাস্তার ধারের দোকানে দুধ আর বন রুটি পেতে পারে। কিন্তু সে ত বেশ দূর। অবশ্য দূরের জন্য অত ভাবে না। বহুরাত বন্ধুদের সাথে হুল্লাগুল্লা করে সেই আনারকলি থেকে হেঁটে এসেছে। সে কথা অবশ্য আলাদা। তখন এমন করে শীত আর খিদে তাকে একজোট হয়ে বাঁধে নি। আজ অবশ্য দুটোই তাকে পেয়েছে।

আচমকা খেয়াল হলো, যখন রিগ্যাল বাস স্টপে বাসের আশায় তীর্থকাকের মত দাঁড়িয়েছিল তখন দুটো ডিম কিনেছিল। কোটের দু'পকেটে হাত গুঁজে হাতের মুঠিতে চেপে ধরেছিল ও দুটোকে। সারা শরীর তাতে বেশ উষ্ণ হয়ে উঠেছিল। লাফিয়ে উঠে বসল এমন করে যে অর্ধেক লেপ গেল মাটিতে ঝুলে।

যেমন করে লাফিয়ে উঠেছিল ঠিক তেমনি করে ডিম দুটো নিয়ে এল। পা-টা টান করে সোজা হয়ে বসল বিছানায়। পিঠটা ঠেস দিল পেছনে। দেয়ালে। বুক অবধি লেপটা টেনে ডিমের খোসা সযত্নে ছাড়াতে লাগল। এতটুকুনও যেন চলে না যায়।

মাথার কাছে দেয়াল-তাক। নীচের তাকে দুটো গ্লাশ। ব্রাণ্ডির একটা বোতল। অর্ধেকের কম রয়েছে। নাসরীন এসেছিল দু'সপ্তাহ আগে। সেদিন কিনেছিল। অবশ্য গা গরম করার জন্য নয়। মনে সাহস আনার জন্য। মেয়েছেলে চুপি চুপি ঘরে আনতে ভয় হয়েছিল।

গ্লাসে আস্তে আস্তে ঢালল। চুমুক দিল।

করাচী থেকে ওর এক বন্ধুর চিঠি এসেছে আজ ভোরে। পেয়েই একবার অবশ্য পড়েছিল। আবার এখন পড়ল। সেই একই কাহিনী। মদ হৈ-চৈ আর গাড়ী করে এ-রাস্তায় ও-রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো। কখনো ক্লিফটনে। আরব সাগরের ওপর তারার মেলা দেখা। ঢেউ গোনা। আবার কখনো এয়ারপোর্টে। লাউঞ্জে, বিয়ারের বোতল সমুখে রেখে প্লেনের ওঠানামা দেখা। একদিন না। দুদিন না। রোজ। এমনি। ভাবল। একঘেয়ে লাগে না। বমি আসে না।

ও যখন করাচীতে ছিল গরমে, তখন এমনি সেও করেছে। রোজ। তারপর হুট করে চলে এসেছিল ঢাকায়। কাউকেও না বলে। একটুখানি শান্ত পরিবেশের জন্য মনটা হাঁপিয়ে উঠেছিল।

আজকেও অনেক দিন পর আবার ঢাকার কথা ওর মনে পড়ল। মনে হলো সবাইর কথা। বাবা-মা-বোন-ভাই-ভাবী। কারো খবর সে জানে না। জানতে চায়নি। রাখতে চায়নি। খবর দেয়নি, নেয়নিও। কিন্তু, এখন কেন জানি জানতে ইচ্ছে করল বড্ড বেশী। জানাতে ইচ্ছে করল, জ্বর হয়েছে।

তাছাড়া, আর কারুর কথা মনে এলো না। বন্ধুদের কথা ত নয়ই। ঢাকার বন্ধুদের ও খুব ঘৃণা করে। এখানে লাহোরের বন্ধুদের ও ঘৃণা করে। সবাইকে ঘৃণা করে! নিজেকে করে সবচেয়ে বেশী।

ব্রাণ্ডিটা মন্দ লাগছে না। যেন আগের মত নয়। বেশ গরম হয়ে উঠেছে গাল। কান।

পায়ের একটা পাতা দিয়ে অপরটা মৃদুভাবে ঘষতে লাগল ও।

বন্ধুটি গল্প লেখে। নতুন এক গল্প লিখেছে। সেটার থেকে কিছু তুলে দিয়েছে।

চিঠিটা পড়ে কাগজ টেনে নিল।

প্রথমে লিখল, প্রিয়বরেষু। লিখে কিছুক্ষণ ভাবল। না, ঠিক হলো না। কেটে দিল কথাটা। লিখল, সুহৃদবরেষু। আবার কাটল। ঠিক কথাটা খুঁজে পাচ্ছে না।

মাথাটা ভার লাগছে। চোখজোড়া জ্বলছে আবার শীত লাগছে ওর। সারা শরীরে ধানের শীষের মত কেঁপে কেঁপে ঠাণ্ডা এল।

কলমটা খুলে লেপের ওপর রেখেছিল। নিবের জায়গায় গোল হয়ে দাগ ধরে গেছে। কলমটা তুলে নিল। আঙুল দিয়ে অনুভব করল ভেজা দাগের মসৃণতা। ডগার কালির ছোপের দিকে অকম্পভাবে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। মনে হলো বড়ো দাগ কালো হয়ে গেছে।

হঠাৎ কাগজটা টেনে লিখল। সোজাসুজি। জান সাঈদ, কেন জানি আর বাঁচতে ইচ্ছে করছে না। এই যে অগুনতি মানুষ, তার কোলাহল চারিদিকে, তবু কই আমার নিঃসঙ্গ জীবনের শেষ? নিজেকে মনে হয় একা। পৃথিবীতে নির্বাসিত।···

চোখজোড়া বেশ জ্বালা করছে। কি যে লিখেছে এবং লিখবে বুঝতেই পারছে না।

বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। বিছানার এপাশ ওপাশ করল। কিন্তু ঘুম এল না অত তাড়াতাড়ি।

রাস্তায় হঠাৎ করে একটা বাসের শব্দ। কখনও ধীরে চলা কোন টাঙ্গাগাড়ীর ঘোড়ার খুরের একটানা আওয়াজ নিস্তব্ধতাকে চিরে যাচ্ছে।

আস্তে আস্তে ও ঘুমিয়ে পড়ল।

স্বপ্ন দেখল :

আকাশ আর পাখী। অসংখ্য পাখী। লাল। হলুদ। কালো। সাদা। সারা আকাশময় উড়ছে আর উড়ছে। ছোট ছোট পাতলা ডানা দিয়ে বাতাসকে কেটে চিরে ঘুরছে। কখন একসঙ্গে। কখন এলোমেলো। ডাইনে বাঁয়ে। এদিক-ওদিক। হঠাৎ একটা রূপালী পালক বাতাসে দোল খেয়ে কেঁপে কেঁপে নীচে নেমে এল। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে একটা মানুষ। উলঙ্গ। মাটি থেকে কুড়িয়ে নিল পালকটা। অর্ঘ্য দেবার মত করে দু' হাতের

অঞ্জলিতে রাখল। তারপর পায়ে পায়ে হেঁটে এল। ওর সুমুখে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল সেটাকে। এই প্রথম ও দেখল লোকটার চেহারা। ও নিজে। নিজের চেহারা।

ঘুম যখন ভাঙল তখন বেলা অনেক।

মাথায় তখনও ব্যথা রয়েছে। চোখ মেললেই সূঁচ বেঁধে। বিছানা ছেড়ে মোটেই উঠতে ইচ্ছে করছে না। তবুও তাকে উঠতে হলো।

জানালার পাটে, পেরেকে গোল আয়নাটা ঝুলান। ওখানে চেহারা দেখল। একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেছে চোখ মুখ। জানালাটা খুলে তাকিয়ে রইল বাইরে। কেমন মেঘলা আকাশ। রোদ যেখানে পড়েছে মনে হচ্ছে সোনাতে মোড়া। মনে পড়ল টারনারের ছবির কথা। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখল।

রোজকার মত নিচ থেকে পানি তুলল এক বাল্‌তি। মুখ ধুয়ে ঘর থেকে বেরুল। তারপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাস্তায় নেমে এলো। অসহ্য যন্ত্রণায় কুঁজো হয়ে চলতে লাগল বাজারের দিকে। নিম্‌কি বিস্কুট কিনল এক প্যাকেট। আটটা কমলা। গোটা ছয়েক এ্যাসপ্রো।

ঘরে ফেরার মুখে দেখল একদল মেয়েদের। ইস্কুলে যাচ্ছে। মনে মনে বলল, বেশ সুন্দর মেয়েগুলো ত' এ-দিকে।

সত্যি, আশ্চর্য। কোন দিন এদের সে দেখেনি। এ-পাড়ার কোন মেয়েকেই চোখে পড়েনি। ঘুম থেকে ত যখন উঠত তখন তারা ইস্কুলে পৌঁছে যায়।

ঘরে এসে সোজাসুজি বিছানায় বসল ও। গোটা পাঁচ-ছয়েক বিস্কুট খেল। একটা কমলা। তার কিছুক্ষণ বাদ দুটো এ্যাসপ্রোর গুলি। তারপর লম্বালম্বি ভাবে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

শুয়ে শুয়ে মাথা চারধারে ঘুরিয়ে দেখল, খুঁজল ধূসর কোন জীব। কিন্তু নিরাশ হলো। পেল না। থাকলে বেশ হতো, ভাবল ও। অন্ততঃ একটা কিছু জীবন্ত। তাকে চলতে। নড়তে।

এই প্রথম অনুভব করল রেডিওর প্রয়োজন। রেডিও রাখাকে ও ভাবত বিলাস! যার না আছে কোনো চালচুলো। ঠিক ঠিকানা। আজ এ শহর। কাল ও শহর। ওর মোটেই ভাল লাগে না। এমনি করে ঘুরে বেড়াতে। কিন্তু উপায় কই? ছবি এঁকে চলে একজিবিশন করে। টাকার টান

ধরলেই আবার একজিবিশন। প্রতিবার ঠিক করে এই শেষ। আর না। এইবার এক জায়গায় থাকবে। চাকরী নেবে। আর অবসরে ছবি আঁকবে। চাকরী পেয়েছে ও। তখন ভয় পেয়েছে। তাহলে আর ছবি আঁকতে পারবে না।

আর নেয়নি বলেই রেডিও নেই আজ।

বার বার কামনা করল কোন শব্দ। একটা স্বর। অন্য কারুর। আর সেই আওয়াজ এই গুমোটকে ভেঙ্গে দিত। বেশ হতো। একটুখানি গান। বা কোন সুরের গুনগুনানি। হঠাৎ একটা মৃদু শব্দ শুনতে পেল ও।

কানটা সজাগ করল। ভয় পেল নিঃশ্বাস ফেলতে। যদি অনুচ্চ শব্দটা হারিয়ে যায়। তারপরে ধীরে খুব মোলায়েম ভাবে মাথাটা ঘুরিয়ে নিল শব্দের দিকে। অতি আগ্রহে হাত বাড়িয়ে তুলে নিল টাইমপিস্‌টা তাক থেকে। বাঁ হাতের উষ্ণ তালুতে ওটাকে রেখে সন্তর্পণে চাবি দিতে লাগল আলার্মে। সূচের মতন চিক্কণ কাঁটাটা রয়েছে পাঁচের ঘরে। সকাল সকাল তাড়াতাড়ি যাতে নাসরীন চলে যেতে পারে সেজন্য সেদিন কাঁটাটা ওখানে রেখেছিল। এরপর আর সরাবার সুযোগ আসে নি। আজও সরাল না। বরং সময়ের কাঁটা ঘুরিয়ে আনল পাঁচের ঘরে।

ছোট্ট ছেলেমানুষ যেমন করে বার বার শোনে তেমনি করে ও শুনতে লাগলো। বেশ আওয়াজটা। কাঁপানো! পাতলা। মিনিট।

কখন কানে চেপে, কখন সুমুখে ধরে শুনল। শুনতে শুনতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

স্বপ্ন দেখল: বিরাট এক দরজা। তা: সমুখে ও দাঁড়িয়ে। কড়া নাড়বে, কিন্তু দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে গেল। আর তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা লোক, লোকটা ও নিজে, দু'মাসের আগের চেহারা। দাড়ি নিয়ে। দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রইল লোকটা। বলল কাপুরুষ কোথাকার। শুনে চমকে গেল। বলল না, না, আমি না।

: দাড়ি কেন কেটেছো।

: লোকে আমাকে মৌলানা বলে। তারপরে কিছুক্ষণ চুপ থেকে মাথা বার কয়েক চুলকালো।

সলজ্জ বলল, মেয়েদের দিকে তাকালে ওরা হাসে।

ধমক দিল লোকটা, মিথ্যে কথা। আসলে সব কিছু মেনে নিয়েছ।

নতি স্বীকার করেছ। তোমার অহংকার নেই। যার অহংকার নেই সে কি মানুষ। আত্মার মৃত্যু হয়েছে তোমার।

: আত্মার মৃত্যু। না। কি করে? অসম্ভব।

হাসল লোকটা। এত স্বচ্ছ সে হাসি যে নিজেকে তার সুমুখে দাঁড় করিয়ে রাখতে কেমন সংকোচ হলো। নিজের সমস্ত সত্তা যেন গড়িয়ে গেল মাটিতে। নির্বিকার ভাবে তাকিয়ে রইল লোকটার দিকে। তার মুখের দিকে।

লোকটা বলল, বুঝবে কি করে। বুদ্ধি কি আছে তোমার? মাথায় পেরেক ঠুকলে হয়তো বেরুতে পারে।

শুনে শিউরে উঠল ও। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, পেরেক কেন।

স্থির দৃষ্টিতে ওকে দেখে লোকটা জবাব দিল, বুদ্ধির গোড়াতে ছুঁতে হবে।

: না। না। আবার ও কেঁপে উঠল। জলদি করে বলল, ফুল দিয়ে আঘাত কর। যদি বুদ্ধি আমার ঘুমিয়ে থাকে তবে ফুলের পাপড়ির আঘাতে ওর ঘুম যাবে ভেঙ্গে। তারপর চোখ মেলে চাইবে। দেখবে। আমি বুঝবো।

: তুমি বিয়ে করতে চলেছ? না রাজা?

লোকটার বিদ্রুপ-এ ও মোটেই দমল না। একটু ভেবে বলল, বেশ, তবে কাঁটা দিয়ে আমার মাথাটাকে মোরাবার মত কাটো। লাল হয়ে আমার সারা মুখ ভিজে যাবে। লোমকূপের গোড়া দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে যাবে রক্তের ধারা। বিস্মৃত বুদ্ধি জেগে উঠবে। ভেসে উঠবে।

: তুমি কি যিশু?

লোকটার প্রশ্ন শুনে তার দিকে তাকাল। কোন রকম দয়া নেই। মায়া নেই।

: তা ঠিক, আমি রাজা নই। বিয়ে করতেও যাচ্ছি না। যিশু নই।

: কাপুরুষ।

: না।

: হ্যাঁ।

: না, না। তোমার কসম ওটা বল না।

: কেন? সত্যি কথা শুনতে ভয় পাও?

: না।

: তবে কে তুমি?

: হাসান রেজা।

: নাম ওটা।

: ছবি আঁকি।

: ওটা পেশা।

: আমার ছবি সবাই চেনে। আমার নাম সই রয়েছে সেখানে।

: ওগুলো অক্ষরের সমষ্টি।

লোকটার কথা শুনে চমকে উঠল ও। তীক্ষ্ণ ভাবে তাকিয়ে রইল মুখোস আঁটা মুখের দিকে।

: জানি না। বুঝি না। উহ্। দু'হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। এক সময় মুখ তুলল। অকরুণ একটা লোক। তাকে দেখছে। চোখ জোড়া সরু করে তাকিয়ে রয়েছে। তারপর হাতটা বাড়িয়ে দিল ওর মুখের দিকে। ক্রমেই বড় হতে লাগল আঙ্গুলগুলো। পাঁচটা আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছিল উন্মুক্ত আকাশ, কিন্তু আর পেল না। অনুভব করল ওর মুখে আঙ্গুলের ছোঁয়া। একটা হিমশীতল সাপ যেন তার সারা শরীরকে জড়িয়ে উঠতে লাগল। যেখান দিয়ে সাপ বেয়ে বেয়ে উঠেছে ও জায়গাগুলো যেন পচে গেল। কোন রকম অনুভূতি নেই। অবসাদ।

শুনলে, চিনতে পারো তোমাকে এখন।

: না। চোখজোড়া চ""ড়ার সঙ্গে চলে গেছে।

শুনল, এবার হাসছে লোকটা। হাসি যখন থামল কানে এল এবার তার স্বর।

: আসলে চেনার মত চোখ নেই বুঝলে? বললাম না! বুদ্ধিতে ঠুকতে হবে।

মরিয়া হয়ে উঠল ও।

বলল, বেশ। মাথার কাছে তাকে বড় পেরেক রয়েছে একটা। নাও। মারো। আমার মাথায় মারো।

উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল সে।

লোকটা পেরেকটি নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। বলল, কালো রং ত তোমার না। এই যে তোমার ছবিগুলো কালো লাল আর হলুদে আঁকা, এগুলিতে তুমি নেই। তোমার রং নয় এগুলো। নিজেকে শুধু প্রবোধ দিচ্ছো। ঠকাচ্ছ। তোমার রং হলো নীল।

ঘরের কোণে রংয়ের কৌটোগুলো ছিলো, সেখানে গিয়ে নীল রংএ পেরেকটাকে চুবিয়ে নিল। বলল, নাও ধর এবার।

দু'হাত দিয়ে কপালের মাঝখানে পেরেকটাকে ধরল ও।

লোকটা পেরেকটা ঠুকতে লাগল।

ঠক্ ঠক্ ঠক্।

ঠক্ ঠক্ ঠক্।

কান পেতে শুয়ে শুয়ে শুনল।

শব্দটা আসছে দরজা থেকে। কে যেন জোরে জোরে ধাক্কা দিচ্ছে।

ঃ কৌন।

ঃ আমি। নাসরীন।

ঃ এসো। দরজা খোলাই। জোরে ঠেলা দাও।

ঘরে ঢুকে, দরজাটা ভেজিয়ে নাসরীন জিজ্ঞেস করল ঃ কি হয়েছে আপনার। শুয়ে যে।

ঃ জ্বর। বোখার।

কালো রংয়ের বোরখাটা খুলে দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখা ক্যানভাস-গুলোর বোনায় ঝুলিয়ে রাখল। বিছানার সুমুখে এসে জিজ্ঞেস করল, এতোয়ারের রোজ এলেন না যে। আমি কাসিনোর সামনে অপেক্ষা করছিলাম। ঠিক চারটেয়। তাইত আপনি বলেছিলেন। তাই না?

ঃ এসেছিলাম। একটু ইতস্তত করে বলল, তবে দেরী হয়ে গিয়েছিল বিশ মিনিট।

ঃ বিশ মিনিট? কেন?

নাসরীনের কেনর জবাব দিতে গিয়ে ও হুট করে দিতে পারল না। কি কথা বলবে ওকে। সত্যি কথাটাই বলবে, না মিছে কিছু বলবে।

ওকে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতে দেখল নাসরীন। তাই বলল, জানেন ত অমনি ভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা কেমন মুস্কিল। লোকজন তেমন কেয়ার করি না। তবে, পুলিশকে যা ডর। এই যা।

এবার ও মুখ খুলল, দেখো নাসরীন, আমি আসছিলাম ঠিকই। কিন্তু… একটু থেমে, নাসরীনের বড় বড় চোখের খয়েরী মণিতে নিজেকে দেখল।

মাথা নাবিয়ে নখ দিয়ে নখে আঁচড় কাটতে কাটতে বলল, কিন্তু এক দোস্ত বলল, তোর সরম করে না টেক্সীর সংগে প্রেম করিস। তাই, তাই আমি ভাবছিলাম……

কথাটা তাকে শেষ করতে না দিয়েই জ্বালা ভরা স্বরে নাসরীন বলল, তাই দেরী হলো। বহুৎ শুকরিয়া। তবে যে জন্যে এসেছিলাম হ্যাঁ, সেদিন আমার বডিসটা ফেলে গেছি। জলদিতে যেভাবে ভাগতে হয়েছিল। তাই নিতে এলাম। নতুন দেখেই একটু মায়া। তা না হলে……

কথাটা শেষ করল না। ঠোটটা বেঁকিয়ে মাথাটা শুধু ঝাঁকি দিল।

নাসরীনের কাঁপানো বেণীর শেষের দিকে বাঁধা গোলাবী ফিতে দেখতে দেখতে ও বলল, বডিসটা মাথার কাছে তাকে রেখেছিলাম। দেখো পাবে।

কিন্তু খুঁজে পেল না নাসরীন। ড্রয়িং করা কাগজ, খাতা বই, চিঠিপত্তর সব নেড়েচেড়েও পেল না। ওকে বলার জন্যে মুখ ঘুরিয়েই, চেঁচিয়ে উঠল, ওটা কি? আপনার হাতে।

ঃ পেরেক।

ঃ পেরেক?

ঃ হ্যাঁ। পেরেক।

ওর হাতের মুঠিতে শক্ত করে ধরে থাকা নীল বডিসটাকে ছিনিয়ে নিয়ে অবাক হয়ে নিজেকে বলার মত করে বলল নাসরীন, পেরেক। তার পর শব্দ করে হেসে উঠল।

দু'হাত দিয়ে স্ট্রেপটা ধরে ওর চোখের ওপর দোলাতে দোলাতে বলল, পেরেক?

ফের হাসির দমকে, ভেঙ্গে নুইয়ে পড়ল। হাসতে হাসতেই বলল, আরে সাব খোয়াব দেখছেন আপনি।

নাসরীনের হাসি দেখে শীত পেল ওর। গায়ে কাঁটা দিয়ে এল।

লেপটা ওভাবে গায়ে জড়াতে দেখে প্রশ্ন করল নাসরীন, কি হয়েছে? শীত করছে খুব?

চিৎ হয়ে শুয়েছিল। এবার পা ভেঙ্গে দ হয়ে শুলো। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল নাসরীন। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল ওকে। কেমন অসহায়।

একটা ছোট্ট ছেলে মনে হলো। মাসুম।

চুলের বিনুনীটা খুলে ফিতেটা মেঝেয় ফেলল। কামিজ খুলে, সালোয়ার ছেড়ে স্তূপ করে রাখল তার ওপর। ও শুয়ে শুয়ে দেখল। কোন কিছু ভাববার অবকাশ না দিয়ে ওর লেপের ভেতর ঢুকে পড়ল নাসরীন। দুহাতে ওকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে মোলায়েম স্বরে ফিসফিস করে শুধাল, কেমন লাগছে এখন ঃ

ঃ ভাল।

আরো কাছে টেনে নিল ওকে। বড় বড় চুলে ঢেকে গেল সারা চোখ মুখ। কেমন মিষ্টি গন্ধ। হাল্‌কা।

হঠাৎ এক সময় ও ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল নাসরীনকে।

দু'হাত দিয়ে মুখের ওপর থেকে চুলের গোছাগুলো তাড়াতাড়ি সরাতে সরাতে বলল, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ছাড়ো। ছেড়ে দো।

আচমকা চোখ মেলল ও।

ঘরটা অন্ধকার। ঘামে ভিজে গেছে গলা বুক। দু'হাতের মুঠিতে বডিসটা ধরে রয়েছে। ওটা দিয়ে মুখ গলা মুছে বালিশের পাশে রাখল। সযত্নে। ঘামে ভেজা, পাউডার আর সেণ্টের গন্ধে মাথাটা ভরে গেল। আবার ওটাকে নিয়ে শুঁকল। বুক ভরা শ্বাস নিয়ে রইল অনেকক্ষণ। ঝট্ করে ছাড়তে ইচ্ছে করল না। প্রথম যেদিন সিগারেট টেনে ধোঁয়া ছেড়েছিল অমনি করে ছাড়ল। যাতে তার রক্তের মধ্যে গন্ধটা মিলে যায়। থাকে।

ঘড়িটা কাত হয়ে পড়েছিল পাশে। ওটা নিল। সময় দেখল।

পাঁচটা।

চোখ বুজল। আবার খুলল। ফের দেখল ঘড়িটা। সেই পাঁচটা। নাসরীনের জন্য অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিল, পাঁচটায়। মনে পড়ল। পাঁচ। অবাক হয়ে নিজেই প্রশ্ন করল। কানের ওপর চেপে ধরল তারপর।

ঃ বন্ধ হয়ে গেছে। নিজে নিজে বলল।

ও ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। এ সময়টা কি? সকাল? না সন্ধ্যে? মনে হলো কতদিন পর ঘুম থেকে রূপার কাঠির ছোঁয়ায় জেগে উঠল। সময়টা জানার জন্য অস্থির হয়ে পড়ল ও। সারা দেহ মনে সেই অস্থিরতা।

বিছানা থেকে নেমে জানলার পাশে দাঁড়াল। ঘন কুয়াসা। কিছু ত স্পষ্ট দেখা যায় না। পয়লা গোল চক্কবের কাছে গাছগুলোর নিচে কয়েকটা টাঙ্গাগাড়ী।

ঘণ্টা খানেক ঠায় প্রতীক্ষায় থাকার পর আবিষ্কার করল, সকাল। এখন সকাল।

কপালে গায়ে হাত দিয়ে দেখল উত্তাপ মোটেই নেই।

মুখ ধুলো নিচে। কলপাড়ে। তারপব বেরুল বাইবে। চা খেল। ব্যাংকে গেল। টাকা তুলল। ডাক্তারের কাছে গেল।

ডাক্তাব সাহেবকে বলল সব। কেমন করে জ্বর এসেছিল। কি খেয়েছে। কি করেছে। সব বলল স্কুলেব ছোট ছাত্রেব মত। গড় গড় করে।

ডাক্তার সাহেব হাতের কব্জিব নাড়ি টিপলেন। চোখ দেখলেন। জিভ দেখে বুকে স্টেথিস্কোপ লাগিযে পরীক্ষা কবে বললেন, ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল। ভযেব কাবণ এখন নেই। তবে বিশ্রাম নিতে হবে আরো দু'দিন। ওষুধ দিলেন মিকচাব।

ওটা পকেটে পুরে. রাস্তা দিয়ে ছায়ায় চলতে শুরু কবল ও। গাছ গুনল। আজকেও। এক দুই তিন চার পাঁচ ছ সাত আট ন দশ এগারো ১৫ ১৮ ২০ ২২ পঁচিশ ৩০।

অবাক হলো। ও জানে রিগ্যাল থেকে চ্যারিংক্রশ পর্যন্ত পনেরোটা গাছ।

ফের গুনল। ফের হচ্ছে ওরকম। ববং বেশী।

কপালেব দু'পাশেব বগ নাচছে। মাথাটা মনে হচ্ছে একেবারে হাল্‌কা। রাস্তায় লোকগুলোকে মনে হচ্ছে কাচেব তৈবী।

একটা টাঙ্গাকে ডাকল হাত তুলে।

বলল, সামনাবাদ। পহেলী গোল চক্কর।

বসে পাদুটো তুলে দিল সিটে। ঠেস দিল লোহার শিকে। ওপাশের হুডের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে আকাশ আব গাছের মাথাগুলো।

চোখ বুঁজলো।

ঘোড়াটা জোরে ছুটছে। টাঙ্গাটা দুলছে অনেক।

এক সময় চোখ খুলল আবার। দেখল, গাছের মাথাগুলো আর আকাশ।

ফের চোখ বুজল।

স্বপ্ন দেখল :

আকাশ আর গাছের মাথাগুলো। ও শুয়ে রয়েছে নৌকার পাটাতনে। ছইয়ের ফাঁক দিয়ে দেখছে বাইরে। দুধারে খাড়া পাহাড়। কর্ণফুলিতে অনেক জোয়ার। পাহাড় থেকে ঢল নেবেছে! ও যাচ্ছে বরকল। তারপর একটা খেয়া পেরুবে। সুমুখে পড়বে রিজার্ভের বন। ওটার ভেতর দিয়ে সরু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে নাববে গিয়ে ঝর্ণায়। কোমর পানিতে হাঁটবে মাইলের পর মাইল। দুধারে বাঁশবন। তারপর আবার পাহাড। চড়াই-উৎরাই ঝর্ণা।

ও চলেছে কুকীদের গ্রাম, সাঁইচল। পাহাড়ী ভাষার মানে পুরুষ হাতী। গ্রামটার সুমুখে হাতীর পিঠের মত পাহাড়। এককালে হাতী ঘুরে বেড়াত। এখন কমলার বাগান।

পেছনে, দূরে লুসাই পাহাড়।

মাঝে ঘন কুয়াশার সমুদ্র।

সেখানে সাদা সাদা টুকরো মেঘগুলো যেন ঢেউ।

রোদের অন্ধকারে বৃষ্টি

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

অন্ধকার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আগুনের লকলকে শিখাটাও ক্রমে নিভে যাচ্ছে। লাল আলোয় উদ্ভাসিত অরণ্যশীর্ষ আবার অন্ধকারে ডুবে গিয়ে আকাশের নীচে একটা জমাট কালো পাহাড়ের মাথা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শব্দ, সোরগোল এ সব কিছুই এখন নেই। আর্তনাদও নয়। একটা নতুন শব্দের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে লায়লি। ট্যা-ট্যা-ট্যা-ট্যা। শিবানী বলেছিল, ওটা বন্দুকের শব্দ। শিবানীর ভাই নরহরি বলেছিল, দূর বোকা, ওটা বন্দুকের শব্দ নয়। বন্দুকের শব্দ হয় গুড়ুম গুড়ুম। সেবার মেঘনার চরে বালিহাঁস মারতে গিয়ে বন্দুক ছুঁড়েছিলাম, তোর মনে নেই?

লায়লি বলেছিল, শব্দটা তাহলে কিসের?

লায়লির ভাই জাকারিয়া, সংক্ষেপে জ্যাক এক সময় ক্যাডেট কলেজের ছাত্র ছিল। সে বলল, সাব মেশিনগান, মর্টারের শব্দও শুনেছি মাঝে মাঝে। এ ছাড়া পাহাড়-কাঁপানো যে-শব্দ হচ্ছে থেকে থেকে, তা খুব শক্তিশালী এক্সপ্লোসিভের। ওগুলো দিয়ে আগুন লাগানো খুব সুবিধে। গ্রামকে গ্রাম উজাড় করে দেওয়া যায়।

ফিসফিসিয়ে কথা বলছিল সবাই। পচা ডোবাটায় একহাঁটু কাদা। এতক্ষণ ব্যাঙের ডাক শোনা যায় নি, হঠাৎ ঐকতান শুরু হল। শিবানী বলল, দাদা এবার টর্চটা জ্বালাও। আমার পায়ের কাছে কি যেন একটা সরসর করছে।

লায়লি বলল, চুপ, মিলিটারিরা এখনো চলে যায় নি।

শিবানী হঠাৎ যন্ত্রণাকাতর একটা শব্দ করল, আহ্।

জ্যাক বলল, কি হল শিবানী?

আমার পা ক্রমেই কাদায় সেঁধিয়ে যাচ্ছে। আর পায়ের কাছে কি যেন একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা……

নরহরি জামার খুঁটে চাপা দিয়ে টর্চ জ্বালল। আলোটা যেন বেশি দূরে

না যায়। একটা সাপ সরসরিয়ে সকলের গা ছুঁয়ে ছুটে পালাল।

নরহরি বলল, কুইক, সকলে উপরে ওঠো।

নরহরি লায়লিকে একটা হ্যাঁচকা টানে উপরে তুলে দিল। শিবানী কাতর স্বরে বলল, আমার একটা হাত ধরো দাদা। কাদা থেকে পা টেনে তুলতে পারছি না।

নরহরি তাকেও টেনে তুলল।

জ্যাক বলল, টর্চটা জ্বালো নরহরিদা, শিবানীকে সাপে কেটেছে কিনা দেখি।

আবার আলো জ্বলে উঠল। ডোবার কাছেই বাঁশঝাড়। আলোর তাড়ায় একটা কাঠবিড়ালি ছুটে পালাল। বাঁশঝাড়ে শো শো শব্দ হল। এপ্রিল মাসের বাতাস। এখনো গরম পড়ে নি। একটা ঠাণ্ডা হিমহিম ভাব। জ্যাক আলতোভাবে শিবানীর একটা পা তুলে ধরল। আলতা রাঙানো পা। ফর্সা পায়ে কাদা লেগে আলতার রঙ চুনসুরকির মত লাগছে। যেমন পলেস্তারা খসা সাদা দেয়ালে চুনসুরকির দাগ। জ্যাক শিহরিত হল না। অথচ ওই সাদা তুলতুলে পায়ের দিকে কতদিন সে অধীর হয়ে তাকিয়েছে।

জ্যাক আনমনা আরেকটা পা তুলে ধরল। শিবানীর মুখে রা নেই। অন্যদিন অন্যসময় হলে সে বাধা দিত। সঙ্কোচে দূরে সরে বসত। আজ পরম আশ্বাসে জ্যাকের কোলে পা তুলে সে বাঁশঝাড়ের দিকে চেয়ে রইল পুতুলের মত।

নাহ্ সাপে কাটে নি। কোথাও বিষ-ব্যথা নেই তো।

না। শিবানী মাথা নাড়ল। তারপরই আবার কঁকিয়ে কেঁদে উঠল, মা, আমার মা।

সঙ্গে সঙ্গে কথাটা মনে পড়ল সকলের। পাশেই পাটক্ষেতে আশ্রয় নিয়েছে নরহরির বাবা মা আর গ্রামের একদল নরনারী। জ্যাকের বাবা মা ঘর ছেড়ে আসেননি। লতিফ সাহেব বলেছেন, আমি মুসলিম লীগের পুরনো লোক। ফ্রন্টিয়ারের গণভোটে লীগের ভলান্টিয়ার হয়ে গেছলাম। কায়েদে আজমের সার্টিফিকেট আছে আমার কাছে। আমার ভয় কি?

নরহরির বাবা রাখহরিবাবুর কানে কানে বলেছিলেন, ঘরে তিন শো মণ ধান আছে। মালমাত্তা কম নেই। এসব ছেড়ে কই যাব। মিলিটারি আসার আগেই চোর বাটপাড়ে লুট করে নেবে। আপনারা যান, তাড়াতাড়ি

পালান। সোমত্ত মেয়ে দুটোকে সঙ্গে নিয়ে যান। ছেলে দুটোকেও। ভয় তো ওদেরই।

সেই ট্যা-ট্যা শব্দটা তখন আরো কাছে চলে এসেছিল। হঠাৎ আগুনের হল্কা উঠেছিল আকাশের পূব কোণে। লতিফ সাহেবের বাড়ি থেকে গ্রামের বাজার মাইল দুই দূরে। লতিফ সাহেব ভারি গলায় বলেছিলেন, বাজারে আগুন দিচ্ছে। আমার আড়তটাও পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

শিবানী তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। তার শাড়িতে গায়ে চোখে মুখে ছোপ ছোপ কাদা। লায়লির চুলে কাদার ছিটে। জ্যাক তার কনুই থেকে কাদা মুছে নাক ঝেড়ে বলল, চল, চল, পা চালিয়ে চল। মিলিটারিরা চলে গেছে।

নরহরি টর্চটা নিভিয়ে দিল। বলল, বলা যায় না. কোথাও হয়তো ওত পেতে রয়েছে।

জ্যাক বলল, আমি সামনে। শিবানী ও লায়লি মাঝখানে। নরহরিদা পেছনে কুইক মার্চ।

ঝরা পাতায় পায়ের শব্দ জাগল না। ক'দিন ধরে পাতলা পাতলা বৃষ্টি হচ্ছে। মরশুমের শুরুতেই এবার বৃষ্টি। নিঃশব্দে ওরা এগিয়ে গেল পাটক্ষেতের দিকে।

চাপ চাপ অন্ধকার গা সওয়া হয়ে আসে। সারা ঝিরিন্দি গ্রামটা মনে হয় পরিত্যক্ত শ্মশান। আগে ঢুলিপাড়া থেকে মাঝে মাঝে ঢোলের শব্দ ভেসে আসত। এখন তাও নীরব। জ্যাক বলল, হাতঘড়িটা আনি নি। এখন রাত কটা?

লায়লি বলল, দশটার কম নয়।

এঃ, বলিস কি? আমরা তাহলে তিনঘণ্টা ওই ডোবাটায় ছিলাম?

তা হবে। নরহরি বলল।

তাহলে এশার নামাজের আজান শুনি নি কেন?

নরহরি জ্যাককে ধমকে উঠল, দূর বোকা। আজান দেবে কে? মসজিদে লোক আছে নাকি!

জ্যাকের মনে হল, সে যুগ যুগান্তর ধরে হাঁটছে। এই হাঁটা শুরু হয়েছিল কবে? না, সেই ছাব্বিশে মার্চ রাতে। হস্টেল থেকে পালিয়ে এসে উঠেছিল বন্ধুর বাসায়। সেখান থেকে হেঁটে কুমিল্লা। মাঝ পথে নদী পার হয়েছে নৌকোয়। তারপর নিজের গ্রামে। হিসেব করে দেখেছে, একদিনে

চৌদ্দ মাইল হেঁটেছে। একটা তাড়া খাওয়া জন্তুর মত সে পালিয়ে এসেছে। পরনে লুঙ্গি। গায়ে ময়লা হাওয়াই সার্ট। গালে মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। লায়লি দেখে প্রথমে চিনতে পারে নি, চীৎকার করে উঠেছিল, কে, কে তুমি?

জ্যাক বোনের চীৎকারে বিহ্বল হয় নি। সে বিহ্বল হয়েছিল দূরে বাজারেব দিকে পতাকা উড়তে দেখে। এখনো পতাকা উড়ছে। সবুজ, লাল আর সোনালী রঙের তেরঙা পতাকা। হঠাৎ চোখ ছলছল করে উঠেছিল জ্যাকের।

হল্ট্। পাটক্ষেত নড়ে উঠল।

দুটো বন্দুকের নল বেরিয়ে এল।

নিশ্চয়ই মিলিটারি। শিবানী শক্ত হাতে জ্যাকের একটা কাঁধ চেপে ধরল। জ্যাক এই প্রথম তার কাঁধে মৃদু শিরশিরানির মত একটা ভয়ের তাড়া অনুভব করল।

বাতাসটা বড় ভারি। আকাশটা একটা বন্ধ ডালা কফিনের মত। অনেক উঁচু থেকে নেমে এসে সেই কফিনটা যেন চেপে বসছে চারজনের কাঁধে। তারার আলো মোমবাতির মত জ্বলছে। যেন পথ দেখিয়ে দিচ্ছে শবাধারবাহী চারজনকে। কিন্তু আর এগোবার উপায় নেই।

জ্যাক থমকে দাঁড়াল। অভ্যস্ত নিয়মে দুটো হাত মাথার উপরে তুলল। দেখাদেখি শিবানী লায়লি এবং নরহরি। ক্যাডেট কলেজে থাকতে এই নিয়মটা শিখে নিয়েছিল জ্যাক।

প্রথমেই বন্দুক হাতে যে বেরিয়ে এল, তাকে দেখে জ্যাক অবাক। বাজারের বন্দুকসি দরজির বড় ছেলে। বখে যাওয়া ছেলে। ইস্কুলের শেষ দরজা পেরোয় নি। গত বছরই একটা ডাকাতির মামলায় দু'মাস জেল খেটে এসেছে। লোহার পাইপ কিনে গাদা বন্দুক বানায়। লাইসেন্স ছাড়া বন্দুক রাখার অপরাধে একবার ধরা পড়তে গিয়েও বেঁচে গিয়েছিল।

জ্যাকের ভয় আরো বাড়ল। মিলিটারি নয়, এবার ডাকাত। দরজি-নন্দন রহমতকে সে চেনে। খুন জখম রাহাজানি এই তিনটাতেই সে সিদ্ধহস্ত। গ্রামের মেয়েদের দিকেও তার কুৎসিত নজর। একবার শিবানীর

কাছে সে উড়ো চিঠি দিয়েছিল। রাখহরিবাবু ভয়ে কিছু বলেন নি। শত হোক তিনি সংখ্যালঘু। তাছাড়া টাকা পয়সাওয়ালা মানুষ। সুযোগ বুঝে রহমত একবার চিঠি লিখে দশ হাজার টাকা দাবি করেছিল। লিখেছিল, নইলে তার বাড়িতে ডাকাতি হবে। রাখহরিবাবু কাউকে কথাটা জানান নি। কারণ, তিনি জানতেন, এ ব্যাপারে থানার ও, সি. মোবারক খাঁর যোগসাজস রয়েছে। রাখহরিবাবুর আগে কুণ্ডুপালের আড়তে ডাকাতি হয়। লুট হয়েছিল বন্ধকি গহনার সিন্দুক। প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার সোনা। অপরাধীরা কোনদিন ধরা পড়ে নি। যদিও গ্রামের অনেকেই জানত, এই ডাকাতির সঙ্গে রহমতের দলের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। রাখহরিবাবু সব বুঝে গোপনে রহমতকে ডেকে পাঁচ হাজার টাকায় রফা করেছিলেন। জ্যাক ব্যাপারটা জেনেছিল নরহরির কাছ থেকে।

সেই রহমত এখন বন্দুক হাতে তার সামনে দাঁড়িয়ে। জ্যাক নিরস্ত্র। তার পেছনে লায়লি এবং শিবানী। এর চাইতে মিলিটারিদের হাতে পড়াও বুঝি ভাল ছিল।

একটা শক্তিশালী টর্চের আলো জ্যাকের চোখ ধাঁধিয়ে দিল। রহমতের পেছন থেকে কেউ টর্চ মেরেছে। রহমত ধমকে উঠল, এই আলোটা নিভিয়ে ফেল্ আলিজান্।

আলিজান মানে থানার ও. সি. মোবারক খাঁর ছেলে। সেও এই দলে জুটেছে। এতক্ষণে রহমতের হাতে গাদা বন্দুক নয়, একেবারে বিলিতি বন্দুকের রহস্য উদ্ঘাটিত হল জ্যাকের কাছে। এগুলো নিশ্চয়ই থানার বন্দুক। দেশে এখন আইনকানুন নেই, থানা-পুলিশ নেই। সুতরাং একদিকে রাজত্ব হানাদার মিলিটারিদের, অন্যদিকে চোর ডাকাতের। জ্যাক মনে মনে দুঃখ করল, নিরস্ত্র হয়ে এসে কি ভুলটাই না করেছে। ঘরে যে বন্দুকটায় মরচে ধরে আছে, সেটাও এই দুঃসময়ে কাজে লাগত। তবু—কপালে যা থাকে। নিজের দেহে প্রাণ থাকতে শিবানী আর লায়লির গায়ে হাত তুলতে দেবে না সে কাউকে। রহমত, কি চাও তুমি? জ্যাক রুদ্ধশ্বাসে বলল। তার গলার স্বর বুঝি একটু কেঁপে গেল।

কিচ্ছু চাই না। পাহারা দিচ্ছি। মিলিটারির ভয়ে সবাই এই পাট ক্ষেতে পালিয়েছে। কিন্তু তোমরা কি চাও?

আমরা কি চাই মানে? জ্যাকের গলায় সাহস ফিরে এল।

এই দুটো ভরাযৌবন মেয়ে নিয়ে কোথায় গিয়েছিলে ? রহমতের গলায় সন্দেহ আর বিদ্রূপের একটা কুৎসিত চটক।

কোথায় গিয়েছিলাম মানে ?

মানে খুব সহজ ! রহমত সহজ গলায় বলল, মিলিটারিদের ভেট্ দিতে গিয়েছিলে নাকি ?

ক্রোধে সেই অন্ধকার পাট ক্ষেত আরো অন্ধকার হয়ে এল জ্যাকের চোখে। বহু কষ্টে নিজেকে সামলে বলল, তুমি একটা জোচ্চোর, ডাকাত। তার ওপর হাতে বন্দুক পেয়েছ। তাই একথা বলতে সাহস করছ !

রহমত চাপা কণ্ঠে হাসল, আমি ডাকাত। মুসলিম লীগার নই।

জ্যাক চাপা রাগে ফেটে পড়ল, তুমি একটা লোফার, লম্পট। মেয়েদেব সম্মান রেখে চলতে জান না।

রহমতের হাসি তীব্র ও তীক্ষ্ণ শিসের মত হয়ে উঠল, মেয়ে দেখলে কোন পুরুষের না শরীর টাটায়, কিন্তু মোল্লা মওদুদীর চ্যালাদের মত আমরা আমোদখোর নই।

জ্যাক স্তম্ভিত বিস্ময়ে বলল, আমি মুসলিম লীগার, মোল্লা মওদুদীর লোক ?

রহমত বলল, তুমি কিনা জানি না, তোমার বাবা মুসলিম লীগার ছিলেন। এখন মাথায় গোল টুপি চাপিয়ে জামাতের মজলিসে যান। আমি বন্দুক উঁচিয়ে ডাকাতি করি, তোমার বাবা ডাকাতি করে মাথায় টুপি চাপিয়ে !

ঝগড়াটা পাকতে যাচ্ছিল, নরহরি এগিয়ে এল, রহমত, আমরা মিলিটারির ভয়ে পালিয়েছিলাম। দেখছ না আমাদের সারা গায়ে কাদা। এখন বাবা মার খোঁজে এখানে এসেছি। তারা পাট ক্ষেতে এসেছিলেন।

আমার মা ! আমার মা ! শিবানী এতক্ষণ পর চেতনা ফিরে পেয়ে যেন কঁকিয়ে কেঁদে উঠল।

দু,দুটো বন্দুকের নল চোখের সামনে থেকে সরে গেল। রহমত বলল, গ্রামের অনেকেই এই পাটক্ষেতে আছেন। মিলিটারিরা এদিকে আসতে পারে ভেবে আমরা তিনজনে মাত্র পাহারা দিচ্ছি। বন্দুক বলতে তিনটা। বাকি বন্দুক নিয়ে কনেস্টবলরা পালিয়েছে। তারা নাকি মুক্তিফৌজে যোগ দেবে। আমাদের অবস্থাটা একবার ভাব ?

তোমরা পাহারা দিচ্ছ ? জ্যাকের গলার স্বরে সুস্পষ্ট অবিশ্বাস !

রহমত ঠাণ্ডা নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল, কেন, তুমি ভাবছিলে বুঝি সুযোগ পেয়ে গ্রামের মানুষের ওপর চড়াও হয়েছি, তাদের যথাসর্বস্ব লুঠ করেছি। আর তোমার সম্পর্কে আমরা কি ভাবছিলাম জানো? তোমার বাবা মাথায় টুপি চাপিয়ে মিলিটারিদের অভ্যর্থনা করতে গেছে। সঙ্গে তুমিও গেছ। সংবর্ধনা সেরে ওদের পথ দেখিয়ে তোমরাই নিয়ে আসবে এখানে। তাই মিলিটারিদের সঙ্গে না পারি, তোমাদের গুলি করে মারার জন্য প্রস্তুত ছিলাম।

নরহরি বলল, এটা ঝগড়া করার সময় নয় রহমত।

জ্যাক মাথা নামাল। মৃদুস্বরে বলল, তোমার ভোলা উচিত নয় রহমত, আমিও বাঙালী।

রহমত হাতের বন্দুক মাটিতে রাখল, বলল, তাহলে আমাকে ডাকাত, লম্পট বলছো কেন, আমিও তো বাঙালী।

রোদের আলোয় উঠোন উদ্ভাসিত। করমচা গাছের পাতা ঝরেছে প্রচুর। পেছনে আমগাছের পাতায় এপ্রিলের বাতাসের শিরশিরানি। ভোরের রোদ একটা নারকেল গাছের ছায়াকে আড়াআড়ি করে শুইয়ে দিয়েছে প্রশস্ত উঠোনটায়। একটা চিলের ছায়া সেই গাছের ছায়াটাকে ঘিরে ঘুরছে। বিবিন্দি গ্রামের আকাশটা আজ ভারী নীল। সূর্য একটা নীল পাতে মোড়া বিরাট চত্বরে গড়াগড়ি খাচ্ছে। উঠোনটায় অনেক লোক। কিন্তু গমগমানি নেই। ঐ নারকেল গাছের ছায়াটার মতই সবাই যেন ছায়া। চিলটা মাথায় উড়ছে। কখন ছোঁ মেরে নেমে আসে, সেই ভয়ে যেন ছায়াগুলো শিহরিত। কিন্তু নিঃশব্দ।

একটানা দমবন্ধ করা নৈঃশব্দ ভাঙলেন প্রথম রাখহরিবাবুই, মিলিটারিরা বাজার পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। ঘাঁটি গেড়েছে পাঁচ মাইল দূরে। রহমতের দল যে-খবর এনেছে তাতে মনে হয়, আজ বা কালই গ্রামে ঢুকবে দল বেঁধে। কালকের মত ফিরে যাবে না। এই অবস্থায় আমরা কি করব, কি আমাদের কর্তব্য, তুমিই বল লতিফ। তুমিই এই গ্রামের মাথা। মাতব্বর ব্যক্তিও। তোমার পরামর্শই আমাদের মানা উচিত।

জ্যাকের বাবা লতিফ সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কথা বললে নিজের মান আর কথার দাম দুটোই বাড়ে। গম্ভীর হয়ে বললেন, আমার কথা কি আপনারা শুনবেন? তাহলে ছোকরাদের কথায় কান দেওয়া উচিত হবে না। এত শক্তিশালী মিলিটারিকে বাধা দিয়ে

আমরা পারব না। ওদের আমরা বাধা দেব না। তার চেয়ে চলুন, ওদের ঘাঁটিতে গিয়ে বলি, আমরা আপনাদের অনুগত প্রজা। পাকিস্তানের ফ্লাগ উড়িয়ে দি ঘরে ঘরে। তারপর ছাগল বকরি মেরে ওদের ঘটা করে খাইয়ে বিদায় দি।'

রহমত একপাশে দাঁড়িয়ে লতিফ সাহেবের কথা শুনছিল, বলল, তাহলেই মিলিটারিরা অত্যাচার না করে চলে যাবে আপনি মনে করেন?

লতিফ সাহেব বললেন, আমি তাই মনে করি।

মেয়েদের ওপর অত্যাচার হবে না?

না।

হিন্দুদের ওপর অত্যাচাব হবে না?

আমরা তাদের বুঝিয়ে বলব, এই গ্রামের হিন্দুরা সাচ্চা পাকিস্তানী। জ্যাক মৃদুস্বরে বলল, বাবা, তুমি কি বলছ, ওরা হিন্দুদের, আওয়ামী লীগারদের ছেড়ে দেবে ভেবেছ? ওদের রাগ সব বাঙালীদের ওপর। আমি ঢাকা থেকে পালিয়ে আসার সময় দেখেছি ওরা হিন্দু মুসলমান, দোষী, নির্দোষ বাছে নি। যাকে সামনে পেয়েছে হত্যা করেছে, মেয়ে ধরে নিয়ে গেছে। বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে।

লতিফ সাহেব দাড়িতে হাত বুলিয়ে মৃদু হাসলেন, তুই যা দেখেছিস তাও ঠিক, আমি যা বলছি তাও ঠিক। তোরা শহরে বসে ঘুমন্ত বাঘকে খুঁচিয়েছিস, বাঘ রেগে গিয়ে তুলকালাম করবে না? কিন্তু গ্রামের মানুষদের ওপর ওদের রাগ নেই। থাকতে পারে না। তবে হ্যাঁ, ওরা রাগবে, যদি এসে ওবা দেখে গ্রামের ঘরে ঘরে এখনো স্বাধীন বাংলার ফ্লাগ উড়ছে। তাই আমি বলি, যুদ্ধ করে যখন পারবে না, তখন বৃথা রক্তপাতে লাভ কি?

উঠোনে নারকেল গাছের ছায়াটা তখন আরো লম্বা হয়ে উঠেছে। একদল কাক জটলা করছে একটা পাকুড় গাছের ডালে বসে। রোদের হলদে লাল আভায় উদ্ভাসিত উঠোনের সবগুলো মুখে কেমন এক অসহায় সন্ত্রাস চাউনি। শীতের বিহানে রোদ আর কুয়াশা মাখা অস্পষ্ট চেহারা মনে হয় সবগুলো মানুষকে জ্যাকের কাছে। এমন কি নিজের বাবাকেও। কেবল বন্দুকসী দর্জির ছেলে নষ্ট স্বভাবের রহমত উত্তরমুখো ঘরের ভিটিতে পা ঠেকিয়ে একটা বাঁকা তলোয়ারের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে।

লতিফ সাহেব তার দিকে তাকালেন, আমার মত আমি বললাম, তোমরা কি বলো?

উঠোনের অনেকগুলো মাথা একসঙ্গে নড়ে উঠল, আপনি যা ভালো বোঝেন তাই করেন। আপনি আমাদের বাঁচান।

রহমত সোজা হয়ে দাঁড়াল। বলল, আমি এখনো মনে করি, শিশু মেয়ে আর বুড়োদের নিয়ে আপনারা এ গ্রাম থেকে সরে যান। মিলিটারি আজ রাতে এখানে আসবেই। আমরা তাদের সঙ্গে পারব না জানি। তবু লড়াই করে মেরে মরব। আর যদি বাঁচতে পারি মুক্তিফৌজের গোপন ঘাঁটি গড়ব।

তুমি মুক্তিফৌজের লোক নাকি? লতিফ সাহেবের কণ্ঠে ঠাট্টা আর তাচ্ছিল্য গোপন রইল না।

কেন, আমি মুক্তিফৌজে যেতে পারি না? রহমতের চোখ আর কণ্ঠ এক সঙ্গে হিংস্র হয়ে উঠল।

উঠোনের সমবেত লোকগুলোর মুখে নিজের প্রতি সমর্থনের ছায়া আরও গাঢ় দেখতে পেলেন লতিফ সাহেব। এপ্রিলের রোদ তেতে উঠতে শুরু করেছে। বললেন, তুমি নিজের কথা একেবারেই ভুলে গেছ রহমত। দেশে থানা পুলিশ আইন-কানুন থাকলে তুমি এমন প্রকাশ্যে এসে গাঁয়ের মাথাওয়ালা লোকদের সঙ্গে কথা বলতে পারতে, না গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার জন্য হুমকি দিতে পারতে!

আমি হুমকি দিই নি, আপনাদের ভালোর জন্য বলছি। রহমত আশ্চর্য ঠাণ্ডা ও নিরুত্তাপ গলায় বলল।

আমাদের ভালোর জন্য বলছ? লতিফ সাহেব উঠোনের লোকগুলোর মুখের দিকে আবার তাকালেন। তার প্রতি সমর্থন ও আস্থার সেই ছায়াটাও দেখলেন বাড়ছে। গলার স্বর আরো চড়িয়ে বললেন, ভুলে যাচ্ছো কেন, তুমি জেলখাটা দাগী আসামী। তোমার হাতে গ্রাম ছেড়ে আমরা চলে যাই, আর তুমি, সব লুটপাট করে সটকে পড়ো! তাই না?

রহমত কথা বলল না। তার ছায়াটা নারকেল গাছের ছায়ার মত আরো অকম্প স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

জ্যাক বাবাকে বাধা দিল, কাল রাতে ও-ই পাটক্ষেতে সবাইকে পাহারা দিয়েছে বাবা। ওর সঙ্গে আরো ক'জন ছিল।

লতিফ সাহেব ধমকে উঠলেন, বিড়ালের কাছে ভাজা মাছ পাহারা! কে ওকে পাহারায় বসিয়েছিল রাত্রে? গ্রামের মেয়েরা ওর পাহারায় নিরাপদ নাকি? বলেই শিবানীর বাবা রাখহরিবাবুর দিকে তেরছা চোখে তাকালেন তিনি।

নারকেল পাতায় হঠাৎ বাতাস লেগে আন্দোলিত হওয়ার মত এক সঙ্গে অনেকগুলো মাথা আন্দোলিত হল, একটা স্‌স্‌ চাপা অস্পষ্ট আওয়াজ গড়িয়ে গেল। লতিফ সাহেব আদেশ দানের ভঙ্গিতে হাত ওঠালেন, আপনারা সকলেই নিজ নিজ ঘরে পাকিস্তান ফ্লাগ উড়িয়ে দিন। শান্ত হয়ে ঘরে থাকুন। মিলিটারি এলে আমিই সকলের আগে যাব তাদের কাছে। আপনাদের কারো ভয় নেই। কিন্তু তার আগে আমার কথা মত কাজ করতে হবে।

রহমতের দিকে তাকালেন লতিফ সাহেব, আর তুমি এবং তোমার দলের কাছে আমার কথা তোমরা গ্রাম ছেড়ে চলে যাও। তোমরা গ্রামে থাকলেই আমাদের বিপদ। মুক্তিবাহিনীর লোক ভেবে মিলিটারি তোমাদের মারতে গিয়ে সারা গ্রামটাই জ্বালিয়ে দিতে পারে। তার চেয়ে তোমরা বরং গ্রাম ছেড়ে চলে যাও।

বেশ, তাই হবে।

এমন নিরুত্তাপ নিরুত্তেজিত ভাবে রহমতকে কখনো চলে যেতে দেখে নি জ্যাক। রহমতের সঙ্গে সঙ্গে যেন তার লম্বমান আড়াআড়ি ছায়াটাও চলে যাচ্ছে। পিঠে বাঁধা রাইফেলটার অস্তিত্ব যেন ভুলে গেছে রহমত। শত হোক একটা অর্ধশিক্ষিত ছিঁচকে ডাকাত, ওর মরাল কারেজ আর কতটুকু হবে, ভাবল জ্যাক।

রোদের ছায়াটা তখন শ্রান্ত হয়ে তার হলদে আঁচল গুটিয়ে নিয়েছে গাছের মগডালে। ঘাসের বুকে, পুকুরের পানিতে, শিবানীদের বাড়ির উঠোনে বৃষ্টির আগে জমাট মেঘের মত ঘন ছায়া। জ্যাককে যেন বাঘে তাড়া করেছে, এমন ভাবে ছুটতে ছুটতে এল সে শিবানীর কাছে। শিবানী দেখল, জ্যাককে একজন বয়স্ক প্রৌঢ় মানুষের মত লাগছে। ভয় পেলে প্রৌঢ় মানুষেরা যা করে, মনের ভাব লুকিয়ে আরো সাহসী হতে চায়, জ্যাকের চেহারায় সেই বুড়োমির ছাপ। শিবানী বলল, দাদা নেই বাড়িতে। বাজারে গেছে। বাবার সঙ্গে গোলার চাল—যা বেঁচেছে সরিয়ে আনতে।

জ্যাক বলল, আমি কেবল নরহরির কাছে আসি নি। তোমার কাছেও এসেছি।

কেন? শিবানীর চোখের তারা দুটো যেন স্থির হয়ে বিঁধে গেল জ্যাকের চোখে।

আজ রাত্রে কি তোমরা বাড়িতে থাকতে চাও।

আর কোথায় থাকবো?

আমি বলছিলাম, তুমি আর খুড়িমা দু'জনেই আমাদের বাড়িতে থাকলে ভাল হত! আজ রাতটা ভালয় ভালয় কেটে গেলেই ভাল।

জ্যাকের চোখ থেকে শিবানীর চোখ সরে গেল। যেন আকাশ থেকে উল্কাপিণ্ড হঠাৎ খসে গেল। মৃদু ফুলকি যেন ছড়িয়ে পড়ল শিবানীর চোখ থেকে জ্যাকের সারা গায়ে, তুমি দাদাকে কথাটা বল, কিংবা বাবাকে। তাঁরা যা ভালো মনে করেন। তবে বাবাকে রেখে মা আমার সঙ্গে যাবেন মনে হয় না।

তাহলে তুমি লায়লির সঙ্গে থাকবে।

তা না হয় হবে, কিন্তু জ্যাক ভাই?

জ্যাকের মনে হল আরেকটা উল্কাপিণ্ড খসবে। শিবানী বলল,—তোমার কি মনে হয় পাকিস্তানী ফ্লাগ ওড়াবার পরও কিছু হবে?

শহরে এবং অনেক গ্রামে হয়েছে। পাঞ্জাবী মিলিটারিদের বিশ্বাস নেই।

ওরা কি চায়? শিবানীর গলাটা হঠাৎ কেঁপে উঠল। জ্যাক চোখ তুলল। উল্কাপিণ্ড খসার আগেই নিভে গেল।

একদল হিংস্র ক্ষুধার্ত নেকড়েকে দেড় হাজার মাইল দূরে এসে খাঁচা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ওরা উপোসী, বন্য এবং বর্বর। আর ওদেরকে বলা হয়েছে, ওদের বর্বরতা অধর্ম নয়, বরং ধর্ম রক্ষার জন্য। তুমি বুঝতে পারছো না, এরপর ওরা কি চায়?

জ্যাক ভাই। বহুদূর থেকে একটা তরল ক্রন্দনের উচ্ছ্বসিত শব্দ এসে যেন ভেঙে পড়ল জ্যাকের কানে। চেয়ে দেখল শিবানী কাঁদছে না। কেমন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এইমাত্র শিবানী এখানে ছিল। রক্তমাংসের মানুষ। এখন যেন সে কাঠখোদাই মূর্তি।

নরহরি এসে দেখল দু'জনকে। দু'টি অপলক চোখ মূর্তি। কাঠখোদাই নয়। মাটি কেটে এইমাত্র যেন ছাঁদ তৈরী। বলল, কি হল তোমাদের?

জ্যাক আর শিবানী আবার মানুষ হল। জ্যাক বলল, কি, গুদামে কিছু পেলে?

না, সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

আজ রাত্রে কি করবে ভেবেছ, এখানেই থাকবে, না আমাদের বাড়িতে?

নরহরি মাথা ঝাঁকাল, না। বাবা বললেন বাড়িতেই থাকবেন। পাকিস্তানী ফ্লাগ উড়িয়ে দিয়েছে, ভয় কি? তোমার বাবা তো তা-ই বললেন। তাছাড়া ঘরে মালপত্র তো কম নেই। সব ফেলে রেখে তোমাদের ওখানে গিয়ে উঠব, মুসলিম লীগের গুণ্ডারা সব লুঠ করে নেবে।

জ্যাক বলল, তা ঠিক। কিন্তু শিবানী আর খুড়িমা, তারাও কি বাড়ি থাকবেন?

নরহরি বলল, মা থাকবেন। শিবানী বরং যাক। লায়লির সঙ্গে গিয়ে থাক।

জ্যাক ঘুরে দাঁড়াল, আমি মাকে গিয়ে বলি। শিবানী, তুমি বেলা থাকতেই বরং চলে এস।

দু'পা এগিয়ে জ্যাক থেমে গেল। নরহরির দিকে চেয়ে বলল, নরহরি, আমার যেন কেন মনে হচ্ছে, আমরা রহমতের দলেই যোগ দিলে ঠিক করতাম।

নরহরি নয়, শিবানী দ্রুত ঘরের ভেতর চলে গেল। নরহরি কথা বলল না। তার চোখ অচল টাকার মত ঘষা এবং অস্পষ্ট।

সেই রাতটা গেল। পরের দিনটাও। কোথাও মিলিটারির আনাগোনা নেই। ঝড় হলে বাতাসে বেগ না থাক, আকাশ তো থমথমে হবে, তাও নয়। ওই-যে একদিন বিরিন্দি বাজার পুড়ল, স্টেনগান আর মর্টারের আওয়াজ, ওই পর্যন্তই যেন সব। লতিফ সাহেব বাজারে আধপোড়া চায়ের স্টলে বসে সকলকে বললেন, আমার পরামর্শের ফল ছাখো। ফ্লাগ ওড়াতেই সব ভয় ঠাণ্ডা। আর ভয় নেই। কেবল লক্ষ্য রাখতে হবে, ওই রহমতের দলের যেন কেউ ফিরে না আসে গ্রামে। তাহলেই বিপদ।

সেদিনটাও গেল। ইস্কুলের মাঠটায় বুড়ো অশথের অনেক পাতা ঝরল মাটিতে। কেউ কুড়িয়ে নেবার নেই। না ছাত্র, না শিক্ষক। সোমবারে বাজারের হাট। বসল না। কেউ এল না। কেবল নারকেল, সুপারি গাছের মাথায় বিবর্ণ চাঁদ তারা মার্কা সবুজ ফ্লাগ উড়তে লাগল।

রাত্রে লায়লির পাশে শুয়ে শিবানী ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, ওরা বোধ হয় গ্রামে আর ফিরবে না?

ওরা কারা ?

ওই যাবা থানা থেকে বন্দুক লুট করেছিল। চাচার কথায় গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে।

রহমতের নামটা ইচ্ছে করেই মুখে আনল না শিবানী। লায়লি টের পেল।

কেন আসবে ? গ্রামের লোক ওদের ভাল চোখে দেখে না। ওরা টের পেয়েছে।

শিবানী বালিশে মুখ গুঁজে বলল, আমার কিন্তু তা মনে হয় না।

তোর কি মনে হয় ?

গ্রামের লোক মিলিটারির ভয়ে ওদের গ্রাম ছাড়তে বলেছে। আসলে মনে মনে ওদের সমর্থন করে।

লায়লি হাসল, আমারও তাই মনে হচ্ছে।

কেন বল্ তো ?

রহমত একটা খারাপ ছেলে। ওর নাম শুনলেও আগে ঘৃণা হত। কিন্তু সেদিন ওর কথা শুনে খুব খারাপ লাগে নি রে। রাইফেল কাঁধে ওকে মনে হচ্ছিল সত্যি সত্যি মুক্তিফৌজ।

শিবানী মৃদু স্বরে বলল, আমার একজন মুক্তিফৌজ দেখার ভারি শখ।

লায়লি হাসল নিঃশব্দে। দু'জনেই হঠাৎ চুপ হয়ে গেল।

সেই রাতেই ঘুম ভাঙল অদ্ভুত একটা আওয়াজে। অন্ধকারে সেই শব্দের বিভীষিকা ভয়ঙ্কর। ঘুম ভেঙে শিবানী কিছুক্ষণ চারদিকের অস্পষ্ট অন্ধকার পরিবেশকে অনুভব করার চেষ্টা করল। লায়লিরও তখন ঘুম ভেঙেছে। বলল, কি হয়েছে ?

লায়লি কাঁপা গলায় বলল, বুঝতে পারছি না। হয়তো মিলিটারি এসেছে।

মি-লি-টা-রি। চারটি শব্দ শিবানীকে নীরব করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। হঠাৎ লকলকে আগুনে পরস্পরের মুখ দেখতে পেল তারা। প্রথমে কালো ধোঁয়া। তারপরই সবেগে আগুনের লেলিহান শিখা উড়ল আকাশে।

আমাদের বাড়ি, আমাদের বাড়ির দিকে আগুন। শিবানীর কণ্ঠে আর্ত অস্ফুট চীৎকার।

লায়লি কাঠ হয়ে রইল। একটি কথাও বলল না। চারদিকে শব্দ, আগুন, চীৎকার ও অন্ধকার মিলে মিশে দু'টি মানুষ যেন সব উপলব্ধির বাইরে চলে গেল।

ভোর হল। আগুন সব অন্ধকার পুড়িয়ে পূবের আকাশটাকে ফর্সা করে দিয়ে গেল। গত রাতের অন্ধকারই যেন পুড়ে ছাই হয়ে ছড়িয়ে আছে সারা গ্রামে। পালিয়ে যারা বাঁশ বনে, পাটক্ষেতে আশ্রয় নিয়েছিল, তারা মরেছে। যারা পালায় নি, তারাও মরেছে। যারা বেঁচে আছে, ভাগ্যের জোরে বেঁচে আছে। দ্বিতীয়বার মৃত্যুর থাবার জন্যে তৈরী হয়ে রয়েছে।

মাকে দেখে চমকে উঠল শিবানী। খয়েরী পাড় শাড়ি পরনে মার। মাথায় সিঁদুর নেই। বাবার কথা মনে করে একটা ভয়ঙ্কর আশঙ্কায় শিবানী ডুকরে কেঁদে উঠতে যাচ্ছিল। পেছনে বাবাকে দেখে উচ্ছ্বসিত কান্না থামাল। বাবার পরনে লুঙ্গি। গায়ে ফতুয়া। মাথায় টুপি। লতিফ চাচার মত গোল করে কাটা টুপি।

ভয়ঙ্কর বিবরণ। সেই বিবরণ বাবা শিবানীকে শোনালেন আস্তে আস্তে। থানার বাড়িতে মিলিটারি উঠেছে। বড় দারোগা মোবারক মিয়ার লাশ ঝুলছে এখন থানার বুড়ো বট গাছে। এক গুলিতেই ফুটো হয়ে গেছে তার কলজে। আওয়ামী লীগের নেতা সোবহান মিয়া বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিলেন। তার ছোট দু'ছেলেকে গুলি করে মেরেছে। অন্তঃসত্ত্বা বৌকে ধরে নিয়ে গেছে মিলিটারিরা। অন্তত দশটি হিন্দু পরিবারের কেউ বেঁচে নেই। সতীশ কবরেজের অমন সুন্দরী মেয়ে এবার স্কুল ফাইনাল দিল, তাকে ধরে নিয়ে গেছে মিলিটারি ক্যাম্পে। আর বাড়ি-যে কত পুড়েছে তার হিসেব নেই। শিবানীদের বাড়ি পুড়ে গেছে। লতিফ মিয়ার বাড়ি অবশ্য বেঁচেছে। গোলা ঘর পুড়ে গেছে। শিবানীর মার কপালের সিঁদুর মুছে, বাবাকে লুঙ্গি আর টুপি পরিয়ে মিলিটারির কাছে মুসলমান পরিচয় দিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে এসেছেন লতিফ মিয়া। শিবানীর মা মাথার সিঁদুর মুছতে চায় নি। তার গালে রাখহরিবাবুর প্রচণ্ড চড় কালশিরা হয়ে ফুটে রয়েছে।

সব কথা শেষ করে শিবানীর বাবা বললেন, আমরা ঠিক করেছি মুসলমান হয়ে যাব মা। তুইও মুসলমান হবি।

শিবানীর মা ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, বর্ডার পেরিয়ে পালানো যায় না?

শিবানী বলল, মুসলমান হলেই কি বাঁচব বাবা, ওরা তো বাঙালী মুসলমানও মারছে।

রাখহরিবাবু বললেন, মারছে। তবে এখন আর মারবে না বলছে। তবে হিন্দু হয়ে আর বাঁচা যাবে না। গ্রামের মৌলবী কাসেম, জামাতে ইসলামীর

নেতা। উনি বলেছেন, হিন্দুরা মুসলমান হয়ে জামাতের মেম্বর হলে আর তাদের ভয় নেই।

শিবানীর মা আবার ফিস্‌ফিসিয়ে বললেন, বর্ডার পেরুনো যায় না।

রাখহরিবাবু হঠাৎ গর্জে উঠলেন—না, যায় না। গেলে ওই সোমত্ত মেয়ে নিয়ে এখানে বসে মুসলমান হই ভাবছো।

শিবানীর ধর্মকর্মে কোনদিনই মতি নেই। আজ হঠাৎ মুসলমান হতে হবে শুনে তার চোখে কেন কে জানে দর দর করে অশ্রু নেমে এল।

রাখহরিবাবু বললেন, কাঁদিস নে। সারাজীবন রক্ষাকালীর পুজো করেছি। কই তিনি তো বিপদে রক্ষে করতে এলেন না। অমন মাটির পুতুলের ধর্মের কথা ভেবে কি লাভ মা?

শিবানী চোখ মুছল। বুঝল, এটা বাবার অভিমান ও রাগের কথা।

ভোরের রোদ চিক চিক করল তার ভেজা চোখে। বলল, লতিফ চাচা বলেছিলেন, পাকিস্তানী ফ্লাগ ওড়ালেই আমরা বাঁচব। কই বাঁচলাম না তো। এখন তুমি বলচ, মুসলমান হলে বাঁচব। তিনিও কি তাই বলছেন?

রাখহরিবাবু ম্লান হাসলেন, তোর লতিফ চাচার কোন দোষ নেই মা। তিনি আমাদের বাঁচানোর জন্য যথেষ্ট করেছেন। এখন দেখছেন উপায় নেই। উপায় নেই দেখেই বলছেন, রাখহরি, কপালে যখন ছিল—মুসলমানই হয়ে যাও। আর তো উপায় দেখছি না। তাছাড়া তোমাদের শাস্ত্রেই বলে সব ধর্ম সমান। আমি বলতে চেয়েছিলাম সব ধর্ম সমান বটে, তবে আমাদের কাছে পরধর্ম ভয়াবহ। কিন্তু আর বলি নি।

শিবানী চোখ আবার কাপড়ের খুঁট মুছল, না বলে ভালোই করেছ,

অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত। কাসেম মৌলভীর বাড়ির প্রাঙ্গণেই জনা পঞ্চাশেক হিন্দু জমায়েত হয়েছে। শিশু বৃদ্ধ যুবক যুবতীর ভীড। দু'জন পাঞ্জাবী সেপাই রাইফেলের বাটে ভর দিয়ে দাঁডিয়ে সব দেখছে। দীক্ষাপত্র হাতে কাসেম মৌলভী দাঁড়িয়ে। তার চোখে সগর্ব উল্লাস। আজ এই কজন হিন্দু নর-নারীকে পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দেবেন তিনি। ঘন ঘন দাড়ি নেড়ে কলেমা পাঠ করছিলেন। তাঁর দলের পাঁচজন যুবক কর্মী, পরনে লুঙ্গি, মাথায় টুপি, হাতে লাঠি নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে। লতিফ সাহেব গম্ভীর মুখে ঘাসে রুমাল বিছিয়ে বসে আছেন। প্রথমেই কলেমা পাঠ করে ধর্মান্তরিত হলেন রাখহরি। নতুন নাম হল, আল্লারাখা। শিবানীর মা কাঁদতে কাঁদতে

দুরূহ আরবী উচ্চারণের কলেমা পাঠ করলেন, না কেবল বিড় বিড় করলেন, কিছুই বোঝা গেল না। ঘোমটা-মুক্ত শিবানীর দিকে চেয়ে হঠাৎ কাসেম মৌলভী কলেমা পড়তে ভুলে গেলেন। বললেন, তোমার তো শাদী হয় নি না?

শিবানী নিরুত্তর। রাখহরি বললেন—না।

কাসেম মৌলভী অভ্যেসবশে দাড়িতে হাত বুলোলেন, তাহলে তো কেবল মুসলমান হলে এর চলবে না। সঙ্গে সঙ্গে একজন মুসলমানের সঙ্গে এর শাদী দিয়ে দিতে হবে। তা না হলে ঈমান কমজোর থেকে যাবে।

রাখহরি বিস্ময়ে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে বললেন, বিয়ে? এখনই বিয়ে। ওই যে ওর বড় ভাই নরহরি। ওরই এখনো বিয়ে হয় নি।

কাসেম মৌলভী হাসলেন, ব্যাটাছেলের কথা আলাদা।

কিন্তু এখন ওর পাত্র পাবো কোথায়?

কাসেম মৌলভী অভয় দিলেন, আপনাকে ভাবতে হবে না। পবিত্র দীন ইসলামের কোলে যখন আপনার মেয়ে ঠাঁই নিয়েছে, তখন ওর পাত্রের অভাব হবে না। ওই-যে দেখছেন রুস্তম গাজিকে। জামাতের নিষ্ঠাবান কর্মী। বাজারে চায়ের দোকান আছে। লেখাপড়া জানে না। তাতে কি। ঈমান বড় মজবুত: আপনার মেয়ে সুখে থাকবে।

লতিফ সাহেব যেন বাধ্য হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। মিনমিনে গলায় বললেন, আপনি কি বলছেন মৌলভী ভাই। আরে শিবানী যে স্কুল ফাইনাল পাশ। রুস্তম ক'অক্ষর জানে না। তার ওপর রুস্তমের বয়স হবে দ্বিগুণ।

কাসেম মৌলভী হাসলেন, আপনি কেবল বয়স আর লেখাপড়াটাই দেখলেন, ওর ঈমানের জোরটা দেখলেন না। দশ মাইল দূর থেকে মিলিটারিকে পথ দেখিয়ে এই গ্রামে কে এনেছে? ওই রুস্তম গাজি। শিবানীর ওপর গ্রামের কারো দাবি থাকলে ওর দাবিই তাই প্রথম। লতিফ সাহেব ঢোক গিলে বললেন, দা-বি?

হ্যাঁ, দাবি। বলেই কাসেম মৌলভী হাঁক পাড়লেন, কই রুস্তম, এদিকে এগিয়ে এস।

কাঁচাপাকা একমুখ দাড়ি। থুতনি বের করা একটা সরু ছুঁচলো মুখ। নাকের ফানা বড়। চোখ ছোট। কালো, কর্কশ একটি মুখ লুঙ্গিতে নাক ঝেড়ে এগিয়ে গেল।

শিবানী একবার তার দিকে অপাঙ্গে তাকাল। তারপরই একটা অস্ফুট

গোঙানির মত শব্দ বেরুল তার মুখ থেকে—মা-মা-গো।

রাখহরিবাবু হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন, না, না, না। আমি মুসলমান হই নি। হব না।

রাখহরিবাবুর চীৎকারের রেশ তখনো চারদিকে যেন ঢেউ তুলে ভেসে বেড়াচ্ছিল। শিবানীর মা মাটিতে লুটিয়ে কাঁদছেন। কেবল শিবানীরই শোক নেই। সব শোক আর সহ্যের ঊর্ধ্বে শিবানী যেন এইমাত্র একটা ঝরাপাতা হয়ে মাটিতে শেষ শয্যা নিতে নেমে যাচ্ছে। তার যোগ নেই। না গাছের সঙ্গে, না মাটির সঙ্গে। ঝরা পাতার মতই তার কোন অনুভূতি নেই।

কিন্তু তখনই কানে বাজল একটি শব্দ। নাকে এল বারুদের গন্ধ। কেউ রাইফেলের ট্রিগার টিপল বুঝি। মানুষের অন্তিম আর্তনাদও এমন সকরুণ হয়।

লতিফ সাহেবের গলা শোনা গেল, এ কি জ্যাক, এ কি রহমত তুমি? সৈন্য দুটোকে তোমরাই মারলে? এ কি— এ কি আবার রাইফেল তুলছো?

চকিতে শিবানী মাথা তুলল। হ্যাঁ, জ্যাক এবং রহমত, আরো দু'চারজন। কাসেম মৌলভীর ভারী শরীরটাকেও সে দুমড়ে মুচড়ে মাটিতে পড়তে দেখল। লতিফ সাহেব তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। শিবানীকে, শিবানীর বাবা ও মাকে জ্যাকই দ্রুত টেনে দাঁড় করাল। বলল, কুইক শিবানী, এখনই পালাতে হবে। মিলিটারিরা খবর পেয়ে যাবে এই অপারেশনের। এখনই আমাদের ঘিরে ফেলবে। তার আগেই পালাই চল।

রাখহরিবাবু শূন্য দৃষ্টিতে তাকালেন, কিন্তু কোথায় পালাব? আর আমি —আমি-যে মুসলমান।

রহমত চীৎকার করে উঠল—কে বলছে আপনি মুসলমান। জোর করে মুসলমান করলেই মুসলমান হয় নাকি। যারা এভাবে অন্যকে মুসলমান করে, তারা নিজেরাও মুসলমান নয়, শয়তান।

জ্যাক তাড়া দিল, আঃ, বক্তৃতা নয়, পালাও।

নরহরি বলল আর তুমি?

জ্যাক বলল, আমিও পালাব। তবে এখন নয়। সেকেণ্ড অপারেশনের পর। আরো দুটো দালাল খতম করে। কুইক রহমত, কুইক্ শিবানী। জ্যাক ও তার দলবল দ্রুত পেছনে মিলিয়ে গেল। সামনে শিবানীর বাবা ও মা, পেছনে নরহরি। তারও পেছনে শিবানী ও রহমত। রহমত বলল,

ওই-যে সামনে বন। ওই বনে গিয়ে লুকোতে হবে। তারপর রাত্রে নদীতে গিয়ে ছোট নৌকা করে চেষ্টা করে দেখতে হবে ত্রিপুরা বর্ডারে যাওয়া যাবে কিনা।

শিবানী ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছিল। খপ করে তার হাত ধরে ফেলল রহমত, কি হল শিবানী!

শিবানী সেই নির্জন বনপ্রান্তে দাঁড়িয়ে হঠাৎ উচ্ছসিত স্বরে কেঁদে উঠল, রুস্তম গাজিকে দেখেও যে-কান্না সে কাঁদে নি সেই কান্না,—আমি যাব না, কিছুতে যাব না, কিছুতেই আমাকে তোমরা নিয়ে যেতে পারবে না।

শিবানী নিজেই দেখল, তার চোখের পানি বৃষ্টির ফোঁটার মত বড়, স্বচ্ছ এবং নির্ভার।

বেশ কাছ থেকেই আবার তার কানে রাইফেলের শব্দ ভেসে এল। এবার একটা নয়, অনেক এবং একটানা।

একুশের গল্প

জহির রায়হান

তপুকে আবার ফিরে পাবো, একথা ভুলেও ভাবিনি কোনদিন। তবু সে আবার ফিরে এসেছে আমাদের মাঝে। ভাবতে অবাক লাগে চার বছর আগে যাকে হাইকোর্টের মোড়ে শেষবারের মত দেখেছিলাম, যাকে জীবনে আর দেখবো বলে স্বপ্নেও কল্পনা করিনি—সেই তপু ফিরে এসেছে। ও ফিরে আসার পর থেকে আমরা সবাই যেন কেমন একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। রাতে ভালো ঘুম হয় না। যদিও একটু আধটু তন্দ্রা আসে, তবু অন্ধকারে হঠাৎ ওর দিকে চোখ পড়লে গা হাত পা শিউরে ওঠে, ভয়ে জড়সড় হয়ে যাই। লেপের নীচে দেহটা ঠক্ঠক্ করে কাঁপে।

দিনের বেলা ওকে ঘিরে আমরা ছোটখাটো জটলা পাকাই।

খবর পেয়ে অনেকেই দেখতে আসে ওকে। অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে ওরা। আমরা যে অবাক হই না তা নয়। আমাদের চোখেও বিস্ময় জাগে। দু' বছর ও আমাদের সাথে ছিলো। ওর শ্বাসপ্রশ্বাসের খবরও আমরা রাখতাম। সত্যি কি অবাক কাণ্ড দেখতো, কে বলবে যে এ তপু। ওকে চেনাই যায় না। ওর মাকে ডাকো, আমি হলপ করে বলতে পারি, ওর মা-ও চিনতে পারবে না ওকে।

'চিনবে কি করে?' জটলার একপাশ থেকে রাহাত বিজ্ঞের মত বলে, 'চেনার কোন উপায় থাকলে তো চিনবে। এ অবস্থায় কেউ কাউকে চিনতে পারে না। বলে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

আমরাও কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়ি ক্ষণেকের জন্য।

অনেক কষ্টে ঠিকানা জোগাড় করে কাল সকালে রাহাতকে পাঠিয়েছিলাম, তপুর মা আর বউকে খবর দেবার জন্য।

সারাদিন এখানে সেখানে পই পই করে ঘুরে বিকেলে যখন রাহাত ফিরে এসে খবর দিলো, 'ওদের কাউকে পাওয়া যায় নি।' তখন রীতিমত ভাবনায় পড়লাম আমরা। 'এখন কি করা যায় বলতো, ওদের একজনকেও পাওয়া

গেল না ?' আমি চোখ তুলে তাকালাম রাহাতের দিকে।

বিছানার ওপর ধপাস করে বসে পড়ে রাহাত বললো, 'ওর মা মারা গেছে।'

'মারা গেছে ? আহা সেবার এখানে গড়াগড়ি দিয়ে কি কান্নাটাই না তপুর জন্যে কেঁদেছিলেন তিনি। ওঁর কান্না দেখে আমার নিজের চোখেই পানি এসে গিয়েছিলো।'

'বউটার খবর ?'

'ওর কথা বলোনা আর।' রাহাত মুখ বাঁকালো। 'অন্য আর এক জায়গায় বিয়ে করেছে।' সেকি! এর মধ্যেই বিয়ে করে ফেললো মেয়েটা ? তপু ওকে কত ভালবাসতো।' নাজীম বিড় বিড় করে উঠলো চাপা স্বরে।

সান্থ বললো, 'বিয়ে করবে না তো কি সারা জীবন বিধবা হয়ে থাকবে নাকি মেয়েটা।' বলে তপুর দিকে তাকালো সান্থ।

আমরাও দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলাম ওর ওপর।

সত্যি, কে বলবে এ চার বছব আগেকার সেই তপু, যার মুখে এক ঝলক হাসি আঠাব মত লেগে থাকতো সব সময়।

কি হাসতেই না পারতো তপুটা। হাসি দিয়ে ঘরটাকে ভরিয়ে রাখতো সে। সে হাসি কোথায় গেল তপুর ? আজ তার দিকে তাকাতে ভয়ে আমার রক্ত হিম হয়ে আসে কেন ?

দু'বছর সে আমাদের সাথে ছিলো।

আমরা ছিলাম তিনজন।

আমি, তপু আর রাহাত।

তপু ছিলো আমাদের মাঝে সবার চাইতে বয়সে ছোট। কিন্তু বয়সে ছোট হলে কি হবে, ও-ই ছিলো একমাত্র বিবাহিত।

কলেজে ভর্তি হবার বছর খানেক পরে রেণুকে বিয়ে করে তপু। সম্পর্কে মেয়েটা আত্মীয়া হতো ওর। দোহারা গড়ন, ছিপছিপে কটি, আপেল রঙের মেয়েটা প্রায়ই ওর সাথে দেখা করতে আসতো এখানে।

ও এলে আমরা চাঁদা তুলে চা আর মিষ্টি এনে খেতাম। আর গল্প গুজবে মেতে উঠতাম রীতিমত। তপু ছিলো গল্পের রাজা। যেমন হাসতে পারতো ছেলেটা, তেমনি গল্প করার ব্যাপারেও ছিল ওস্তাদ।

যখন ও গল্প করতে শুরু করতো, তখন আর কাউকে কথা বলার সুযোগ দিতো না। 'সেই যে লোকটার কথা তোমাদের বলছিলাম না সেদিন।

সেই হোঁৎকা মোটা লোকটা, ক্যাপিটালে যার সাথে আলাপ হয়েছিল, ওই যে, লোকটা বলছিলো 'সে বার্নাডশ' হবে, পরশু রাতে মারা গেছে একটা ছ্যাকরা গাড়ীর তলায় পড়ে।...আর সেই মেয়েটা, যে ওকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছিলো...ও মারা যাবার পরের দিন এক বিলেতী সাহেবের সাথে পালিয়ে গেছে...রুণী মেয়েটার খবর জানতো! সে কি রুণীকে চিনতে পারছো না? শহরের সেরা নাচিয়ে ছিলো, আজকাল অবশ্য রাজনীতি করছে। সেদিন দেখা হল রাস্তায়। আগে তো পাটকাঠি ছিল। এখন বেশ মোটাসোটা হয়েছে। দেখা হতেই রেঁস্তোরায় নিয়ে খাওয়ালো। বিয়ে করেছি শুনে জিজ্ঞেস করলো, বউ দেখতে কেমন।'

'হয়েছে, এবার তুমি এসো। উঃ, কথা বলতে শুরু করলে যেন আর ফুরোতে চায় না', বাহাত থামিয়ে দিতে চেষ্টা করতো ওকে।

রেণু বলতো, 'আর বলবেন না, এত বক্‌তে পারে—।'

বলে বিরক্তিতে না লজ্জায় লাল হয়ে উঠতো সে।

তবু থামতো না তপু। এক গাল হাসি ছড়িয়ে আবার পরম্পরাহীন কথার তুবড়ি ছোটাত সে, থাকগে অন্যের কথা যখন তোমরা শুনতে চাও না নিজের কথাই বলি। ভাবছি, ডাক্তারিটা পাশ করতে পারলে এ শহরে আর থাকবো না, গাঁয়ে চলে যাবো। ছোট্ট একটা ঘর বাঁধবো সেখানে। আর, তোমরা দেখো, আমার ঘরে কোন জাঁকজমক থাকবে না। একেবারে সাধারণ, হাঁ একটা ছোট্ট ডিসপেনসারী, আর কিছু না।'

মাঝে মাঝে এমনি স্বপ্ন দেখায় অভ্যস্ত ছিল তপু।

এককালে মিলিটারীতে যাবার সখ ছিল ওর।

কিন্তু বরাত মন্দ। ছিলো জন্ম খোঁড়া। ডান পা থেকে বাঁ পাটা ইঞ্চি দু'য়েক ছোট ছিলো ওর। তবে বাঁ জুতোর হিলটা একটু উঁচু করে তৈরী করায় দূর থেকে ওর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলাটা চোখে পড়তো না সবার।

আমাদের জীবনটা ছিলো অনেকটা যান্ত্রিক।

কাক ডাকা ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠতাম আমরা। তপু উঠতো সবার আগে। ও-জাগাতো আমাদের দু'জনাকে, -'ওঠো, ভোর হয়ে গেছে দেখছো না? অমন মোষের মতো ঘুমোচ্ছ কেন, ওঠো।' গায়ের ওপর থেকে লেপটা টেনে ফেলে দিয়ে জোর করে আমাদের ঘুম ভাঙ্গাতো তপু। মাথার কাছের জানালাটা খুলে দিয়ে বলতো, 'দেখ, বাইরে কেমন মিষ্টি রোদ উঠেছে।

আর ঘুমিয়ো না, ওঠো।

আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়ে, নিজ হাতে চা তৈরী করতো তপু।

চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে আমরা বই খুলে বসতাম। তারপর দশটা নাগাদ স্নানাহার সেরে ক্লাশে যেতাম আমরা।

বিকেলটা কাটতো বেশ আমোদ ফূর্তিতে। কোনদিন ইসকাটনে বেড়াতে যেতাম আমরা। কোনদিন বুড়িগঙ্গার ওপরে। আর যেদিন রেণু আমাদের সাথে থাকতো, সেদিন আজিমপুরার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দূর গাঁয়ের ভেতর হারিয়ে যেতাম আমরা।

রেণু মাঝে মাঝে আমাদের জন্য ডালমুট ভেজে আনতো বাসা থেকে।

গেঁয়ো পথে হাঁটতে হাঁটতে মুড়মুড় করে ডালমুট চিবোতাম আমরা।

তপু বলতো, 'দেখো রাহাত, আমার মাঝে কি মনে হয় জান?'

'কি?'

'এই যে আঁকা বাঁকা লালমাটির পথ, এ পথের যদি শেষ না হতো কোনদিন। অনন্তকাল ধরে যদি এমনি চলতে পারতাম আমরা।'

'একি, তুমি আবার কবি হলে কবে থেকে?' ভ্রূ জোড়া কুঁচকে হঠাৎ প্রশ্ন করতো রাহাত।

'না না কবি হতে যাব কেন।' ইতস্ততঃ করে বলতো তপু। 'তবু কেন যেন মনে হয়…।'

স্বপ্নালু চোখে স্বপ্ন নাবতো তার।

আমরা ছিলাম তিনজন।

আমি, তপু আর রাহাত।

দিনগুলো বেশ কাটছিল আমাদের। কিন্তু অকস্মাৎ ছেদ পড়লো।

হোস্টেলের বাইরে, সবুজ ছড়ান মাঠটাতে অগুণতি লোকের ভীড় জমেছিলো সেদিন। ভোর হতে ক্রুদ্ধ ছেলেবুড়োরা এসে জমায়েত হয়েছিলো সেখানে। কারো হাতে প্ল্যাকার্ড, কারে হাতে শ্লোগান দেবার চুঙ্গো, আবাব কারো হাতে লম্বা লাঠিটায় ঝোলান কয়েকটা রক্তাক্ত জামা। তর্জনী দিয়ে ওরা জামাগুলো দেখাচ্ছিলো, আর শুকনো ঠোঁট নেড়ে নেড়ে এলোমেলো কি যেন বলছিলো নিজেদের মধ্যে।

তপু হাত ধরে টান দিলো আমার, 'এস'।

'কোথায়?'

'কেন, ওদের সাথে।'

চেয়ে দেখি, সমুদ্রগভীর জনতা ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছে।

'এসো।'

'চলো।'

আমরা মিছিলে পা বাড়ালাম।

একটু পরে পেছন ফিরে দেখি, রেণু হাঁপাতে হাঁপাতে আমাদের দিকে ছুটে আসছে।

যা ভেবেছিলাম, দৌড়ে এসে তপুর হাত চেপে ধরলো রেণু। 'কোথায় যাচ্ছ তুমি। বাড়ি চলো।'

'পাগল নাকি' তপু হাতটা ছাড়িয়ে নিলো। তারপর বললো 'তুমিও চলো না আমাদের সাথে।'

'না, আমি যাবো না, বাড়ি চলো।' রেণু আবার হাত ধরলো ওর। 'কি বাজে বকছেন।' রাহাত রেগে উঠলো এবার। 'বাড়ি যেতে হয় আপনি যান। ও যাবে না।' মুখটা ঘুরিয়ে রাহাতের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একপলক তাকালো রেণু। তারপর কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, 'দোহাই তোমার বাড়ি চলো। মা কাঁদছেন।'

'বললাম তো যেতে পারবো না, যাও।' হাতটা আবার ছাড়িয়ে নিলে তপু।

রেণুর করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া হলো। বললাম, 'কি ব্যাপার আপনি এমন করছেন কেন, ভয়ের কিছু নেই, আপনি বাড়ী যান।'

কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে টলটলে চোখ নিয়ে ফিরে গেলো রেণু।

মিছিলটা তখন মেডিকেলের গেট পেরিয়ে কার্জন হলের কাছাকাছি এসে গেছে।

তিনজন আমরা পাশাপাশি হাঁটছিলাম।

রাহাত শ্লোগান দিচ্ছিলো।

আর তপুর হাতে ছিলো একটি মস্ত প্ল্যাকার্ড তার ওপর লাল কালিতে লেখা ছিলো, 'রাষ্ট্রভাষা বাঙলা চাই।'

মিছিলটা হাইকোর্টের মোড়ে পৌঁছুতে অকস্মাৎ আমাদের সামনের লোকগুলো চিৎকার করে পালাতে লাগলো চারপাশে। ব্যাপার কি বুঝবার আগেই চেয়ে দেখি, প্ল্যাকার্ডসহ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে তপু। কপালের ঠিক

মাঝখানটায় গোল একটা গর্ত। আর সে গর্ত দিয়ে নির্ঝরের মত রক্ত ঝরছে তার।

'তপু' রাহাত আর্তনাদ করে উঠলো।

আমি তখন বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে ছিলাম।

দুজন মিলিটারী ছুটে এসে তপুর মৃতদেহটা তুলে নিয়ে গেলো আমাদের সামনে থেকে। আমরা এতটুকুও নড়লাম না, বাধা দিতে পারলাম না। দেহটা যেন বরফের মত জমে গিয়েছিলো, তারপর আমিও ফিরে আসতে আসতে চিৎকার করে উঠলাম 'রাহাত পালাও।'

'কোথায় ?' হতবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো রাহাত।

তারপর উভয়েই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিলাম আমরা ইউনিভারসিটির দিকে। সে রাতে, তপুর মা এসে গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদেছিলো এখানে। রেণুও এসে-ছিলো। পলকহীন চোখজোড়া দিয়ে অশ্রুর ফোয়ারা নেমেছিলো তার। কিন্তু আমাদেব দিকে একবারও তাকায় নি সে। একটা কথাও আমাদের সাথে বলে নি রেণু। বাহাত শুধু আমার কানে কানে ফিস ফিস করে বলেছিলো, 'তপু না মবে আমি মরলেই ভালো হতো। কি অবাক কাণ্ড দেখতো, পাশাপাশি ছিলাম আমরা। অথচ আমাদের কিছু হলো না, গুলি লাগলো কিনা এসে তপুর কপালে। কি অবাক কাণ্ড দেখতো।'

তারপব চারটে বছর কেটে গেছে। চার বছব পর তপুকে ফিরে পাবো, একথা ভুলেও ভাবিনি কোনদিন।

তবু মারা যাবার পর রেণু এসে একদিন মালপত্রগুলো সব নিয়ে গেলো ওর। দুটো স্যুটকেস, একটা বইয়ের ট্রাঙ্ক, আর একটা বেডিং। সেদিনও মুখ ভার করেছিলো রেণু।

কথা বলেনি আমাদের সাথে। শুধু রাহাতের দিকে এক পলক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলো, 'ওর একটা গরম কোট ছিলো না, কোটটা কোথায় ?'

'ও, ওটা আমার স্যুটকেসে। ধীরে কোটটা বের করে দিয়েছিলো রাহাত।

এর পর দিন কয়েক তপুর সিটটা খালি পড়ে ছিলো।

মাঝে মাঝে রাত শেষ হয়ে এলে আমাদের মনে হতো, কে যেন গায়ে হাত দিয়ে ডাকছে আমাদের।

'ওঠো আর ঘুমিও না, ওঠো।'

চোখ মেলে কাউকে দেখতে পেতাম না, শুধু ওর শূন্য বিছানার দিকে

তাকিয়ে মনটা ব্যথায় ভরে উঠতো। তারপর একদিন তপুর সিটে নতুন ছেলে এলো একটা। সে ছেলেটা বছর তিনেক ছিলো।

তারপর এলো আর একজন। আমাদের নতুন রুমমেট। বেশ হাসিখুশী ভরা মুখ।

সেদিন সকালে বিছানায় বসে বসে 'এনাটমি'র পাতা ওলটাচ্ছিলো সে। তার চৌকির নীচে একটা ঝুড়িতে রাখা 'স্কেলিটনে'র 'স্কাল'টা বের করে দেখছিলো আর বইয়ের সাথে মিলিয়ে পড়ছিলো সে। তারপর এক সময় হঠাৎ রাহাতের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'রাহাত সাহেব, একটু দেখুন তো, আমার 'স্কালে'র কপালের মাঝখানটায় একটা গর্ত কেন?'

'কি বললে?' চমকে উঠে উভয়েই তাকালো ওর দিকে।

রাহাত উঠে গিয়ে 'স্কাল'টা তুলে নিলো হাতে। ঝুঁকে পড়ে সে দেখতে লাগলো অবাক হয়ে। হাঁ, কপালের মাঝখানটায় গোল একটা ফুটো, রাহাত তাকালো আমার দিকে, ওর চোখের ভাষা বুঝতে ভুল হলো না আমার। বিড়বিড করে বললাম, 'বাঁ পায়ের হাড়টা দু'ইঞ্চি ছোট ছিলো ওর।'

কথাটা শেষ না হতেই ঝুড়ি থেকে হাডগুলো তুলে নিলো রাহাত। হাতজোড়া ঠকঠক করে কাঁপছিলো ওর। একটু পরে উত্তেজিত গলায় চিৎকার করে বললো, 'বাঁ পায়ের টিবিয়া ফেবুলাটা দু'ইঞ্চি ছোট। দেখো, দেখো।'

উত্তেজনায় আমিও কাঁপছিলাম।

ক্ষণকাল পরে 'স্কাল'টা দুহাতে তুলে ধরে রাহাত বললো 'তপু'। বলতে গিয়ে গলাটা ধরে এলো ওর।

সাদা কফিন

বিপ্রদাশ বড়ুয়া

এতক্ষণ নীরব নিস্তব্ধ ছিল সমগ্র শহর। রাস্তায় রাস্তায় প্রতিরোধ তৈরী করা হয়েছে বলে গাড়ি চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ। খুব কচিৎ একটা সাইকেল-রিক্সা ঝড়ের বেগে ছুটে হয়তো বেরিয়ে গেল, শুধু বাতাস কাটা আর পীচের সঙ্গে চাকা ঘর্ষণের শব্দ, হয়তো রিক্সায় কিছু মালপত্র বোঝাই আছে কিংবা খালি, অথচ কখনো একটা গাড়ির দেখা নেই। মাইল, আধ-মাইল দূরে দূরে ইট, ড্রাম, ওল্টানো গাড়ি ইত্যাদি হাতের কাছে যা পাওয়া গেছে তাতেই রাস্তায় প্রতিরোধ সৃষ্টি করা হয়েছে। ছায়া ছায়া রাস্তা, বড়ো বড়ো মেহগিনি ও শিশু গাছ রাস্তাগুলোকে আরো নির্জন ও নিবিড় করে তুলেছে। জন-মানবের গন্ধ নেই রাস্তায়। মনে হঠাৎ এমনও অবান্তর প্রশ্ন জাগে, অবরোধ টিকবে তো? দূর থেকে সেই অবরোধ পাহারা দিচ্ছে মুক্তি-বাহিনী। · বারুদের মুখে আগুন লাগল বলে। পরিবেশটা তেমনি বিস্ফোরণমুখী।

জাতীয় সঙ্গীত না বাজিয়ে বেতারের তৃতীয় অধিবেশন বন্ধ হয়ে গেছে।

আমি ভয়ার্ত মনে হন্সে হয়ে একটা রিক্সার কথা ভাবছি। গাড়ি তো পাওয়ার সুযোগ নেই, বাধা ডিঙিয়ে তবু কোনোমতে রিক্সাকে টেনে নিয়ে যাওয়া যাবে।—আমাকে অনেক দূরে, মতিঝিল পেরিয়ে বাসাবো অবধি যেতে হবে। অদ্দূর হেঁটে যাওয়া, কিংবা হেঁটে যেতে ভয় করছে।

লোকগুলো সব মরে গেল নাকি এক নিমেষে!

আমি অনবরত চিন্তা করছি হেঁটে যাওয়া যাবে কিনা। বন্ধু-বান্ধব সবাই আজ গেল কোথায়? প্রেস-ক্লাব কি বন্ধ? সেখানে যাবো কিনা আবার দ্রুত ভেবে নিলাম। কয়েক মিনিট। কিন্তু যেন কয়েক লক্ষ সেকেণ্ড ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত। এই ভাবে যেন অনন্ত সময়ের হনন চলল, রাস্তার নিস্তব্ধতায়, ফুটো ফুটো আকাশে, নিরিবিলি এবং নীরন্ধ্র পত্রগুচ্ছে, রাস্তার অন্ধকার

লাইটপোস্টে, গির্জার চুড়ার ক্রুশে রাত্রিপাত হচ্ছে প্রবল বেগে; রাত্রিপাত হচ্ছে নিষ্ঠুর এবং চতুর শত্রুর মত নিরবচ্ছিন্ন এক যোগসাজসে।

গত দু'দিন কাজের চাপে বাসামুখো হতে পারি নি আমি, অফিসে রাত কাটিয়েছি, আজ একটা কিছু ঘটতে চলেছে এরকম ইঙ্গিত বেতার অনুষ্ঠানের সমাপ্তিতে আছে। এখন সেই নানান চিন্তার পর্বত-প্রমাণ এক বোঝা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাসামুখো চলছি, সারি সারি ইমারত ফেলে, বন্ধ রেস্তোরাঁ, হ্যাপি মটরিং ছবি, বাসে ওঠার কিউ—হাই কোর্ট ভবনকে মনে হচ্ছে রূপ-কথার হাজার-দুয়ারী রহস্যময় প্রাসাদ।

সহসা একটা সাইকেল-রিক্সা দ্রুতবেগে আমাকে কেটে চলে যাচ্ছে দেখে আমি চীৎকার করে তার পেছনে ধাওয়া করলাম। সে আরো বেগে, আরো দ্রুত ছুটল। কিন্তু আমায়-যে তাকে ধরতেই হবে! এভাবে আমাকে পাগলের মত ছুটতে দেখে সে কি ভেবে—হয়তো কিছু না ভেবেই—থামল। খবর: শহরে সৈন্য নেমেছে সাব, সরে পড়ুন, এক্ষুনি এদিকে এসে পড়বে। তাদের আছে কামান, বন্দুক, ট্যাঙ্ক, আরো কত কি

: বল কি? সৈন্য নেমেছে? কোথায়? কতদূরে?—আমার মাথা গুলিয়ে গেল, এ কি হ'ল, এ যে আমি ভাবতে—তুমি কোনদিকে যাবে ভাই, জলদি আমাকে নিয়ে চল।

: পারব না সাব। আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে, পথে পথে বাধা, আপনাকে নিয়ে যাব কী করে। না, আমি নিতে পারব না—হাঁপাতে হাঁপাতে রিক্সাঅলা কথাগুলো বলে ফেলল!

বললাম: তুমি যেখানে যাও আমাকে নিয়ে চল, তোমার সঙ্গেই থাকব আমি। বাধা ডিঙিয়ে দু'জনে রিক্সা টেনে নেব।—তোপখানা সড়ক, মতিঝিল, কমলাপুর ছাড়িয়ে বাসাবো···

এত সব কথা সংক্ষিপ্ততম সময়েই শেষ হয়েছে। রিক্সাঅলা আমাকে নাছোড়বান্দা দেখে কিংবা করুণাবশতই হোক তুলে নিল; তখন আশ্চর্য তেজোদীপ্ত সেই অচেনা রিক্সাঅলার গামছাবাঁধা মাথাটি আমার সামনে এক দৃপ্ত বিজয়ীর মতো উন্নত এবং উদ্যত। কিন্তু কদ্দুর গিয়েই বাধা। আর পেছনে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার দিকে গাড়ির ঘর্ঘর শব্দ রাত্রির নিস্তব্ধতাকে খান্ খান্ করে দিল। তক্ষুনি সে রিক্সা ফেলে দৌড় দিল, আমার সঙ্গে একটা কথা বলা কিংবা একবার ফিরেও তাকাল না। নিশ্চল রিক্সা, অপসৃত

রিক্সাঅলা, ভৌতিক শহর, সৈন্যগণ, নির্নিমেষে দ্রষ্টব্য অট্টালিকা—প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাজ করল। আমিও দৌড়ে প্রেস-ক্লাবের চত্বরে আশ্রয় নিলাম। ভরসা, সেখানে যদি কাউকে পাই! কিন্তু কোনো সাড়া নেই। কিছুক্ষণ পর অনেক খোঁজাখুঁজিতে চেনা দারোয়ানকে পাওয়া গেল, কিন্তু কোনো খবরই সে দিতে পারল না, শুধু এইটুকু জিজ্ঞেস করল: আপনি কোথায় যাবেন? এখন তো কেউ নেই। দরজা খুলে দেব? বরং পালিয়ে যান · ।

কেউ-ই নেই! কিন্তু যাব কোথায়? গাড়ির অর্থাৎ সামরিক ট্রাক ইত্যাদির শব্দ একদম এগিয়ে আসছে, ঐ বুঝি দেখা যায়! যদি আসেই—এখানে আশ্রয় নিলাম, পরে যা হবার হবে, আপাতত এখান থেকে নড়ছি না—বুকের ভেতর দুরু দুরু কম্পমান একটি বল যেন অবিশ্রাম লাফাচ্ছে, অবিরাম একটি নৌকা ঢেউ-এর আঘাতে কাঁপছে, কাঁপছে। আমার কি যেন হয়ে গেল, দারোয়ান দরজা খুলে দিয়ে কি যে বলে গেল কিছুই শুনি নি। আমার সামনে-পেছনে একটি মাত্র শব্দ শুনছি—আশ্রয়।

প্রেস-ক্লাবে সাময়িক আশ্রয় নেয়া ভাল মনে করলাম, রাস্তায় যে-কোনো সময় কিছু একটা ঘটে যাবে বলে আমার মন বারবার বলছে, তাই তার চেয়ে মাথা গুঁজবার একটু আশ্রয় চাই। আমি অন্ধকার দরজার দিকে তাকিয়ে কিছু ভাববার আগেই দুটো মিলিটারি কনভয় শব্দ করে প্রেস-ক্লাব মুখো হয়ে থেমে গেল। আমি একটু মাত্র দেরি না করে ঢুকে দরজা বন্ধ না করে সোজা দোতলায় উঠে গেলাম। আমি জানলার ফাঁক দিয়ে হেড-লাইটের তীব্র আলোতে রাস্তা দেখলাম। তোপখানা সড়ক। ধূ ধূ এবং ম্রিয়মাণ।

কনভয় ইউসিসের সামনে। সমস্ত এলাকাটা অন্ধকার, শুধু ইউসিস আর বি. আই. এস -এর কয়েকটি আলো ছাড়া।

খট্ খট্ শব্দে কয়েকজন ক্রূর সৈন্য নামল। হাতে তাদের স্বয়ংক্রিয় মেশিনগান। ওরা খানিক ভেবে ইউসিস থেকে একটা তার নিয়ে রাস্তার লাইট পোস্টের তারের সঙ্গে যোগ করে দিল। সমগ্র রাস্তা আলোকিত হয়ে গেল।

সৈন্যদের গতিবিধি সন্ধানী। প্রেস-ক্লাবের দিকেই তাদের দৃষ্টি। তারপর দুটো বড়ো কনভয়। ট্যাঙ্ক…

বাপ্স্। এইবার সমস্ত গুলিয়ে দেবে। সমস্তই। আমি জানালা ছেড়ে ঘরের ভেতর চললাম, বিপদ ঘনিয়ে আসল ভেবে। চারদিকে বিদ্ঘুটে অন্ধকার, অন্ধকার হাতড়িয়ে চেনা দেয়াল-দরজা ইত্যাদি অনুমান করে বাথরুমের দিকে পৌছানোর আগেই দুনিয়া কাঁপানো শব্দ হ'ল গুড়-গুড়-বুম্, বুম্ বুম্। পলকে একরাশ বাতাস তাড়িয়ে বালি-ইট-প্লাস্টারের গুঁড়োর ঝড় বয়ে গেল, সমস্ত ঘরটি কেঁপে রাত্রির নিস্তব্ধতাকে আরেকবার ভেঙে চুরমার করে আবার শব্দহীনতায় উধাও হয়ে গেল। আর ভয় জড়ানো চোখের ফাঁকে দেখলাম উত্তরের দেয়াল ভেদ করে কামানের গোলা পুব দেয়ালে বাধা খেয়ে ছাদ ফুটো করে চলে গেছে। একটা বিরাট গহ্বর আমার পাশে মূর্তিমান হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল, আমিও চোখ খুলে তাকিয়ে রইলাম আকাশের দিকে। দুই কান রইল নতুন শব্দের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশায়। পায়ের কাছে মেঝে স্তূপ, জঞ্জাল। অন্ধকারে অনুমান করলাম সমস্ত ঘরটির দৃশ্য, বুকের ভেতর একটি একটি পাঁজর নরম হয়ে যাচ্ছে অনবরত, মাথার ভেতর করোটির খাঁজে খাঁজে শিরশির করছে বোধ। তাড়াতাড়ি আবার গোলাবর্ষণের আগে ভয়ে ভয়ে সিঁড়ি ভেঙে নিচের তলায় নেমে যাওয়া ঠিক করলাম। নেমে যাচ্ছি। সিঁড়ির হাতল মাঝে মাঝে গেছে উড়ে, অন্ধকারে, ভয়ে ভয়ে, আন্দাজে, নামতে নামতে যেন পাতালে নেমে যাচ্ছি। আমি একা মৃত্যুর রাজ্যে চুপিসারে ঢুকে পড়া একটি প্রাণী নিঃশব্দে ঘোরাঘুরি করছি, আব সেই পুরীর দেয়াল, আসবাবপত্র, দরজা-জানলা, লোহার শিক আমার শরীরে মৃত্যুর নিঃশ্বাস ফেলছে অবিশ্রাম। কাঁপা কাঁপা পায়ে যেন ঠাণ্ডা সাপের স্পর্শ চলছে অবিরাম, অন্ধকারে মৃত্যুর মহড়া শুরু হয়ে গেছে বহুক্ষণ আগেই।

নেমে যেতে যেতে নিচের হলঘরে যখন পৌছলাম, দেখি খোলা দরজার সামনে সেই দুরন্ত এবং অগ্নিক্ষরা প্ল্যাকাডগুলো ভূতের মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। যে-সমস্ত ফেস্টুন দু'দিন আগেও ব্যবহৃত হয়েছে, ব্যবহারের পর দরজার সামনে বারান্দায় দেয়ালের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে, সেই সমস্ত ফেস্টুনের মূর্তিমান বিভীষিকা আমার চোখে পড়ল। রাস্তার স্বল্পালোকে চোখে পড়ল—দু'জন মানুষ একজন আহতকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, নিচে লেখাঃ আমার ভায়ের তাজা রক্তের বদলা আমি নেবই নেব—আমিও আমার লাশের ছবি দেখলাম।

আরো কয়েকটি আছে, আমি সেই সব প্ল্যাকার্ড সরিয়ে নেয়ার কথা ভাবলাম। সরিয়ে নিলে সৈন্যদের চোখে পড়বে না, তারা এদিকে আসবে না, আমি বাঁচব —আমি বাঁচতে চাই, মৃত্যুর গুহা ছেড়ে আমাকে বাসাবো যেতেই হবে। আবার ভাবলাম, না, যেমন আছে তেমনটি থাক, কাজ নেই ঝামেলা করে, ওরা যদি দেখে ফেলে ? বরং এখানে কেউ নেই ভেবে তারা ঢুকবে না, তা'হলে আমি নিরাপদ। এই ভাবে কতক্ষণ কেটেছে জানি না, আমি শুনেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে অবিশ্রাম গোলাবর্ষণের শব্দ, পল্টন ময়দানের দিকে দূরে কোথায়—তারপর ভাবলাম কোন্ দিকে যাব, কোথায় একটা আশ্রয় মিলবে—একটা আশ্রয়, একটু নিভৃত আশ্রয়, যেখানে কোলাহল করা বারণ হয়েছে, মৃত্যুর ডাক এত পৈশাচিক নয়, যেখানে একটু নিঃশব্দে বসে নিজেকে, অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলো একান্ত আপন করে ধরা যায়,—সেই একটুকু আশ্রয়। আমি আবার হাতড়ে দেখলাম, কোথায় যাওয়া যায়, আমি আরেকবার উল্টো-সিধা ভেবে নিলাম। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেমন ভাবা যায়, চারদিকে গোলাগুলির শব্দে যেমন একজন মানুষ দ্রুত ভাবতে পারে—যার সামান্য একটি গুলি একজনের পক্ষে যথেষ্ট—সেই দুর্লভ ভাবনার মুহূর্তে, দুর্বলতার অতল স্রোতে ডুবে স্বজন-বান্ধবহীন নিঃসঙ্গ অবস্থায় আমি সঠিক (?) কর্মসূচী তৈরী করতে চেষ্টা করলাম। দশ রকম চিন্তা-ভাবনা নয়, তারপর একটি স্থির ভাবনা লাফিয়ে লাফিয়ে মস্তিষ্কে খেলা শুরু করে দিল : পেছনের দিকে সংলগ্ন বাথরুমে যাও, মাথা গুঁজে নিজেকে বাঁচাও। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো বড় চিন্তা নয়, যুদ্ধনীতি, গণহত্যার চার্টার কে মানল কে মানল না সেই ভাবনাও নয়, এমনকি সৈন্যদের বিরুদ্ধে তীব্র রোষও নয়, শুধু নিজেকে বাঁচাও। একটি নির্নিমেষ ভাবনার, একটি স্থির সিদ্ধান্তের পরও আমি ফেস্টুন-প্ল্যাকার্ডগুলো টানতে গেলাম—অমনি গর্জন, তখুনি বুম্ বুম্ বুম্। মাথা নিচু করে দু'কানে হাত দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম মেঝেতে, তারপর সন্তর্পণে প্লেগ রোগে আক্রান্ত ইঁদুরের মতো টেনে টেনে একদম বাথরুমের দরজায়। বাম হাত ও কাঁধের নিচটায় কি যেন জ্বলে উঠল, সেই কথা সম্পূর্ণ ভাবার আগে সব চেয়ে জরুরী কর্মসূচীর মতো যা চোখে পড়ল—দুটো গভীর এবং ব্যাপক গর্ত হাঁ করে আছে পশ্চিম দিকের দেয়ালে, অন্য আরেকটি বাথরুমের খানিক পুবে। সেই গর্তের ওপারে এক অপার শূন্যতা হা হা করে নিঃশব্দ চীৎকার করছে, আমার পায়ের কাছে, পিঠে সুড়কি-চুন-বালির সাম্রাজ্য আধিপত্য বিস্তার করেছে, বাতাস

বারুদের গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছে। হাতে কাঁধে কেমন যেন শির শির করে ঘাম দিচ্ছে, অন্ধকারে সারা দেহে এক তরল স্রোত বয়ে চলেছে। নিম্নমুখী। মাটির দিকে ঘাম-রক্ত অনবরত ছুটছে, এখন মাটিই বেশি রক্তলোভী। সামনে চলছে এক নিঃশব্দ মিছিল, কোনো কথা নেই, প্রতিবাদহীন প্রেস-ক্লাব, অন্যদিকে সেক্রেটারিয়েট। চার দেয়াল করোটি বের করে নির্বাক—একেকটি ইট খসে মাটির তলায় জমা পড়েছে—কতদিনে মহাস্থানগড় ও ময়নামতীতে রূপান্তরিত হবে ·· অনেকক্ষণ বাইরের দিক থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে বুকের নিচে কনুই সক্রিয় করে, হাঁটু জোড়া টেনে উঠতে গেলাম। বাঁ হাত নিঃসাড়। এতক্ষণ খেয়ালে আসে নি। দাঁড়ালাম। বাথরুমের দরজার কপাট উড়ে গেছে, অন্ধকারে আন্দাজে দাঁডিয়ে দাঁড়িয়ে কাজ সারলাম, কতক্ষণ আগে সেরেছিলাম মনে নেই, প্যান্টের যথাস্থানে ভেজা ভেজা লাগছে। এতক্ষণে ভালো করে খবর পেলাম আমি এখনো বেঁচে আছি, শৌচাগারের গন্ধে একাত্মতা অনুভব করলাম, আণ্ডার-অয়ার প্রায় ভিজে গেঁছে। ডান হাত বুলিয়ে অনুভব করলাম বাম বাহুর কাপড় উড়ে গেছে, পিঠেও কাপড নেই। চটচটে রক্তের ধার নিচে নেমে গেছে, কিন্তু মোটা গেঞ্জির কন্দ্র চুঁইয়েছে এই মুহূর্তে তা খতিয়ে দেখার চেয়ে বেরিয়ে যাওয়া দরকার। তারপর সেই চিরপরিচিত অথচ নিঃসঙ্গ ঘর ছেড়ে পেছনের উঠোনে দাঁড়ালাম, কিন্তু গাছের নিচে এবং আড়ালে। ততক্ষণে কনভয় এবং ট্যাঙ্ক ঘর্ঘর শব্দে বহুদূর চলে গেছে, আমি অত্যন্ত নরম এবং ভারি গলায় ডাকলাম: কুতুব।

কুতুব, প্রেস-ক্লাবের অত্যন্ত চেনা একজন দারোয়ান। আমার ডাক শুনে সেই ছায়ান্ধকার দিয়ে ছুটে এল। বলল: এঁ্যা, আপনার গায়ে রক্ত।

: হ্যাঁ, রক্ত। তাই তোমাকে ডাকছি। পারলে ব্যাণ্ডেজ-জাতীয় একটা কিছু দাও। বাঁধি। এক গ্লাস জল।

কুতুব এক দৌড়ে ছুটে গেল। দূরের একটা বাল্ব থেকে আলোর রেখা পাতার আড়াল ভেদ করে পায়ের কাছে আবছা ছড়িয়ে আছে, কুতুবকে দেখলাম উঠোনের দক্ষিণ প্রান্তে তাদের থাকার ঘরে ঢুকতে। এক, তিন, পাঁচ, সাত মিনিট ·····। কুতুব আসে না। কুতুব সেই ঘর থেকে আর বেরোয় না। আমার ভয়; আমাকে এক অসম্ভব দুর্বল-করা ভাবনা চেপে ধরল, আমি কিছু

ভাবতে পারার আগে বসে পড়লাম। রক্ত, পূর্বেকার সমস্ত ঘটনা একের পিঠে একে জড়ো হ'ল। পৃথিবীটা একবার প্রলয়-দোলায় আমার সারা শরীরের ওপর মুষড়ে পড়ল। কিন্তু জ্ঞান হারাবার আগে কুতুব এসে আমার কাঁধে হাত রেখে চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে দিল। এক আঁজলা জল, হাতে ব্যাণ্ডেজ করে দিল ডেটল দিয়ে, পিঠের ক্ষতেও লাগাল। আমি বসে বসে কুতুবের দিকে তাকালাম, কুতুব তাকাল। আমি তার হাত ধরে দাঁড়ালাম। বাঁ হাত ঝিম ধরা, দুর্বল, অসাড়। কিন্তু পালানোর এই উপযুক্ত সময়, সৈন্যরা আবার আসতে পারে।

আমি ভাবনা-চিন্তা ফেলে, ভাবনা-চিন্তার চেয়ে দ্রুত ছুটতে লাগলাম। ছুটতে ছুটতে কোথায় থামলাম অন্ধকারে বোঝা গেল না। অনুমান, সেগুন-বাগিচার কাছাকাছি আছি, কোনো গলিতে। সেগুনবাগিচায় আলী রেজা থাকে, শান্তিনগরে সুপ্রকাশ, চামেলিবাগে মালতী আর বায়েজিদ থাকে। আমি কার কাছে যাব? বাসাবো যাওয়া একান্তই প্রয়োজন। হাসান এখন কোথায় কার সঙ্গে আছে কে জানে? সেদিকে অবিশ্রাম বৃষ্টির ছাঁচে গোলাবর্ষণ হচ্ছে, কামান কিংবা মর্টারের শব্দ অবিরাম শুনছি, একটি যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যিখানে আমি অবকাশহীন ভাবনায় ভাসছি—চতুর্দিকে আগুনের হলকা, আকাশটা ফর্সা হয়ে গেছে, পথঘাট পরিষ্কার দ্রষ্টব্য, স্বল্প পরিচিত গলিও এখন চিনতে আর কষ্ট নেই। দিকে দিকে সৈন্যদের পরিষ্কার করা রাস্তায় অবরোধ তৈরী করা হচ্ছে। ক্ষিপ্রগতিতে। কতক দামাল ছেলে। বড রাস্তা জনশূন্য।

সহসা বাতাসে সন্ত্রাস ছড়িয়ে আবার কনভয়গুলো এগিয়ে আসছে—দৃশ্যমান রাস্তা ফেলে তার আগেই আমি ছুটে গেলাম। এবার গির্জায়ঃ প্রভু যীশু, তুমি যুগে যুগে যেমন দুঃখীদের কোলে তুলে নিয়েছ; তুমি নিজেও একজন অত্যাচারিত, দুঃখী, তুমি আমাকে তুলে নাও প্রভু। ক্রুশের একেবারে কাছে গিয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম, গির্জার দরজায় বিরাট তালা ঝুলছে। হাসান, সুপ্রকাশ, রেজা, মালতী কিংবা কারো কাছে যাওয়া হ'ল না—প্রভু, আমাকে তুলে নাও। আবার ঝড়ের বেগে গোলা ছুটল, ইতিমধ্যে হাতের ব্যাণ্ডেজ চুঁইয়ে গেছে, পিঠের ক্ষতস্থান ঘামে ভেজা দুপুরের ত্বকের মতো থিকৃথিকে হয়ে গেছে, কামানের গর্জনও সেই মুহূর্তে রাষ্ট্র করল নিজেকে, নির্লজ্জের মতো। আরো কিছু শব্দ, ধুলো, বালি, ছাই শরীরে মেখে পাগলের মতো একটা ঘরে ঢুকলাম; বুম্ করে শব্দ হ'ল ছাদে। আমি হাট-করা দরজা বেয়ে ঘরে ঢুকলাম

তার আগেই, একটা কাঠের পাটা স্পর্শ করলাম। সেই স্পর্শে হাত বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত শরীরে প্রবেশ করতেই আরামের নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল, স্পর্শটি পরিচিত, একান্ত এবং মনে হ'ল আমার বহু শতাব্দীর পরিচিত বন্ধু। মালতী, জিদ, হাসান, গুণ-এর প্রবল পরাক্রান্ত বন্ধুত্বের কথা মনে পড়ল। আরো নিবিড় করে ওদের বুকে টানলাম, বাইবে লক্ষ-কোটি রাউণ্ড গুলিব সূচির ঝড় বইছে, টলছে ঢাকা শহর, বক্ষ, হৃদয়, এবং বাসাবোর একটি কক্ষের একটি কর্কশ কলিং বেল মিষ্টি সুরে অনবরত বাজছে, আমি আস্তে আস্তে ঐ কাঠের বাক্সের আরো কাছে গেলাম, নিবিড় হাত পাতলাম তার গায়ে। কোনো বঞ্চনা নেই, কোনো রকম প্রতিবাদ না করে কাঠের বাক্সটি আমাকে মায়াবী হাতছানি দিয়ে ডাকল, অন্ধকারে সেই আহ্বান সুরভিত হয়ে আমাকে বিহ্বল করে দিল, আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো ধীরে ধীরে ঐ কাঠের বাক্সে চিৎপাত শুয়ে পডলাম। লম্বমান। মসৃণ কাঠের ঠাণ্ডা স্পর্শে মনে হ'ল একটি কফিনে আমি শুয়ে আছি। তারপর নিবিড এক অনুভূতির মতো কফিনের ঢাকনি মৃদু সঙ্গীতের তালে তালে বন্ধ হয়ে গেল, নাকে লাগল হাজাব বছরের প্রাচীন কোনো এক কাঠবাক্সের সুগন্ধ। গোলাপ আর চন্দনের মধুর সুগন্ধ অতিক্রম করে গেল পূর্বের গন্ধকে, যেমন এক বাগান থেকে অন্য ফুলের বাগানে প্রবেশ করলে হয়, আবার প্রাচীন কালের কোনো এক অজানা-অনামা গন্ধ সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিতে লাগল—চারদিকে আর গোলা-বারুদ, যুদ্ধ, হত্যা, ধর্ষণেব কোনো চিত্র নেই এবং শব্দও নেই। আছে অনুচ্চকিত মধুব শব্দ করা এক সঙ্গীত, মধুরতম সমাপ্তি-সঙ্গীত গাইছে পৃথিবী : বালক বয়সের জয়ের আনন্দেব মতো সমস্ত শরীব-মন পুলকিত কৈশোবের স্বপ্নের মতো একটি একটি কুঁড়ি ফুল ফোটাতে ব্যস্ত যৌবনের স্পর্শের মতো বিভোর এক ঘুম সমস্ত চৈতন্যকে প্লাবিত করে দিচ্ছে—একটি একটি মালতী তাকে চুমুতে চুমুতে খল খল করে ছুটে চলেছে, একটি বকনদী গ্রাম চোখের সুমুখে ফুলের সুবাস ছড়িয়ে বুকে লুটিয়ে পডছে, ইছামতী নদীর স্বচ্ছ স্রোত আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ধুয়ে দিচ্ছে সমস্ত গ্লানিমা···। সেই মধুরতম সঙ্গীতের আবহে কয়েক শো সৈনিক সেই ঘরে ঢুকে সামরিক কায়দায় অভিনন্দন জানিয়ে সাদা কফিনটি কাঁধে তুলে নিল।

সেই সাদা কফিনের মিছিল চলছে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ধরে।

রাস্তার দু'পাশের সারিবদ্ধ অট্টালিকা-ইমারত আধুনিক স্থপতি বিদ্যায় নবরূপ ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে, কখনো তিন দেয়ালে আবার সমস্ত দেয়াল জুড়ে যেন বায়ু-প্রবাহের সুবিধানুযায়ী অসংখ্য ছোটো বড়ো ছিদ্র, কখনো চূড়োগুলো মসৃণ না হয়ে থ্যাবড়া, কোথাও শুধু কয়েকটি স্তম্ভ দণ্ডায়মান, ছাদহীন অট্টালিকা জ্যোৎস্না-রৌদ্রের অপরূপ স্বপ্ন-খেলায় বিভোর, কিছুক্ষণ পূর্বেকার মারমুখো মেশিনগান এবং কামানের মুখগুলো সাদা কফিনের সম্মানার্থে অবনত, সৈন্যরা অভিবাদন জানিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দুপাশের অসংখ্য গাছ লাল লাল থোকা থোকা কৃষ্ণচূড়া ছড়াচ্ছে। একটি ধবধবে রাত্রির নিস্তব্ধতা বেয়ে ভেসে চলছে একটি সাদা কফিন।

ঠিকানায় পৌঁছে

বুলবন ওসমান

ট্রাম-স্টপেজ আর বাস-স্টপেজের দূরত্ব অল্প। দুই যানের আরোহীদের অপেক্ষাটা তাই মনে হয় যেন একই উদ্দেশ্যে। ভীড়টা বেশ বেড়ে উঠেছে এবং কোন পার্থক্য না রেখে একাকার হয়ে গেছে। বাসগুলো ভরাট পেট। দুটি একটির কম যাত্রী খসছেনা ভীড় থেকে। ট্রামের কোন দেখা নেই। তাহলে কিছু যাত্রী কমত। বাতাসের ঝাপটা মেরে মেরে পর পর তিনটে বাস চলে গেল। বেক বাগান স্টপেজে দাঁড়িয়ে রউফ কাগজে লেখা বাসের নম্বর মেলাতে মেলাতেই বাস ছেড়ে যায়···পাঁচ, আট, একত্রিশ, একচল্লিশ·· যে কোন একটা হলেই গন্তব্যে পৌছাতে পারে ·· ··কিন্তু নজর প্রখর করে কাজে লাগার আগেই একের পর এক বাস ছেড়ে যেতে লাগল। সাড়ে নটা বাজে অফিসের সময় আরো ঘনিয়ে আসছে, তাতে বিপদ বাড়বে বই কমবে না—এ ছাডা বান্ধবী তার বিলম্ব দেখে বেরিয়ে যেতে পারে এবং সে রকমই কথা ছিল ·····তাই সে আরো উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে থাকে। যাদবপুর তার কাছে নূতন জায়গা, ওদিকে কোনদিন যায়নি, তা ছাড়া আছে রাজনীতিক হানাহানি। এতগুলো বাধা কাটিয়ে গন্তব্যে পৌছাতে হবে– তাই স্নায়ুতন্ত্রে একটা চাপ অনুভব করে। আর একটা বাসকে ধেয়ে আসতে দেখে রউফ আরো চঞ্চল হয়ে ওঠে। বাসের নম্বরটা এখন মুখস্থ হয়ে গেছে, আর কাগজ দেখে মিলিয়ে নেবার দরকার নেই ·····নম্বরটা পড়ে নিতে পারে, একত্রিশ···যা থাকে বরাতে, এবার একটা চেষ্টা চালাবে। বাসটা ধুলো উড়িয়ে ধাক্কা মারার আগেই রউফ ভীড় ঠেলে সবার আগে গিয়ে দাঁড়ায় এবং কাউকে নামতে না দেখে নিজেকে পাঁকাল মাছে রূপান্তরিত করে বাসের পেটে সেঁধিয়ে যায়।

চাপের প্রবলতা সবার সঙ্গে অংশ গ্রহণ করতে করতে দমটুকু বাঁচিয়ে রাখার কসরত করে চলে।

বাস অবশ্য অতি দ্রুতগতি এবং প্রতিটি স্টপেজে দাঁড়াচ্ছে না, প্রয়োজন নেই। তাই মিনিট দুই না যেতে বাস গড়িয়াহাটের মোড়ে এসে পড়ে। প্রায় এক

চতুর্থাংশ লোক নেবে যাওয়ায় ভাগ্যক্রমে রউফ বসার একটা জায়গা পেয়ে যায় জানলার পাশে। জানলার পাশে বসে সে অনেকটা ভরসা পায় মনে। যাদবপুর ছাড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই, সাইনবোর্ড দেখে করতে পারবে জায়গার হদিস।

এই সময় কণ্ডাক্টর পয়সা দাবী করলে রউফ বলে, যাদবপুর।

পনের পয়সা।

টিকিট নিয়ে রউফ বলতে যাচ্ছিল, আমাকে অনুগ্রহ করে একটু যাদবপুরে নাবিয়ে দেবেন··· · কিন্তু তার আগেই কণ্ডাক্টর ফটকের কাছে টিকিট আদায়ের জন্যে ত্বরিত এগিয়ে গেলে সে ব্যর্থ হয়।

যাক সে, নিশ্চয় স্টপেজে এসে হাঁকবে তখন নামলেই হবে, মনকে প্রবোধ দেয়।

গোলপার্ক ছাড়িয়ে বাস পুল পার হয়ে যোধপুর পার্কের সামনে দাঁড়ায় যাদবপুর যাদবপুর....করে কণ্ডাক্টর ডাক দিলে রউফ আসন থেকে তড়াক করে উঠে নামতে গিয়ে একবার জিজ্ঞেস করে, এটা যাদবপুর ?

না, না, যাদবপুর দূর আছে, আপনি বসুন গে, পরে নামিয়ে দেব।

ফিরে রউফকে আর বসতে হয় না, ততক্ষণে শূন্যস্থান পূর্ণ হয়ে গেছে।

ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে সে মাশুল দিতে থাকে, আগে যদি কণ্ডাক্টরকে বলার সুযোগ পেত।

বার বার নীচু হয়ে লোকেব ভীড়েব মাঝ দিয়ে সাইনবোর্ডে জায়গার নাম পড়ার চেষ্টা করে।

এক সময় বাঁয়ে পাঁচ-ছ' তলা একটা ভবন দেখে তাব মনে পড়ে এটা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নয় ত ? বান্ধবী তাকে তেমন নির্দেশ দিয়ে দিয়েছিল। পর মুহূর্তে বাস থেমে গেলে কণ্ডাক্টর চীৎকার করে ওঠে, যাদবপুর, যাদবপুর·

রউফ ভীড় ঠেলে ফটকে এগিয়ে যায় এবং হাতল ধরে নামার আগের মুহূর্তে সাবধানতা হিসেবে জিজ্ঞেস করে নেয় এটা যাদবপুর ত' ?

হ্যাঁ।

বাস থামতেই রউফ নেমে পড়ে।

এখানে একটা চৌরাস্তার মোড। কোন্ দিকে যাত্রা করতে হবে ? নিজেকে প্রশ্ন করে রউফ। জবাব জানা নাই সুতরাং পথ-চারীর সাহায্য প্রয়োজন। বান্ধবীর দেওয়া কাগজটা পকেট থেকে বের করে পড়তে থাকে :

যাদবপুর বাস-স্ট্যাণ্ডে নেবে একটা রিক্সা নেবেন।—

কোন্ দিকে যেতে হবে তার উল্লেখ নেই, নির্দেশ আছে রিক্সা নেবার। সুতরাং সে অপেক্ষমান একজন রিক্সাঅলাকে বলে, এই রিক্সাঅলা, যায়েগা?

কাঁহা বাবু?

হাতে ধরা কাগজটা আবার পড়ে রউফ··· রিক্সাঅলাকে বলবেন কাটজুনগর পোষ্ট-অফিস···

কাটজুনগর পোষ্টাপিস।

নেই বাবু। উধার নেই যায়েগা।

যাবে না ত যাবে না, রউফ অন্য রিক্সাঅলার খোঁজ করে। কাগজটায় আর একবার চোখ বুলিয়ে নেয় ·ভাড়া চল্লিশ পয়সা। পোষ্ট অফিসের সামনে নামবেন।···এই সময় একটা রিক্সা যেতে দেখে রউফ ডাক দেয়, রিক্সা···

কাহা যানা বাবু···

কাটজুনগর···

নেই বাবু।

বলেই আর কালবিলম্ব করে না রিক্সা-অলা, মুখ ঘুরিয়ে ধীর পায়ে প্যাডেলে পা চালাতে থাকে।

পর পব দু দু'টো রিক্সা বিমুখ করায় সে কিছুটা বিরক্ত হয়।

আবার অপেক্ষা।

তৃতীয় রিক্সাও নেতিবাচক জবাব দিলে ক্ষেপে ওঠে।

বলে, কিউ নেই যায়েগা? আপ কা যানা হ্যায় আপ পায়দল যাইয়ে···

শীতল কণ্ঠস্বর রিক্সাঅলার

নিজেকে সংযত করে রউফ, ভাবে হয়ত রাস্তা খারাপ, তাই যাবে না, তাই বললে পায়ে হেঁটে যেতে।

একটা পানের দোকানেব সামনে এগিয়ে গিয়ে রউফ জিজ্ঞেস করে, কাটজুনগর কোন্ দিকে?

দোকানী একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার চোখে চোখ রেখে বলে, এই ত ডানের রাস্তা। তারপর নিস্পৃহভাবে নিজের কাজে মন দেয়।

হদিস যখন পাওয়া গেছে, রউফ এবার নিশ্চিন্ত। আর কারো পরোয়া না করে এবার সে সামনে পা বাড়াতে পারে। কাটজুনগর পোস্টাপিস গন্তব্য করে যাত্রা শুরু করে।

বাঁয়ে বাঁক নিতেই বেশ কয়েকটা ফলের দোকান। দু'পাশে শরমির শোভা বর্দ্ধন করে পাশাপাশি গজিয়ে উঠেছে। একমাত্র ফলের দোকানগুলো জীবন্ত ও সরব। তারপর কয়েকটা দোকানের পাটা বন্ধ। তারো পরে আর কয়েকটা দোকান, সেগুলোর দরজায় তালা। আরো এগিয়ে রাস্তায় রিক্সা বা অন্যান্য যানবাহনের সাক্ষাত পেল না। না পাক, তাতে তার কিছু এসে যায় না। পায়ের উপর নির্ভর যখন গাড়ীর দেখা না পেলে কি বা এসে যায়।

এ দিকটায় ঘরবাড়ী বেশ ফাঁকা ফাঁকা। মাঝে মাঝে নারকেল গাছের সার, আশ্বিনের আকাশকে ফুঁড়ে জল জল করে জলছে তাদের পাতা। অদূরে ফাঁকা মাঠ। কোথাও জলা, পানা ভরা। মশার আঁতুড়ঘর।

আরো কিছুটা এগিয়ে গেলে হঠাৎ কেমন যেন একটা আতঙ্ক তার মনের কোণে খুঁটি গাড়তে থাকে। যে কলকাতা জনবহুলতাব জন্যে খ্যাত তার রাস্তায় লোক নেই, নেই যানবাহন, এমন কি ঘর-বাড়ীর দরজা জানালাও বন্ধ। ব্যাপারটা কি! রিক্সাঅলা কেন আসতে চাইল না এদিকে? এই দিন দুপুরে এমন ঘুমন্তপুরীর মত নিস্তব্ধতা কেন? রাস্তায় কোন পথযাত্রী নেই যে ডেকে জিজ্ঞেস করবে। ঘর দোর, সব বন্ধ। চলার গতি তার কমে আসে। ধীরে ধীরে পা ফেলতে ফেলতে ভাবে ফিরে যাবে নাকি? হঠাৎ পেছনে সে ফিস ফিস করে একটা ধ্বনি শুনতে পায়। উৎকর্ণ হয়। পরিষ্কাব শুনতে পায় কে যেন বলছে, ··দেব না কি শালাকে শেষ করে···

না। দাঁড়া দেখি···দ্বিতীয় আর একটা কণ্ঠ।

পিছু ফিরে শব্দের সন্ধান নেবার আগেই পাশের গলি থেকে দীর্ঘদেহী এক যুবক সামনে এসে দাঁড়ায়।

সারা শরীরে শৈত্য প্রবাহ খেললেও সাহস হারায় না রউফ।

কে আপনি?

দৃঢ়কণ্ঠ যুবকের।

আমি রউফ।

বাড়ী কোথায়?

বাংলাদেশ।

কোথায়? খুলনা।

প্রমাণ?

তাই ত প্রমাণ দেবে কি ভাবে যে তার বাড়ী খুলনা এবং সে বাংলাদেশের

লোক? চট করে তার মাথায় উপায় খেলে যায়।

আমার মানিব্যাগটা দেখতে পারেন, এতে বাংলাদেশের ঠিকানা রয়েছে ··

এই সময় খর্বকায় আর একটি যুবক আর এক পাশে এসে দাঁড়ায়। চোখে তার অবিশ্বাস এবং হিংস্র চাউনী।

এটা বানানো হতে পারে? দ্বিতীয় যুবক রীতিমত ধমকে ওঠে, যখন রউফ তার মানিব্যাগ খুলে দেখাতে গেল।

আরো একটা চিহ্ন মনে পড়েছে, প্যাণ্টের ভেতর খুলনার দর্জিঘরের চিহ্ন সাঁটা আছে, দেখবেন?

যুবকদ্বয় পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

প্রথম যুবক বলে, যাবেন কোথায়?

কাটজুনগর।

কার বাড়ী?

দিলীপ সাহা।

খর্বকায় যুবক হঠাৎ শ্যামল হয়, তার সারা চোখ মুখের হিংস্র ভাবটা কেটে যায়।

দিলীপদার বাড়ী যাবে। প্রথম যুবকের উদ্দেশে বলে।

ঠিক আছে, আপনি আমার সাথে আসুন। বলে দীর্ঘকায় যুবক মধ্যম উচ্চতার রউফের রীতিমত হাত ধরে। যেন বাচ্চা ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

কোথায় নেবেন?

সংশয় জড়িত কণ্ঠ রউফের।

ভয় নেই, দিলীপদার বাড়ী। চলুন।

এক রকম যেন টেনেই নিয়ে চলে রউফকে। এই টানা হেচড়ার দিকে নজর না দিয়ে সে বলে কি ব্যাপার এখানে লোকজন দেখছি না কেন?

যুবক তার তীক্ষ্ণদৃষ্টি রউফের মুখে ফেলে বলে, বুঝতে পেরেছি কিছু জানেন না, কলকাতা এখনো চিনে উঠতে পারেন নি?

কিছুটা চিনেছি।

ঘোড়ার ডিম চিনেছেন! চিনলে আর অমন বোকার মত একা একা রাস্তায় হাঁটতেন না। গিয়েছিলেন ত এখনি যমের দুয়ারে।

কথা নেই বার্তা নেই তা আপনারা যদি অনুগ্রহ করেন। কি আর করা·

মোটেই বুদ্ধিমানের মত কথা হোলো না।

কবে এসেছেন কলকাতায় ?

সেই এপ্রিলেই।

এখনও কলকাতাকে আপনার চেনা হয়নি, আশ্চর্য !

তারপর সামান্য থেমে বলে, এই বুদ্ধি নিয়ে আপনারা ইয়াহিয়াকে তাড়াবেন ! সারা জীবনেও পারবেন না !

ভুল করছেন, বাংলাদেশের তরুণরা মৃত্যুকে পরোয়া করে না, হয়তো সেটার নমুনাই আমার আচরণে ফুটে উঠেছে।

ঘোড়াব ডিম।

যুবক দ্বিতীয়বাব ঘোডাব ডিম শব্দটা উচ্চাবণ করলে, তারপর বলে, কতটা মৃত্যুকে ভয় কবেন না সেত দেখতেই পাচ্ছি. দেশ ছেড়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়েছেন।

সবাই যোদ্ধা হয় না।

যারা এখন যুদ্ধ করছে, স্কুল-কলেজের যুবকবা, তাবাই বা কবে যোদ্ধা ছিল ? প্রয়োজনই মানুষকে যোদ্ধা কবে।

এরপর সামান্য থেমে বলে, আপনি কবতেন কি ?

অধ্যাপনা।

বাঃ ! তাহলেত পাক-বাহিনীর শাসালো শিকার ছিলেন।

তাইত পালিয়ে এসেছি, উৎসাহিত হয়ে বলে রউফ।

মোটেই ভাল করেননি, রীতিমত ধমকে ওঠে যুবক, আপনি কি বলতে চান বাংলাদেশের সব অধ্যাপক বলেই এপারে চলে এসেছেন ?

না, তা আসেনি ; যেহেতু টিক্কা খানের তালিকায় আমার নাম আছে তাই পালিয়ে এসেছি।

কেমন করে জানলেন ?

জেনেছি।

সবাইত আর জানতে পারবে না ...

হ্যাঁ, তাদের ভাগ্যে কি আছে আল্লাই জানে ....

আল্লার হাতে ছেড়ে দিয়ে বেশ আছেন মশাই।

রউফ এবার যুবক সম্বন্ধে জানতে চাইল, আপনার নাম কি ?

বাসব।

কি করেন ?

কিছু করি না।

আচ্ছা, রাস্তা এখন জন-মানব শূন্য কেন ?

বলার আর কি আছে··· ছ'মাস কলকাতায় আছেন কলকাতাকে চিনতে পারলেন না ?

কলকাতাকে হয়ত কিছুটা চিনেছি, কিন্তু আপনাদের এখানের এই বিশেষ স্তব্ধতার কোন হদিস করতে পারছি না।

আপনি সারা জীবনে পারবেনও না।

বুঝতে পারছি গণ্ডগোল একটা হয়েছে।

ভালোই বুঝেছেন······আচ্ছা, আপনারা ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে লাগতে গেলেন কেন ?

আমরা লাগতে গেলাম, না লাগতে বাধ্য করল ?

বাধ্যই হলেন কেন বা অবাধ্যই হলেন কেন ?

এই অক্টোবরে এসেও কি আপনাদের এর জবাব দিতে হবে ?

প্রশ্নটা এই জন্যে করছি, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ নামক এই বুর্জোয়া আন্দোলনে আপনারা গেলেন কেন? আপনারা কি মনে করেন ইন্দিরা ইয়াহিয়ার চেয়ে আলাদা ?

আমি কী মনে করি সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হোলো আপনি ইন্দিরার বিরুদ্ধে এ কথা প্রকাশ করতে পারছেন, আমরা ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে তা পারতাম না।

আপনারা শুনেছি রেডবুক রাখতে পারতেন ?

হঁ্যা।

আর আমাদের এখানে রেডবুকের সন্ধান পেলে আর রক্ষা নাই।

তবে ব্যাপারটা কি জানেন, আমরা রেডবুক রাখতে পারতাম, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি ব্যাণ্ড।

যুবক অনেকক্ষণ আর কোন কথা বলে না।

অনেকটা রাস্তা অতিক্রম করেছে তারা। এদিকে বেশীর ভাগ বাড়ী ছোট, সামনে কোথাও সামান্য খালি জায়গা, কিন্তু বাগান নেই। সর্বত্র শ্রীহীনতার লক্ষণ। কারো যেন বাঁচার সখ নেই, স্পৃহা নেই, ইচ্ছা নেই···একটা গড্ডাল স্রোত সব কিছু ঢেকে ফেলেছে। কোথায় কোন্ অদৃশ্য থেকে একটা পোকা

যেন জীবনকে কুরে কুরে খেয়ে চলেছে, যার প্রভাব গোটা কলকাতা জুড়ে। যাদবপুরেও যার ব্যতিক্রম নেই।

বাসব হঠাৎ ভিন্ন প্রশ্ন করে।

আচ্ছা, এই যে শুনি মুক্তিফৌজ, সত্যি মনে করেন বাংলাদেশের ছেলেরা লড়ছে?

বলেন কি! যখনি শুনি এতজন মুক্তিফৌজ মারা গেছে আমার মনে হয়, প্রতিবার মনে হয় আমার ভায়েরা মারা যাচ্ছে······আমার দু'ভাই আছে মুক্তি বাহিনীতে। আপনাদের কাছে ওরা সংখ্যা, আর আমাদের কাছে···গলা ধরে আসে রউফের। চোখ মুছে সে হাতের পেছন দিয়ে।

বাসবকে খুব একটা সহানুভূতিশীল হতে দেখা গেল না।

সে বললে, আপনারা এখনো ভায়ের কথা বলে চোখে জল আনতে পারেন, আর আমরা···এক ভাই মারা গেল পুলিশের গুলিতে, এক বোন গেল টিবিতে, বি এ পাশ করে আজ পাঁচ বছর বেকার···রোমান্টিকতা ···করার আমাদের সময় কোথায়?

রউফ কোন কথা বললে না।

তারা নীরবে পথ হাঁটে।

দু'জন যেন দুই ভিন্ন গ্রহের মানুষ। কেউ কারো কাছে পৌছতে পারে না। দু'জনেই নিজ নিজ কথা বলে যাচ্ছে, কিন্তু এ যেন শত্রুর বচসা, মিত্রের সহানুভূতি নয়।

পরমুহূর্তে বাসবকে কিন্তু এ গ্রহের মানুষ বলে মনে হোলো রউফের।

বললে, বেশ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে, বড়দাটা যখন পুলিশের গুলিতে গেল, কাঁদিনি কারণ সে একটা মহৎ উদ্দেশ্যে বলি হয়েছে, কাঁদা মানে তাঁকে অপমান করা- -কিন্তু বোনটা যখন মারা গেল কান্না রোধ করতে পারিনি- - -অক্ষমতা ভীষণ কাঁদিয়েছে। তারপর থেকে চোখে আর জল আসে না বরং কারো চোখে জল দেখলে আমার ন্যাকামি মনে হয়।

রউফ বাসবের মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টি ফেলে। কতইবা বয়স, পঁচিশ ছাব্বিশ···এরি মধ্যে মুখের দাড়ি অর্ধেক পেকে গেছে, চোখের নীচে কালি।

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা তাদের বেড় দিয়ে রাখে। শুধু নীরব রাস্তায় রউফের নতুন কেনা জুতোর খট খট ধ্বনি রাস্তার মাঝে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

এদিকটায় নারকেল গাছের মাথা ঘর-বাড়ী ছাড়িয়ে আকাশকে অনেকটা ঢেকে রেখেছে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে খেয়াল করেছে রউফ। ঢ্যাঙ্গা একটা গাছে প্রচুর ডাবের ফলন দেখে সে হঠাৎ চমৎকৃত হয় এবং আপনা থেকেই বলে ওঠে, দেখেছেন, গাছটায় কেমন ডাব হয়েছে!

বাসব মুখ তুললে গাছটার দিকে। তারপর বললে, হুঁ। আপনারা এখনো ভায়ের কথা বলে চোখে জল আনতে পারেন, ডাব দেখে আনন্দিত হতে পারেন আর আমরা?··

রউফ এ কথার কোন জবাব দিতে পারল না।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ।

রউফ ভিন্ন প্রসঙ্গ পাড়ে।

আচ্ছা, আসল কথাটাই তো জানালেন না বাসব বাবু?

কি কথা?

কেন এই নিস্তব্ধতা ...জনহীনতা?

জনহীনতা! মানুষ খুন হলে অমন জনহীনতা হওয়া স্বাভাবিক।

খুন!

হ্যাঁ।

কি হয়েছিল?

একজন কংগ্রেস কর্মী সকাল ন'টার দিকে খুন হয়েছে। ছ'মাস আগেও ভদ্রলোক ছুরিকাহত হন, অবশ্য বেঁচে যান। তবে এবার যম বিমুখ করেনি।

কারা মারল?

জানি না।

এমন সময় রউফের একটা বাড়ীর ওপর নজর পড়ে, নাম ফলকে লেখা ডাকঘর।

তাহলে আমরা চলে এসেছি, না?

হ্যাঁ। ঐ যে বাড়ীটা, ওটাই দিলীপদার বাড়ী।

বাঁয়ে বাঁক নিতে পরিষ্কার দেখা গেল বাড়ীটা।

এটাই দিলীপদার বাড়ী, বলে বাসব, তারপর বারান্দায় উঠে কড়া নাড়ে।

একজন বয়স্ক লোক বেরিয়ে আসে।

দিলীপদা আছেন?

আছে।

একটু ডেকে দিন।

মিনিট তুই পর প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এল।

কাকে চান ?

দিলীপদা, এই ভদ্রলোক আপনার খোঁজ করছিল।

কি চান, বলুন ?

দেখুন, আমি ঠিক আপনার কাছে আসিনি······

এই যে আপনি বললেন দিলীপদার সঙ্গে দেখা করতে চান, আবার বলছেন ওঁর কাছে আসেননি · ···বাসব প্রায় ক্ষিপ্ত, চোয়াল উঁচু হয়ে ওঠে তার।

দেখুন, আমি আপনার স্ত্রীর বন্ধু, আমাকে আসতে বলেছিলেন। রউফ দিলীপের উদ্দেশ্যে বলে।

আচ্ছা দাঁড়ান, ওঁকে ডেকে দিচ্ছি।

বাসব বার বার রউফের দিকে চায়, চোখে তার আনন্দের বীজ বাসা বেঁধে ফেলে।

এমন সময় দরজাব পর্দা ফাঁক কবে একটি মহিলাব মুখ উঁকি দেয়। তারপর বেরিযে এসে বলে, আবে আপনি তা তুমি এতক্ষণ এঁকে ভেতরে নিয়ে যাওনি কেন ? দিলীপেব উদ্দেশে বলে তার স্ত্রী সুমিতা।

হঠাৎ গলির মধ্যে পুলিশেব সবুট দৌড়ের পদধ্বনি শোনা গেল।

চঞ্চল হয়ে ওঠে বাসব। রউফের পেছনে পেছনে সেও ঘরে ঢুকে পড়ে। চোখ-মুখ তার ফ্যাকাশে। হাত-পা কাঁপছে।

তাব অসহায় ভাব দেখে রউফ ভাবে, নিজের জীবনকে বিপন্ন করে যে তাকে সবল হাতে নিরাপদ ঠিকানায় পৌছে দিয়ে গেল, তাকে তার ঠিকানায় সে কেমন করে পৌছে দেবে ?